একাত্তরের
দুঃসহ স্মৃতি
সম্পাদনা ঃ শাহরিয়ার কবির
একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি
সম্পাদনা ঃ শাহরিয়ার কবির

একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি

গ্রন্থনা
রুহুল মতিন
ডঃ সুকুমার বিশ্বাস, জুলফিকার আলি মাণিক
মোস্তাফা হোসাইন, শফিউল আলম রাজা, কৃষ্ণ ভৌমিক
গৌরাঙ্গ নন্দী, আবুল কালাম আজাদ, পৃথ্বিজিৎ সেন ঋষি

সম্পাদনা
শাহরিয়ার কবির

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি

প্রথম প্রকাশ
ঢাকা, নবেম্বর ১৯৯৯

প্রকাশক
কাজী মুকুল
সাধারণ সম্পাদক, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি
গ-১৬ মহাখালী, ঢাকা ১২১২, দূরালাপনী ৮৮২২৯৮৫

প্রচ্ছদ
১৯৭১-এ অঙ্কিত শিল্পী কামরুল হাসানের তৈলচিত্র 'বাংলাদেশ '৭১'
অবলম্বনে অমল দাস

আলোকচিত্র
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাধীনতাযুদ্ধ ইতিহাস প্রকল্পের
'মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্র,' আনন্দবাজার পত্রিকার 'বাংলা নামে দেশ' এবং
কিশোর পারেখের এ্যালবাম থেকে নেয়া হয়েছে

মুদ্রণ
ডানা প্রিন্টার্স লিমিটেড, গ-১৬ মহাখালী, ঢাকা-১২১২

মূল্য
১৫০ টাকা

উৎসর্গ

একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য যাঁরা
আন্দোলন করছেন বাংলাদেশে
এবং
ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভূটান, শ্রীলঙ্কা ও অন্যান্য দেশে
যাঁরা এই আন্দোলনের সমর্থক
তাঁদের উদ্দেশে

সম্পাদকের অন্যান্য গ্রন্থ

একাত্তরের ঘাতক দালালরা কে কোথায়
একাত্তরের ঘাতক জামাতে ইসলামীর অতীত ও বর্তমান
যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের বিচার
জনতার আদালতে জামাতে ইসলামী
Resist Fundamentalism : Focus on Bangladesh
সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের শ্বেতপত্র
একাত্তরের অবিরাম রক্তক্ষরণ

সূ চি প ত্র

দুপুর বেলা একটা বস্তার মধ্যে ঢুকিয়ে আমাকে ফেলে রাখল আগস্টের কড়া রোদের মধ্যে
ব্রিগেডিয়ার (অব:) এম আর মজুমদার
৩৩

একদিন তারা বিরক্ত হয়ে আমাকে বরফের স্ল্যাবের ওপর ফেলে রাখে
লেঃ কর্নেল মাসুদুল হোসেন খান (অবঃ)
৪৮

ওরা সিগারেটে টান দিয়ে গলায় চেপে ধরে নেভাত
মাসুদ সাদেক চুল্লু
৬০

অনেক মৃত্যু দেখেছি, নারী নির্যাতনের কথা শুনেছি কিন্তু কখনও ভাবিনি আমি তার শিকার হব
ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী
৬৭

কথা বের করার জন্য পাকিস্তানি আর্মি সুঁই ফুটিয়েছে আঙুলের ডগায়
সৈয়দ আবুল বারক আলভী
৮৭

ভেতরে ঢুকে দেখি মেঝেতে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে অনেকগুলো মৃতদেহ
আবুল ফজল
৯৪

'যে দিকে তাকাই সে দিকেই বিভীষিকার চিহ্ন'
প্রতীতি দেবী
১০০

কথা বের করার জন্য আঙুলের মাথায় ছুরি ঢুকিয়ে নখ উপড়ে ফেলেছিল
সঙ্গীতশিল্পী লিনু বিল্লাহ
১০৭

লোহার রড দিয়ে বাড়ি মেরে বুকের পাঁজর ভেঙে দিয়েছে
অধ্যাপক আ ম ম শহীদুল্লা
১১২

প্রতিদিন আমাদের মেরে নারকীয় উল্লাস করত তারা
ক্যাপ্টেন (অব:) সৈয়দ সুজাউদ্দীন আহমেদ
১১৮

ওরা আমার দু'বাহু, পিঠ, উরুর পিছন দিক পিটিয়ে রক্তাক্ত করল
নাসের বখতিয়ার আহম্মদ
১২৪

আমি গুলির শব্দের পূর্বে ভেবেছিলাম আমাদের ওরা গুলি না করে আগুনে পুড়িয়ে মারবে
দূর্গাদাস মুখার্জী
১২৮

কথা বের করার জন্য প্রতিদিন আমার হাত পায়ের নখে সূঁচ ফুটান হত
মোশাররফ হোসেন
১৪১

আমার গলায় দড়ি দিয়ে ট্রাকের পিছনে বেঁধে নিয়ে যায় মাইল খানেক পথ
মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
১৪৫

রাস্তার ধারে স্তুপকৃত অনেক লাশের উপর আমার আব্বার লাশ দেখতে পাই
গাজী কামালউদ্দীন
১৪৭

এক পাঞ্জাবি কুকুর, কুকুরের মতই আমার কোমরের ওপর চড়াও হয়ে আমাকে উপর্যুপরি ধর্ষণ করেছিল
রাবেয়া খাতুন
১৫০

মুক্তিযুদ্ধের আটাশ বছর পরও আবিষ্কৃত হচ্ছে একাত্তরের বধ্যভূমি
জুলফিকার আলি মাণিক
১৫৭

রাজশাহী বধ্যভূমি ঃ একশটি গণকবর থেকে দশ হাজার মানুষের কঙ্কাল উদ্ধার করা হয়
ডঃ সুকুমার বিশ্বাস
১৬৩

খুলনার দুটি বধ্যভূমি ঃ বাঙালিদের হত্যা করার পর দেহ ভাসিয়ে দেওয়া হত নদীর স্রোতে
গৌরাঙ্গ নন্দী
১৭১

চট্টগ্রামের বধ্যভূমি ঃ পাহাড়তলীর মাটি খুঁড়লে এখনো ২০ হাজার বাঙালির মাথার খুলি পাওয়া যাবে
ডঃ সুকুমার বিশ্বাস
১৭৫

লাকসাম বধ্যভূমি ঃ নারী নির্যাতন হিসেবে ধর্ষণ ছিল প্রাত্যহিক ঘটনা
মোস্তাফা হোসাইন
১৮১

পরিশিষ্ট
১৯৩

ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর গত আটাশ বছরে গদ্য পদ্য মিলিয়ে প্রায় বার শ বই বেরিয়েছে। এর ভেতর তিন শতাধিক ইতিহাস ও স্মৃতিকথামূলক। এইসব ইতিহাস ও স্মৃতিকথার ভেতর সিংহভাগই রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং যুদ্ধের বিবরণ। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় সহযোগীদের নারকীয় গণহত্যা, নারী নির্যাতন, লুণ্ঠন ও অন্যান্য ধ্বংসযজ্ঞের বিবরণ গ্রন্থাকারে খুব কমই প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় গণহত্যা ও নারী নির্যাতনের ভয়ঙ্কর সব বিবরণ প্রকাশিত হতে থাকলে শুধু বাংলাদেশের অধিবাসী নয়, সমগ্র বিশ্বের সচেতন ব্যক্তিরা ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হয়েছেন এবং যারা এর জন্য দায়ী তাদের বিচার দাবি করেছেন।

সরকারীভাবে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের বিবরণ সংগ্রহের উদ্যোগ প্রথম গ্রহণ করে বাংলা একাডেমী ১৯৭২ সালে। এরপর '৭৭ সালে তথ্য মন্ত্রণালয় 'বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প' গঠন করে, যার অধীনে ষোল খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র।' এই ষোল খণ্ডের ভেতর অষ্টম খণ্ড (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৩১) হচ্ছে 'গণহত্যা, শরণার্থী শিবির ও প্রাসঙ্গিক ঘটনা' সম্পর্কে। দলিলপত্রের চতুর্দশ খণ্ডে বিদেশী সংবাদপত্রে একাত্তরের গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের আংশিক বিবরণ রয়েছে। এছাড়া অধ্যাপক সালাহউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে গঠিত 'মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা ট্রাস্ট' তৃণমূল পর্যায়ে তিন শতাধিক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছে।

সাম্প্রতিককালে একাত্তরের গণহত্যা ও নারী নির্যাতন সম্পর্কে যে ক'টি বই বেরিয়েছে প্রায় সবই দলিলপত্রের অষ্টম খণ্ড থেকে নেয়া তথ্যের ভিত্তিতে লিখিত, কিন্তু এর কোনও স্বীকৃতি নেই। এ ধরনের তথ্যকতামূলক প্রকাশনার বাইরে কিছু স্মৃতিকথায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নিষ্ঠুর নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডের বিবরণ রয়েছে যার ভেতর উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মন্টু খানের লেখা 'হায়নার খাঁচায় অদম্য জীবন,' রতনলাল চক্রবর্তী সম্পাদিত 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণহত্যা ঃ ১৯৭১' এবং রশীদ হায়দার সম্পাদিত বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত ১২ খণ্ডের 'স্মৃতি ঃ ১৯৭১'। এ ছাড়াও রাজাকার আলবদরদের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বাংলা ও ইংরেজিতে ২০/২১টি বই আছে। কিন্তু পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নিষ্ঠুরতম নির্যাতন, গণহত্যা ও অন্যান্য ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে

প্রামাণ্য কোনও গ্রন্থ নেই বললেই চলে।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের এই অপূর্ণতা লক্ষ্য করে আমরা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কার্যকলাপ সম্পর্কে একটি গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা এবং এই উদ্দেশ্যে তথ্য, উপাত্ত ও বিবরণ সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করি। 'একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি' আমাদের সেই উদ্যোগের ফসল।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের অনাবিষ্কৃত বিষয়সমূহ উদ্ধারের পাশাপাশি এর রাজনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্বের বিষয়টি আমাদের বিবেচনায় রাখতে হয়েছে। বাংলাদেশে জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে সূচিত একাত্তরের ঘাতক দালালবিরোধী আন্দোলনে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টি নতুনভাবে উত্থাপিত হয়েছে। ১৯৯২-এর জানুয়ারি মাসে সূচিত এই আন্দোলনের সংবাদ বহির্বিশ্বে প্রচারিত হলে পাকিস্তানে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের জন্য সংগ্রামরত কিছু সংগঠন ও ব্যক্তি একাত্তরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর যে সব সদস্য বাংলাদেশে গণহত্যা ও নারী নির্যাতনের সঙ্গে যুক্ত ছিল তাদের বিচার দাবি করেছেন এবং এতদসংক্রান্ত তথ্যের জন্য আমাদের শরণাপন্ন হয়েছেন। কারণ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে হলে তথ্য, প্রমাণ, সাক্ষ্য ইত্যাদির প্রয়োজন। এই সব যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে আটাশ বছর আগে। বহু প্রত্যক্ষদর্শী, নির্যাতিত ও ভুক্তভোগী সময়ের ব্যবধানে মৃত্যুবরণ করেছেন। গ্রন্থ পরিকল্পনার সময় এটাও বিবেচনায় রাখতে হয়েছে— দ্রুত যদি সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ না করা যায় কয়েক বছর পর এর সিংহভাগই অবলুপ্ত হয়ে যাবে।

স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রের অষ্টম খণ্ডে ২৬২ জন প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগীর জবানবন্দি প্রকাশিত হয়েছে, যাঁরা সাধারণভাবে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পৈশাচিক নির্যাতন ও গণহত্যার বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু শতকরা আশি ভাগই নির্দিষ্টভাবে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর কোন সদস্যের নাম বলতে পারেননি। নাম বলতে না পারার একটি কারণ হচ্ছে শারীরিক নির্যাতন চালানোর সময় পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তা ও সাধারণ সৈন্যরা তাদের নাম ও পদমর্যাদাসূচক ব্যাজ খুলে রাখত।

নতুনভাবে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংসতার বিবরণ সংগ্রহ করার সময় প্রত্যক্ষভাবে দায়ী ব্যক্তির নাম ও পরিচয় জানার উপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, যাতে এই যুদ্ধাপরাধীদের আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে অসুবিধে না হয়।

সমগ্র দেশব্যাপী একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নিবেদিত কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদের মাধ্যমে সংগৃহীত প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগী এমন অনেকের জবানবন্দি পাওয়া গেছে যাঁরা দায়ী ব্যক্তির নাম বলতে পারেননি। গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য জবানবন্দি বাছাই করা হয়েছে অভিযোগকারীদের সামাজিক অবস্থানের বৈচিত্র্য, অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম ও পদমর্যাদা, হত্যা ও নির্যাতনের বিচিত্র নিষ্ঠুর পদ্ধতি এবং প্রদত্ত বিবরণের সঠিকতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে।

বর্তমান গ্রন্থের জন্য গণহত্যা ও নারী নির্যাতনের প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগীদের জবানবন্দি ছাড়াও সদ্য আবিষ্কৃত দু'টি বধ্যভূমির উপর প্রতিবেদন সংগ্রহ করা হয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের সম্পর্কে তদন্ত করতে গিয়ে আমরা খুঁজে পেয়েছি দুই শ' পাকিস্তানি

সামরিক কর্মকর্তার নাম, যাদের বাংলাদেশ সরকার যুদ্ধাপরাধের দায়ে '৭২ সালে বিচার করতে চেয়েছিল, কিন্তু বিভিন্ন কারণে পারেনি। এই তালিকা ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি, যা প্রথম বারের মত এ গ্রন্থে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।[১]

দুই

একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসররা তিরিশ লাখ বাঙালিকে হত্যা করেছিল। আড়াই লাখেরও বেশি অসহায় নারী তাদের পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত শত শত জনপদ তারা ধ্বংস করে দিয়েছিল। সহায় সম্বল হারিয়ে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নির্যাতন, হত্যাযজ্ঞ ও বর্বরতা সইতে না পেরে তখন এক কোটি মানুষ সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। যারা দেশে ছিল তাদের অধিকাংশই নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র পলাতকের জীবনযাপন করেছে।

পাকিস্তানি সামরিক জান্তার কাছে বাঙালির অপরাধ ছিল এই যে, তারা গণতন্ত্র চেয়েছিল, সকল প্রকার শোষণ-পীড়নমুক্ত একটি সমাজ চেয়েছিল। তারা এমন একটি রাষ্ট্র চেয়েছিল যেখানে ধর্মের নামে হানাহানি থাকবে না, নিজেদের কয়েক হাজার বছরের ঐতিহ্য সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিচয় নিয়ে তারা মাথা উঁচু করে বাস করতে পারবে। বাঙালির এই আকাঙ্খা ছিল পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় দর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীত, কারণ পাকিস্তান এমন একটি সমরতান্ত্রিক মৌলবাদী রাষ্ট্র যেখানে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের কোন স্থান নেই।

'৭১-এ পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তা স্মরণকালের বৃহত্তম গণহত্যাযজ্ঞ সংঘটিত করেছে। তারা 'পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও 'ইসলাম রক্ষা'র দোহাই দিয়েই গণহত্যা ও নারী নির্যাতনসহ যাবতীয় দুষ্কর্ম করেছে। এই হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হয়েছে '৭১-এর ২৫ মার্চ থেকে এবং শেষ হয়েছে ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমাণ্ডের নিকট প্রায় বিরানব্বই হাজার পাকিস্তানি সৈন্যের আত্মসমর্পণের মাধ্যমে।

'৭১-এর ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ঘুমন্ত, নিরস্ত্র মানুষদের উপর। রাজধানী ঢাকায় প্রথমে তারা হামলা করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারীদের আবাসে এবং পুলিশ ও সীমান্ত রক্ষাকারী বাহিনী ইপিআর-এর সদর দফতরে। এরপর তারা ধ্বংস করেছে ঢাকার বস্তি, বাজার এবং হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাসমূহ। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের ঘরে ঢুকে কিংবা ঘর থেকে বের করে এনে হত্যা করেছে তারা। বাজার ও বস্তিগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আগুনের ভয়ে হাজার হাজার মানুষ যখন ঘর থেকে দলে দলে বেরিয়ে এসেছে তখন ওদের ওপর মেশিনগানের গুলি বর্ষিত হয়েছে একটানা, যতক্ষণ না প্রতিটি মানুষ নিহত হয়। এসব মানুষ জানতেও পারেনি কেন তাদের হত্যা করা হচ্ছে

১। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

কিংবা কারা হত্যা করছে। 'অপারেশন সার্চ লাইট'-এর নামে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ২৫ মার্চে রাতের অন্ধকারে শুধুমাত্র ঢাকায় পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার নিরীহ মানুষকে অকাতরে জীবন দিতে হয়েছিল।

ঢাকার এই পদ্ধতি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অনুসরণ করেছে দেশের প্রায় সকল শহরে। এই ধরনের ব্যাপক গণহত্যা চলেছিল পুরো নয় মাস জুড়ে। নির্বিচারে গণহত্যার পাশাপাশি সনাক্তকরণের মাধ্যমে হত্যার প্রক্রিয়াও আরম্ভ হয়েছিল ২৫ মার্চ থেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের হত্যার মাধ্যমে আরম্ভ হয়েছিল এই প্রক্রিয়া, যার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিজয় লাভের পূর্ববর্তী কয়েক সপ্তাহে। বিশেষ করে ডিসেম্বরের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহে পাকিস্তানিরা পরাজয় অনিবার্য জেনে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, চিকিৎসক, আইনজীবী, প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানীদের তালিকা প্রস্তুত করে হত্যা করেছিল।

নির্বিচার গণহত্যার ভেতর ক্ষেত্র বিশেষে অগ্রাধিকারেরও একটি বিষয় ছিল। পাকিস্তানিরা তাদের প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছিল— ১) আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী ও সমর্থকদের, ২) কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীদের, ৩) মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের সহযোগীদের, ৪) নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে হিন্দু সম্প্রদায়কে এবং ৫) ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের।

হত্যার কোন নির্দিষ্ট ধরন ছিল না। পাকিস্তানিরা প্রথমে ট্যাঙ্ক ও মর্টারের গোলাবর্ষণ করে এবং মেশিনগানের গুলিতে হত্যা করেছে এক একটি জনপদের বিশাল জনগোষ্ঠীকে। বাড়ি থেকে ধরে এনে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। বাড়ি বাড়ি হানা দিয়ে গুলি করে বা বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করা হয়েছে। গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। জ্যান্ত কবর দেয়ার বহু ঘটনাও ঘটেছে। কখনও পশুর মতো জবাই করে হত্যা করা হয়েছে। কখনও শারীরিক নির্যাতন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে হত্যা করা হয়েছে। শেষোক্ত পদ্ধতি তারা সাধারণতঃ অনুসরণ করত মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে। মুক্তিযোদ্ধাদের জিপের পেছনে বেঁধে প্রচণ্ড বেগে জিপ চালিয়ে সারা শহর টেনে হিঁচড়ে হত্যা করারও বহু প্রত্যক্ষদর্শী রয়েছে।

আমাদের কাছে জবানবন্দি দিতে গিয়ে ক্যাপ্টেন সুজাউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সন্দেহকারীদের গায়ে গ্রেনেড বেঁধে পিন খুলে তাদের পালাতে বলত পাকিস্তানিরা। হতভাগ্যরা দৌড়োতে গিয়ে কয়েক সেকেন্ডের ভেতর গ্রেনেড বিস্ফোরণে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেত। পাকিস্তানিরা এই দৃশ্য দেখে উল্লাস প্রকাশ করত।

মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী বাঙালিদের হত্যার জন্য পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নির্যাতনের এমন ভয়ঙ্কর সব পদ্ধতি অনুসরণ করত যা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। যাঁরা এ নির্যাতন প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরা বলেছেন, '৭১-এ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংসতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন হিটলারের নাৎসি বাহিনীর বর্বরতার চেয়ে ঢের বেশি ভয়ঙ্কর ছিল।

'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রে'র অষ্টম খণ্ডে পাকিস্তানি সৈন্যদের নির্যাতনের বেশ কিছু বিবরণ নথিবদ্ধ করা হয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীদের জবানিতে। নির্যাতিত

ব্যক্তিদের যে সকল জবানবন্দি আমরা ধারণ করেছি সেখানেও নির্যাতনের ভয়ঙ্কর সব বিবরণ রয়েছে।

নির্যাতনের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি পাকিস্তানি সামরিক কর্মকর্তা ও সাধারণ সৈন্যরা গ্রহণ করত তা হচ্ছে— ১) অশ্লীল ভাষায় গালাগালি, তৎসঙ্গে চামড়া ফেটে রক্ত না বেরুনো পর্যন্ত শারীরিক প্রহার, ২) পায়ের সঙ্গে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা, তৎসঙ্গে বেয়নেট দিয়ে খোঁচানো ও রাইফেলের বাট দিয়ে প্রহার, ৩) উলঙ্গ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উন্মুক্ত স্থানে দাঁড় করিয়ে রাখা, ৪) সিগারেটের আগুন দিয়ে সারা শরীরে ছ্যাঁকা দেয়া, ৫) হাত ও পায়ের নখ ও মাথার ভেতর মোটা সূঁচ ঢুকিয়ে দেয়া, ৬) মলদ্বারের ভেতর সিগারেটের আগুনের ছ্যাঁকা দেয়া এবং বরফ খণ্ড ঢুকিয়ে দেয়া, ৭) চিমটে দিয়ে হাত ও পায়ের নখ উপড়ে ফেলা, ৮) দড়িতে পা বেঁধে ঝুলিয়ে মাথা গরম পানিতে বার বার ডোবানো, ৯) হাত পা বেঁধে বস্তায় পুরে উত্তপ্ত রোদে ফেলে রাখা, ১০) রক্তাক্ত ক্ষতে লবন ও মরিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে দেয়া, ১১) নগ্ন ক্ষতবিক্ষত শরীর বরফের স্ল্যাবের ওপর ফেলে রাখা, ১২) মলদ্বারে লোহার রড ঢুকিয়ে বৈদ্যুতিক শক দেয়া, ১৩) পানি চাইলে মুখে প্রস্রাব করে দেয়া, ১৪) অন্ধকার ঘরে দিনের পর দিন চোখের ওপর চড়া আলোর বাল্ব জ্বেলে ঘুমোতে না দেয়া, ১৫) শরীরের স্পর্শকাতর অংশে বৈদ্যুতিক শক প্রয়োগ প্রভৃতি। এছাড়া যৌন নির্যাতনের ক্ষেত্রেও ভয়ঙ্কর নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছে পাকিস্তানি সৈন্যরা।

ঢাকা পৌরসভায় কয়েকজন সুইপারের জবানবন্দি থেকে পাকিস্তানি সৈন্যদের নৃশংসতা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করা যেতে পারে। এই সুইপারদের বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল লাশ সরাবার জন্য। '৭১-এর ২৯ মার্চের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে ছোটন ডোম-এর পুত্র সরকারি পশু হাসপাতালের সুইপার পরদেশী বলেছেন—

> '২৯শে মার্চ সকালে আমি ঢাকা পৌরসভা অফিসে হাজির হলে আমাকে ট্রাক দিয়ে লাশ তোলার জন্য আরও কয়েকজন সুইপারের সাথে শাখারী বাজারে যেতে বলা হয়। জজ কোর্টের সম্মুখে আগুনের লেলিহান শিখা তখনও জ্বলছিল, আর পাক সেনারা টহলে মোতায়েন ছিল বলে আমরা ট্রাক নিয়ে সে পথ দিয়ে শাখারী বাজারে প্রবেশ করতে পারি নাই। পাটুয়াটুলি ঘুরে আমরা শাখারী বাজারের পশ্চিম দিকে প্রবেশ করে পাটুয়াটুলি ফাঁড়ি পার হয়ে আমাদের ট্রাক শাখারী বাজারের মধ্যে প্রবেশ করল। ট্রাক থেকে নেমে আমরা শাখারী বাজারের প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রবেশ করলাম— দেখলাম মানুষের লাশ, নারী পুরুষ, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, বালক বালিকা, কিশোর, শিশুর বীভৎস পচা লাশ। চারদিকে ইমারতসমূহ ভেঙে পড়ে আছে। মেয়েদের অধিকাংশ লাশ আমি সম্পূর্ণ উলঙ্গ দেখলাম। দেখলাম তাদের বুক থেকে স্তন তুলে নেওয়া হয়েছে। কারও কারও যোনিপথে লাঠি ঢুকানো আছে। বহু পোড়া, ভস্ম লাশ দেখেছি। পাঞ্জাবি সেনারা পাষণ্ডের মত লাফাতে লাফাতে গুলিবর্ষণ করছিল। বিহারী জনতা শাখারী বাজারের প্রতিটি ঘরে প্রবেশ করে মূল্যবান আসবাবপত্র, সোনা-দানা লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছিল। আমরা অবিরাম গুলিবর্ষণের মুখে প্রাণের ভয়ে দুই ট্রাক লাশ তুলে লাশ তোলার জন্য সেদিন আর শাখারী বাজারের প্রবেশ করার সাহস পাই নাই। ৩০শে মার্চ সকালে আমার দলকে মিলব্যারাক থেকে লাশ তুলতে বলা হয়।

'আমি মিলব্যারাক ঘাটে পৌরসভার ট্রাক নিয়ে গিয়ে দেখলাম নদীর ঘাটে অসংখ্য মানুষের লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, বহু লাশ রশি দিয়ে বাঁধা দেখলাম। প্রতিটি রশির বন্ধন খুলে প্রতি দলে দশ জন পনের জনের লাশ বের করলাম। সব যুবক ছেলে ও স্বাস্থ্যবান বালকদের লাশ দেখলাম। প্রতিটি লাশের চোখ বাঁধা, হাত বাঁধা, শক্ত করে পিছন দিক থেকে। প্রতিটি লাশের মুখমণ্ডল কালো দেখলাম, এসিডে জ্বলে বিকৃত ও বিকট হয়ে আছে। লাশের সামনে গিয়ে ঔষধের অসহ্য গন্ধ পেলাম। লাশের কোন দলকে দেখলাম মেশিনগানের গুলিতে বুক ও পিঠ ঝাঁঝরা হয়ে আছে, অনেক লাশ দেখলাম বেটন ও বেয়নেটের আঘাতে বীভৎস হয়ে আছে, কারও মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মগজ বের হয়ে আছে, কারও হৃৎপিণ্ড বের হয়ে আছে। নদীর পাড়ে ছয়জন রূপসী যুবতীর বীভৎস ক্ষতবিক্ষত, উলঙ্গ লাশ দেখলাম। চোখ বাঁধা, হাত, পা, শক্ত করে বাঁধা প্রতিটি লাশ গুলির আঘাতে ঝাঁঝরা, মুখমণ্ডল, বক্ষ ও যোনিপথ রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত ও বীভৎস দেখলাম। দুইবারে দুই ট্রাকে আমি সত্তরটি লাশ উঠিয়ে ধলপুর ময়লা ডিপোতে ফেলেছি।

'এরপর আমাকে সদরঘাট, শ্যামবাজার, বাদামতলী ঘাট থেকে লাশ তুলতে বলা হয়। আমি উপরোক্ত এলাকার নদীর ঘাট থেকে পচা লাশ তুলে ধলপুর ময়লা ডিপোতে ফেলেছি। আমি যেদিন কালীবাড়ি লাশ তুলেছি সেদিন সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের পিছনে ষ্টাফ কোয়ার্টার, রোকেয়া হলের পশ্চিম দিকে জনৈক অধ্যাপকের বাসা থেকে আমি লাশ তুলেছি। রোকেয়া হলের পিছনের ষ্টাফ কোয়ার্টারের ভিতর থেকে আমি পুরুষ ও শিশু সমেত নয়টি লাশ তুলেছি। আর অধ্যাপকের বাসা থেকে সিঁড়ির সামনে লেপের ভিতর পেচানো জনৈক অধ্যাপকের লাশ আমি তুলে নিয়ে গেছি।'[২]

বর্বরতা কতটা চরম রূপ ধারণ করলে হত্যা করা যেতে পারে শিশুর মতো নিষ্পাপ, ঋষির মতো সরল এবং সংসার সম্পর্কে উদাসীন বৃদ্ধ দার্শনিক গোবিন্দচন্দ্র দেবকে— পাকিস্তানিরা তা প্রদর্শন করেছে একাত্তরে।

'৭০-এর নির্বাচনে জয়ী পাকিস্তানের জাতীয় সংসদের সদস্য আওয়ামী লীগের জনপ্রিয় নেতা মশিহুর রহমানকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কী নৃশংস নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করেছে তার বিবরণ '৭২-এর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। দৈনিক বাংলার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে—

'ভীষণ যন্ত্রণা দিয়ে পাক হানাদার বাহিনী তিল তিল করে তাঁকে সংহার করেছে। . . . এই ঘৃণিত পশুর দল প্রথমে তাকে নীতিচ্যূত করার জন্য নানা ধরনের অত্যাচার চালায়। শরীরের নানা স্থানে আগুনে পোড়ানো, দেহকে বেত্রাঘাতে রক্তাক্ত করে তাতে লবণ মাখান থেকে আরম্ভ করে ইলেকট্রিক শক পর্যন্ত লাগান হয়েছে। অত্যাচারে যখন তাঁর বলিষ্ঠ দেহটা ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হয়ে পড়ছিল তখনও তাঁর মনের বলিষ্ঠতা একটুও কমেনি। সব সময় তিনি একই কথা বলেছেন, 'আমি আমার জনগণের বিরুদ্ধে কিছু বলতে বা লিখতে পারব না।'

'সত্যিই তিনি তা পারেননি। হানাদার বাহিনী যখন তাঁর বাম হাত কেটে ফেলে ডান হাতে লেখার জন্য হুকুম চালায় তখন যন্ত্রণায় শুধু কেঁপেছেন তিনি। কিন্তু তাঁর বলিষ্ঠ ঠোঁট দুটো

২। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : অষ্টম খণ্ড, সম্পাদক : হাসান হাফিজুর রহমান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, জুন ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ৫১-৫২

একটুও কাঁপেনি। প্রতিদিনে একে একে হানাদার পশুরা যখন তাঁর দুই পা, দুই হাত কেটে বিকলাঙ্গ দেহের পরে অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছে তখনও একটু কেঁপে ওঠেনি তাঁর দৃঢ়ভাবে বন্ধ ঠোঁট দুটো।'[৩]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বদেশে ফিরে যখন এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের খবর শুনেছেন তখন তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন।

তিন

দখলদার বাহিনী কর্তৃক নারী নির্যাতন কোনও ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানির নাৎসি বাহিনী, ইটালির ফ্যাসিস্ট বাহিনী কিংবা জাপানী সৈন্যদের নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের বহু ঘটনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং চলচ্চিত্রেও রূপায়িত হয়েছে। কিন্তু একাত্তরে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে যে নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছে তার দ্বিতীয় কোনও নজির নেই। আড়াই লাখেরও বেশি নারী এই সময় পাকিস্তানিদের দ্বারা ধর্ষিত হয়েছেন। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে বহু নারী আত্মহত্যা করেছেন। পাকিস্তানিরাও তাদের ধর্ষকামী প্রবৃত্তির কারণে বহু নারীকে ভয়ঙ্কর সব নির্যাতনের পর হত্যা করেছে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, গণহত্যার বহু সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেলেও নারী নির্যাতনের বিবরণ সেভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি। এ সমাজে একজন ধর্ষিতা নারী এ বিষয়ে সাধারণভাবে বলতে চান না সংস্কার এবং সামাজিক ও পারিবারিক বৈরিতার কারণে।

মুক্তিযুদ্ধের পর আওয়ামী লীগ সরকার নির্যাতিতা নারীদের পুনর্বাসনের জন্য কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ব্যক্তিগতভাবেও এঁদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং এঁদের 'বীরাঙ্গনা' হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। সেই সময়ে নির্যাতিতা নারীদের পুনর্বাসনের দায়িত্বে নিযুক্ত সমাজকর্মী মালেকা খান বলেছেন, তখন কোনও তালিকা তৈরি করা হয়নি, কারণ তাঁরা চেয়েছিলেন এই সব নারীদের পৃথকভাবে চিহ্নিত না করে দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। ঢাকায় মালেকা খান পাঁচ হাজারের বেশি নির্যাতিতা নারীর জবানবন্দি নিজে পাঠ করেছেন। এসব কাগজপত্র বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর ধ্বংস করে ফেলা হয়। মালেকা খান আমাদের আরও জানিয়েছেন প্রথম পর্যায়ে যাদের গর্ভপাত করানো সম্ভব ছিল তাদের গর্ভপাত করানো হয়েছে।[৪]

মালেকা খান আমাদের সন্ধান দিয়েছেন বাহাত্তরে অস্ট্রেলিয়া থেকে আসা ডাঃ জিওফ্রে ডেভিসের। নির্যাতিতা নারীদের চিকিৎসা সেবাদানের জন্য সিডনীর এই চিকিৎসক বাংলাদেশের সকল জনপদ পরিভ্রমণ করেছেন। তাঁর মতে মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিতা নারীর সংখ্যা চার লাখেরও বেশি। তাঁর সম্পর্কে '৭২-এর বাংলার বাণীতে তখন এক প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল—

'দখলদার আমলে পাকিস্তানি সেনা কর্তৃক ধর্ষিত বাংলাদেশের মহিলাদের একটা বিরাট

৩। দৈনিক বাংলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২

৪। সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ২৮ জুন, ১৯৯৮

অংশ বন্ধ্যাত্ব ও পৌনপুনিক রোগের সম্মুখীন হয়েছে বলে একজন অষ্ট্রেলিয়ান চিকিৎসক মত প্রকাশ করেছেন।
সিডনীর শল্য চিকিৎসক ডঃ জিওফ্রে ডেভিস সম্প্রতি লন্ডনে বলেন যে, ন' মাসে পাক বাহিনীদের দ্বারা ধর্ষিতা ৪ লাখ মহিলার বেশীর ভাগই সিফিলিস অথবা গনোরিয়া কিংবা উভয় ধরনের রোগের শিকার হয়েছেন। এদের অধিকাংশ ইতিমধ্যেই ভ্রূন হত্যাজনিত অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। তিনি বলেন, এরা বন্ধ্যা হয়ে যেতে পারেন কিংবা বাকী জীবনভর বারবার রোগে ভুগতে পারেন।
ডঃ ডেভিস বলেন, বাংলাদেশে কোন সাহায্য এসে পৌছুবার আগেই পাকিস্তানি সৈন্যদের ধর্ষণের ফলে ২ লাখ অন্তঃসত্ত্বা মহিলার সংখ্যাগরিষ্ঠাংশ স্থানীয় গ্রামীণ ধাত্রী বা হাতুড়ে ডাক্তারের সাহায্যে গর্ভপাত ঘটিয়েছেন। তিনি বলেন, ক্লিনিক্যাল দিক থেকে গর্ভপাত কর্মসূচী সমাপ্ত হয়েছে, কিন্তু মহিলাদের কঠিন সমস্যা এখনো রয়ে গেছে।
ডঃ ডেভিস বলেন, আমরা বিরাজমান সমস্যা সম্পর্কে অবগত হবার আগেই অনিবার্য ও অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির চাপে ২ লাখ ধর্ষিতার মধ্যে দেড় লাখ থেকে ১ লাখ ৭০ হাজার অন্তঃসত্ত্বা মহিলা গর্ভপাত করেছেন।
ডঃ ডেভিসের মতে দীর্ঘ মেয়াদী জটিলতা খুবই গুরুতর। বেশ কিছু সংখ্যক তরুণী যৌন মিলনের উপযোগী না হওয়ায় সমস্যা বেশী জটিল হয়েছে। তিনি বলেন, 'দূর্ভাগা মহিলারা যদি রোগের চিকিৎসা লাভে সক্ষমও হন তবুও তাদের বিয়ে করার মত কোন একজনকে খুঁজে পাওয়া খুবই কষ্টকর।'
ধর্ষিতা মহিলারা যখন কমপক্ষে ১৮ সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা তখন ডাঃ ডেভিস ঢাকা এসে পৌছান।
ধর্ষিতাদের চিকিৎসার জন্যে ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় একটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়। সরকারী কর্মচারীদের হিসাব মতে ধর্ষিতা মহিলাদের আনুমানিক সংখ্যা ২ লাখ। ডাঃ ডেভিসের মতে এই সংখ্যা অনেক কম করে অনুমান করা হয়েছে। তিনি মনে করেন এই সংখ্যা ৪ লাখ থেকে ৪ লাখ ৩০ হাজারের মধ্যে হতে পারে। ডাঃ ডেভিস বলেন, অন্তঃসত্ত্বা মহিলার সংখ্যাই ২ লাখ।
অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের সাহায্য সংক্রান্ত কর্মসূচীর শুরু হবার আগেই দেড় লাখ থেকে ১ লাখ ৭০ হাজার মহিলা গর্ভপাত করেছেন। অবশিষ্ট ৩০ হাজারের মধ্যে কেউ কেউ আত্মহত্যা করেছেন, কেউ কেউ তাদের শিশুদের নিজের কাছে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ...
ধর্ষিতা মহিলাদের যে হিসাব সরকারীভাবে দেয়া হয়েছে ডাঃ ডেভিসের মতে তা সঠিক নয়। সরকারী কর্মকর্তারা বাংলাদেশের জেলাওয়ারী হিসাব করেছেন। সারা দেশের ৪৮০টি থানা ২৭০ দিন পাক সেনাদের দখলে ছিল। প্রতিদিন গড়ে ২ জন করে নিখোঁজ মহিলার সংখ্যা অনুসারে লাঞ্ছিত মহিলার সংখ্যা দাঁড়ায় ২ লাখ। এই সংখ্যাকে চুড়ান্তভাবে নির্ভূল অঙ্ক রূপে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
কিন্তু হানাদার বাহিনী গ্রামে গ্রামে হানা দেবার সময় যেসব তরুণীকে ধর্ষণ করেছে তার হিসাব রক্ষণে সরকারী রেকর্ড ব্যর্থ হয়েছে। পৌনপুনিক লালসা চরিতার্থ করার জন্যে হানাদার বাহিনী অনেক তরুণীকে তাদের শিবিরে নিয়ে যায়। এসব রক্ষিত তরুণীদের অন্তঃসত্ত্বার লক্ষণ কিংবা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে হয় তাদের পরিত্যাগ করা হয়েছে, নয়তো হত্যা করা হয়েছে।

কোন কোন এলাকায় ১২ ও ১৩ বছরের বালিকাদের শাড়ী খুলে নগ্ন করার পর ধর্ষণ করা হয়েছে। যাতে তারা পালিয়ে যেতে বা আত্মহত্যা করতে না পারে।

হতভাগা বন্দি নারীদের যখনই শাড়ী পরতে দেয়া হয়েছে তখনই তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেছে। ডাঃ ডেভিস বলেন, অনেকেই বুকে পাথর বেঁধে পুলের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছেন। যারা প্রাণে বেঁচে গেছে তেমন ধরনের হাজার হাজার মহিলা তাদের পরিবার কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছেন। কারণ তাঁরা ধর্ষিতা, অন্তঃসত্ত্বা। বর্তমানে দেখতে 'অপরিচ্ছন্ন'। এ ধরনের ঘটনা বড়ই মর্মান্তিক।

ডাঃ ডেভিস বলেন, 'চট্টগ্রামে আমি একজন মহিলাকে দেখেছি, তিনি বিধবা। যুদ্ধে তাঁর ঘর বাড়িধ্বংস হয়ে গেছে। তাঁর সন্তান দু'টি এবং তিনি ছ'মাসের অন্তঃসত্ত্বা। গর্ভপাত ঘটানোর পর এই মহিলার থাকার মত স্থান নেই। ছেলে মেয়েদের আহার যোগানোর কোন সংস্থান নেই।

আরেকজন মহিলার স্বামী যখন যুদ্ধে গেছেন তখন তাকে হানাদাররা ধর্ষণ করে। স্বামী এসে স্ত্রীকে দেখেন গর্ভবতী। তিনি স্ত্রী এবং দু'টি সন্তানকে ফেলে চলে যান। এবং এ বলে যান যে, আর তিনি তাদের গ্রহণ করবেন না।

আরেকজন তরুণী বয়স ১৯। অশিক্ষিতা। সে ছিল ছয় মাসের গর্ভবতী। তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব তাকে ত্যাগ করে চলে যায়। সে স্বল্প কালের জন্য সাহায্য কেন্দ্রে আশ্রয় পেয়েছে। কিন্তু তারপর সে কোথায় যাবে কেউ জানে না।'[৫]

বাহাত্তরে যে সব যুদ্ধশিশুর জন্ম হয়েছে তাদের সম্পর্কেও তথ্য খুব কমই রয়েছে। অধিকাংশ শিশুকে ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন পরিবার দত্তক হিসেবে গ্রহণ করেছে।

সরকারি পুনর্বাসন কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপিকা নীলিমা ইব্রাহিম। নির্যাতিত নারীদের কয়েকজনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' নামে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থও তিনি লিখেছেন। তাঁর গ্রন্থে যাঁদের উল্লেখ রয়েছে তাঁরা মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শিক্ষিত পরিবারের সন্তান, যাঁদের মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস আটক রাখা হয়েছিল বাঙ্কারে বা বন্দী শিবিরে। এঁদের একজন লিখেছেন—

'আমাদের শাড়ি পরতে বা দোপাট্টা ব্যবহার করতে দেয়া হতো না। কোন ক্যাম্পে নাকি কোন মেয়ে গলার শাড়ির ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। তাই আমাদের পরনে শুধু পেটিকোট আর ব্লাউজ। যেমন ময়লা তেমনি ছেঁড়া-খোঁড়া। মাঝে মাঝে শহরের দোকান থেকে ঢালাও এনে আমাদের প্রতি ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিত। যেমন দুর্গাপূজা বা ঈদের সময় ভিক্ষা দেয় অথবা যাকাত দেয় ভিখারিকে। চোখ জলে ভরে উঠত।

'... পরদিন হঠাৎ একটি মেয়ে মারা যায়। অন্তসত্ত্বা ছিল। সকাল থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। ওরা বন্ধ দরজায় অনেক চেঁচামেচি করল। কেউ এল না। ... মেয়েটার নাম ছিল ময়না। বছর পনের বয়স হবে। কাটা পাঁঠার মতো হাত পা ছুড়ে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল, মুখখানা নীল হয়ে গেল। বয়স্কা সুফিয়ার মা একটা ছোট কম্বল দিয়ে ঢেকে দিল কারণ, ঘরে ওরা চাদর দেয় না। সন্ধ্যার পরা ওরা লাশটা নিয়ে গেল।'[৬]

এ ধরনের বিবরণ রয়েছে নীলিমা ইব্রাহিমের গ্রন্থের সর্বত্র।

৫। বাংলার বাণী, গণহত্যা বিশেষ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৭২

৬। 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি,' নীলিমা ইব্রাহিম, জাগৃতি প্রকাশনী ঢাকা, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ১৫-১৬

বীরাঙ্গনাদের তালিকা সম্পর্কে অধ্যাপিকা নীলিমা ইব্রাহিম বলেছেন, স্বয়ং বঙ্গবন্ধু এই তালিকা ধ্বংস করে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কারণ তিনি এটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, আমাদের সমাজ এঁদের স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করার মতো উদার নয়। বঙ্গবন্ধু আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন একাত্তরের নির্যাতিতা নারীরা যেন স্বাভাবিক পারিবারিক জীবনে ফিরে যেতে পারেন।

নীলিমা ইব্রাহিম আরও বলেছেন, '৭২ সালে যখন পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিরা ভারতের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ থেকে চলে যাচ্ছিল তখন তিনি খবর পান যে, প্রায় তিরিশ/চল্লিশজন ধর্ষিতা নারী তাদের সঙ্গে দেশত্যাগ করছেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় এবং বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় এঁদের সঙ্গে দেখা করেন এবং বাংলাদেশে থেকে যাওয়ার অনুরোধ করেন। কিন্তু আপনজন কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে তাঁরা দেশ ত্যাগে অনড় ছিলেন। এঁদের ভেতর চোদ্দ/পনের বছরের এক কিশোরীও ছিল। নীলিমা ইব্রাহিম এই কিশোরীকে বলেছিলেন, 'তুমি আমার বাড়িতে থাকবে, আমার মেয়ের মতো।' তবু সে রাজী হয়নি। বলেছে, 'আপনি যখন থাকবেন না তখন কী হবে? যখন লোকে জানবে পাকিস্তানিরা আমাকে স্পর্শ করেছে তখন সবাই আমাকে ঘৃণা করবে।' নীলিমা ইব্রাহিম বলেছেন, 'তুমি কী জান পাকিস্তানিরা তোমাকে নিয়ে কী করবে?' মেয়েটি জবাব দিয়েছে, 'জানি, ওরা আমাকে নিয়ে বিক্রি করে দেবে। কিন্তু ওখানে কেউ আমাকে চিনবে না।'[৭]

শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে '৯২-এর ২৬ মার্চ যখন গণআদালতে যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের বিচার হয়— কুষ্টিয়া থেকে তিনজন বীরাঙ্গনা ঢাকা এসেছিলেন সাক্ষ্য দিতে। তখন বিভিন্ন দৈনিকে তাঁদের কথা লেখা হয়। এঁরা তিনজন গ্রামে ফিরে নিজেদের আবিষ্কার করেন একরকম একঘরে অবস্থায়। লোকজন তাদের বিভিন্নভাবে বিদ্রুপ করেছে। তাঁদের জীবনে নেমে এসেছে আরেক বিড়ম্বনা। একাত্তরের নির্মম ক্ষত আবার তাঁদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণের কারণ হয়েছে। তাঁরা যতদিন বেঁচে থাকবেন এ রক্তক্ষরণ বন্ধ হবে না। তাঁদের একজন ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন, বিচারের আশায় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে ঢাকায় ছুটে এসেছিলেন। আজ অবধি তাঁরা বিচার পাননি অথচ প্রতিনিয়ত গঞ্জনার শিকার হচ্ছেন।[৮]

একাত্তরে আমরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সীমাহীন নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতা যেমন প্রত্যক্ষ করেছি, পাশাপাশি দেখেছি ভারতীয় সেনাবাহিনীর মহত্ত্ব। পাকিস্তানি বন্দি শিবির থেকে বেরিয়ে আসা মুক্তিযোদ্ধা কিংবা যুদ্ধক্ষেত্রে পাকিস্তানিদের গোলাগুলির আঘাতে আহত কয়েক হাজার মুক্তিযোদ্ধার চিকিৎসা ভারতীয় সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন হাসপাতালে করা হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে যে সব যুদ্ধাহতরা ছিলেন তাদেরও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর মানবিক আচরণের একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে নীলিমা ইব্রাহিমের গ্রন্থ থেকে। বাঙ্কারে বন্দি নির্যাতিতা নারীরা ১৬ ডিসেম্বর যখন প্রথম

৭। সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ৯ অক্টোবর, ১৯৯৮

৮। সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭

'জয় বাংলা' শ্লোগান শুনলেন তখন তাঁরা হতবিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন দেশ হানাদার মুক্ত হয়েছে, কিন্তু তাঁদের তখন বেরুবার উপায় নেই। কারণ তাঁদের পরিধানে কোনও বস্ত্র ছিল না। নীলিমা ইব্রাহিম নির্যাতিতা শেফার জবানিতে লিখেছেন—

'হঠাৎ অনেক লোকের আনাগোনা, চেঁচামেচি কানে এল। একজন বাঙ্কারের মুখে উঁকি দিয়ে চিৎকার করল, কোই হ্যায়; ইধার আও। মনে হল আমরা এক সঙ্গে কেঁদে উঠলাম। ঐ ভাষাটা আমাদের নতুন করে আতঙ্কগ্রস্ত করল। এরপর কয়েকজনের মিলিত কণ্ঠ, এবারে মা আপনারা বাইরে আসুন। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। আমরা আপনাদের নিতে এসেছি। চিরকালের সাহসী আমি উঠলাম। কিন্তু এত লোকের সামনে আমি সম্পূর্ণ বিবস্ত্র, উলঙ্গ। দৌড়ে আবার বাঙ্কারে ঢুকতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু যে বলিষ্ঠ কণ্ঠ প্রথম আওয়াজ দিয়েছিল, 'কোই হ্যায়,' সেই বিশাল পুরুষ আমাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে নিজের মাথার পাগড়ীটা খুলে আমাকে যতটুকু সম্ভব আবৃত করলেন। ভেতরে আরও ছয়জন আছে বলায় আশপাশ থেকে কিছু লুঙ্গি, শার্ট জোগাড় করে ওরা একে একে বেরিয়ে এল এবং ওদের কোন রকমে ঢাকা হল। আমি ওই শিখ অধিনায়ককে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কেঁদে ওঠলাম। ভদ্রলোক আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'রো মাৎ মায়ি।'

এরপর শেফা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গেছেন। বিয়ের পর তাঁর প্রথম সন্তানের নাম শ্বশুর রেখেছিলেন আরমান। কিন্তু শেফা ওকে ডাকেন 'যোগী' বলে।

'কেউ জানে না এ নামের পরিচয়। শুধু শেফা এ নামটা তার হৃদয়ে রক্ত দিয়ে লিখে রেখেছে। শ্বাপদ শঙ্কুল অরণ্যে শেফা সেদিন একজন দেবদূত প্রত্যক্ষ করেছিল, তার নাম যোগীন্দর সিং, যে তার পবিত্র শিরস্ত্রাণ খুলে শেফার অপবিত্র দেহটাকে ঢেকে দিয়েছিল আর কয়েকবার তাকে মাতৃ সম্বোধন করেছিল। তাই শেফা মনে মনে যোগীন্দরকে তার প্রথম সন্তান ভাবে। আরমানকে যোগী ডেকে তাকে চুমুতে ভরিয়ে দেয়। মনে মনে বলে আল্লাহ যেন তেমনই সারা জীবন মায়ের সম্মানের হেফাজত করে।'[৭]

ভারতীয় সেনাবাহিনীর এসব মানবিক আচরণ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বর্বরতাকে আরও প্রকট করে তুলেছে।

চার

একাত্তরের ষোল ডিসেম্বর প্রায় বিরানব্বই হাজার পরাজিত পাকিস্তানি সৈন্য বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমান্ডের নিকট আত্মসমর্পণ করে। বাহাত্তরের দশ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

যুদ্ধাপরাধী ছিল দুই ধরনের— ১) পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সদস্য এবং ২) পাকিস্তানি সামরিক জান্তার সহযোগী এদেশীয় ব্যক্তি, যারা প্রধানত জামাতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলামী প্রভৃতি দল করত। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ভেতর প্রধান প্রধান যুদ্ধাপরাধীদের একাধিক তালিকা তখন বাংলাদেশ সরকার প্রণয়ন

৭। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭৬

করেছিল। প্রথম তালিকায় পাঁচ শতাধিক যুদ্ধাপরাধীর নাম ছিল। পরে তা কমিয়ে দুইশত করা হয়।[১০]

পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর অনড় মনোভাব, যিনি বলেছিলেন যুদ্ধাপরাধী হিসেবে একজন পাকিস্তানি সৈন্যেরও যদি বিচার করা হয় তাহলে পাকিস্তান আটকে পড়া বাঙালিদের ফেরত দেবে না। তখন পাকিস্তানে প্রায় পাঁচ লক্ষ বাঙালি বন্দি অথবা প্রায়বন্দি অবস্থায় অবস্থান করছিল। ভারতের নীতি নির্ধারকরা বলেছেন এবং লিখেছেনও, ভারত সিমলা চুক্তির আগে চেয়েছিল বাংলাদেশ কিছু সংখ্যক পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীর বিচারের উদ্যোগ গ্রহণ করুক, কিন্তু বাংলাদেশ তখন রাজী হয়নি। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর উপদেষ্টা পি এন হাকসার বলেছেন, তিনি সিমলা চুক্তির আগে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দুই দফা বৈঠক করেছেন কিন্তু তিনি এতে রাজী হননি। তাঁর যুক্তি ছিল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে গেলে আটকেপড়া বাঙালিদের ফেরত আনার ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দিতে পারে এবং পাকিস্তান ও ইসলামী বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে।[১১]

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের অনেকের অভিমত পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বিজয়ী দেশ হিসেবে ভারতও করতে পারত। এ বিষয়ে ভারতের বক্তব্য ছিল, যেহেতু যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত হয়েছে বাংলাদেশে এবং ভারত বাংলাদেশকে সিমলা চুক্তির অনেক আগেই স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, ভারতের পক্ষে পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী সম্ভব ছিল না।

সিমলা চুক্তির অধীনে যে পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের ভারত ফেরত দিয়েছে একাত্তরের যুদ্ধে তাদের হাতে কয়েক হাজার ভারতীয় সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিরও মৃত্যু ঘটেছে। যে সব ভারতীয় সৈন্য তখন পাকিস্তানিদের হাতে ধরা পড়েছিল তাদের নৃশংস নির্যাতনের পর হত্যা করা হয়েছে। একাত্তরের পর কারগিল যুদ্ধেও দেখা গেছে গ্রেফতারকৃত ভারতীয় সৈন্যদের পাকিস্তানিরা কী নৃশংসভাবে হত্যা করেছে।

বঙ্গবন্ধু এদেশীয় ঘাতক, দালাল, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য দালাল আইন প্রণয়ন করেছিলেন '৭২-এর জানুয়ারিতে। এতে বলা হয়েছিল— যে বা যারা ব্যক্তিগতভাবে অথবা সংগঠনগতভাবে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে নির্যাতন, সম্পদহানি, ধ্বংসযজ্ঞে সমর্থন দিয়েছে বা সহযোগিতা করেছে বা নিজেরা এতে অংশগ্রহণ করেছে কিংবা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দখলদার বাহিনীর যুদ্ধ এবং তাদের অবৈধ দখলদারিত্বকে সমর্থন দিয়েছে, তাদের বিচারের জন্য এই নির্দেশ জারি করা হয়েছে। এতে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে কিভাবে ট্রাইবুনাল গঠিত হবে এবং বিচারকার্য সম্পন্ন হবে।[১২]

১০। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

১১। সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, নয়াদিল্লী ২০ জানুয়ারি ১৯৯৬

১২। ২৪ জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখে প্রকাশিত বাংলাদেশ সরকারের গেজেট। শিরোনাম ঃ President Order No. 8 of 1972 : Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order 1972.

বাহাত্তরের জানুয়ারিতে ঘোষিত দালাল আইনে পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কোন সুযোগ ছিল না। মূলতঃ তাদের বিচারের আওতায় আনা এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্র প্রসারিত করার প্রয়োজনে '৭৩ সালের জুলাই মাসে প্রণীত হয় 'ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস (ট্রাইবুনালস) এ্যাক্ট ১৯৭৩।' যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য এই সব আইন প্রণয়ন করা হলেও তার কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। দালাল আইনে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রণয়নের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল স্ব স্ব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের উপর, যাদের অধিকাংশ একাত্তরে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার অধীনে চাকরি করেছেন। ফলে অভিযুক্তদের সম্পর্কে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিযোগ প্রণয়নকারীদের মনোভাব যথেষ্ট কঠোর বা পক্ষপাতশূন্য ছিল না।

বিচারের ক্ষেত্রে এই সমস্যা লক্ষ্য করে দৈনিক বাংলায় 'দালাল আইন সংশোধন প্রয়োজন' শিরোনামে এক প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল—

> 'দেশ স্বাধীন হবার পর দালাল বলে যাদের আটক করা হয়েছে তাদের শতকরা ৭৫ জনেরই মুক্তি পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ এই বিপুল সংখ্যক ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে না।...
>
> 'পুলিশের সংখ্যা এমনিতেই অপ্রতুল। তদুপরি কোলাবরেটর এ্যাক্ট-এ অভিযোগ তদন্তের ভার দেওয়া হয়েছে শুধু থানার ওসিকে। কিন্তু ওসির পক্ষে একা অসংখ্য মামলার তদন্ত করা এক প্রকার অসম্ভব।.....
>
> 'এছাড়া দালাল আইন সম্পর্কেও কিছু মন্তব্য রয়েছে আইন বিশেষজ্ঞদের। তাঁরা বলেছেন, দালাল আইন করা হয়েছে একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে সংঘটিত অপরাধের বিচার করার জন্য। কাজেই সে অপরাধ প্রমাণের জন্যে থাকতে হবে সাক্ষ্য প্রমাণের বিশেষ ধরন। কিন্তু বর্তমান আইনে সাক্ষ্য প্রমাণের জন্য অনুসরণ করতে হয় একশ' বছরের পুরনো 'এভিডেন্স অ্যাক্ট'। এই অ্যাক্ট হয়েছে বিশেষ পরিস্থিতিতে সংঘটিত অপরাধের বিচারের জন্য। কাজেই বিশেষ পরিস্থিতির অপরাধের প্রমাণের জন্য প্রণীত এভিডেন্স অ্যাক্ট অনুসরণ করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে নানা জটিলতা। ফলে অপরাধ প্রমাণ করা হয়ে উঠেছে অনেক ক্ষেত্রে দুঃসাধ্য।'[১৩]

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে প্রতিপক্ষ একটি গৎবাঁধা কথা সব সময় বলে— এদের সাধারণ ক্ষমা করেছিল আওয়ামী লীগ সরকার, ফলে নতুন করে তাদের বিচারের বিষয়টি অবান্তর। এ কথাও বহুবার বলা হয়েছে পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের কেউ ক্ষমা করেনি। তাদের প্রধান সহযোগী গোলাম আযম সহ অন্যান্য যুদ্ধাপরাধীদেরও ক্ষমা করা হয়নি। ৩০ নবেম্বর '৭৩ তারিখে যে সরকারি প্রেসনোটে সাধারণ ক্ষমা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে তার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে রয়েছে— ধর্ষণ, খুন, খুনের চেষ্টা, ঘরবাড়ি অথবা জাহাজ-অগ্নিসংযোগের দায়ে "দণ্ডিত ও অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ১নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক ক্ষমা প্রদর্শন প্রযোজ্য হইবে না।" সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর দালাল আইনে আটক ৩৭ হাজার ব্যক্তির ভেতর প্রায় ২৬ হাজার ছাড়া পেয়েছিল, তারপরও ১১ হাজার ব্যক্তি এ সকল অপরাধের দায়ে কারাগারে আটক ছিল।

১৩। দৈনিক বাংলা, ২৩ জুলাই ১৯৭২

১৯৭৫-এর ৩১ ডিসেম্বর বিচারপতি সায়েম ও জেনারেল জিয়ার সামরিক সরকার দালাল আইন বাতিল করে। যার ফলে এই ১১ হাজার ব্যক্তির পক্ষে আপিল করে জেল থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ ঘটে।

একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে '৯২-এর জানুয়ারিতে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি।' ফেব্রুয়ারিতে একই উদ্দেশ্যে তাঁরই নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সকল রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় 'জাতীয় সমন্বয় কমিটি।' যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে দেশের সর্বস্তরের নাগরিকরা সোচ্চার হয়েছিল। এই সংক্ষুব্ধ জনমতের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল গণআদালতে যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের প্রতীকী বিচারের মাধ্যমে। তৎকালীন বিএনপি সরকার এই গণআদালতের উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করেছিল।

১৯৯২ সালের ১৬ এপ্রিল জাতীয় সংসদে তৎকালীন বিরোধীদলের নেত্রী শেখ হাসিনা গণআদালত এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রসঙ্গে বলেছিলেন—

'..... এই গণআদালত যে রায় দিয়েছে তাতে তারা কিন্তু আইন নিজের হাতে তুলে নেয়নি, মাননীয় স্পীকার। যেহেতু তারা আইন নিজের হাতে তুলে নেয়নি সেহেতু নিশ্চয়ই তাদেরকে বেআইনী বলার কোন অধিকার নেই, কোন অবকাশ নেই। তারা কি বলেছেন? বলেছেন যে, গোলাম আযম একজন যুদ্ধাপরাধী। এই যুদ্ধাপরাধীর অপরাধগুলি এখানে (গণআদালতের রায়ের কাগজ দেখিয়ে) লিপিবদ্ধ আছে এবং এই সকল অপরাধে যিনি অপরাধী তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ডতুল্য। আমরা গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, জনগণের ম্যাণ্ডেটের মধ্য দিয়ে এই সংসদে এসেছি। আমি মনে করি, গণআদালতের যে রায়, সেই রায়ে তারা বলেছেন যে, এই অপরাধ মৃত্যুদণ্ডযোগ্য। আজকে এই সংসদে যারা আছেন, যারা আমার সামনে বসে আছেন, তাদের মধ্যে অনেকেই বিগত মুক্তিযুদ্ধে স্বামী হারিয়েছেন, ভাই হারিয়েছেন, মা-বোনেরা লাঞ্ছিত হয়েছেন। যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন তারা দিনের পর দিন না খেয়ে রাইফেল হাতে লড়াই করেছেন। যারা নয়টি মাস অত্যন্ত কষ্টের মধ্য দিয়ে নিজের জীবনকে বাজী রেখে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এই দেশ স্বাধীন করেছেন, আপনার মাধ্যমে আজ তাদের কাছেও আমার আবেদন যে, আজকে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত তর্ক বিতর্কের উর্ধে উঠে আসুন, আমরা সকলে মিলে জনগণের এই রায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি। এখানে কে কতটুকু করেছেন না করেছেন, সে বিতর্ক করে আজকে কোন ফল হবে না। আপনারা যদি মনে করে থাকেন যে, আওয়ামী লীগ করেনি, তাহলে আমার প্রশ্ন যে মার্শাল ল' Proclamation (ঘোষণা) দিয়ে সেই আইনগুলিকে তুলে না দিয়ে আপনারাই বা কেন বিচার করেননি? আপনারা কেন এদেরকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন? আজকে এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে স্বাধীনতার ২১ বছর পর সমগ্র জাতিকে কেন আপনারা এই বিতর্কের ভিতর ঠেলে দিলেন? তাই আমার আবেদন মাননীয় স্পীকার, এখনও সময় আছে দলমত নির্বিশেষে সব কিছুর উর্ধ্বে উঠে আসুন, যেভাবে একমত হয়ে আমরা একাদশ সংশোধনী, দ্বাদশ সংশোধনী পাশ করেছি, আসুন সেভাবে কাজ করি। যারা স্বজন হারিয়েছেন, স্বজন হারানোর বেদনায় যাদের হৃদয় এখনো ব্যথিত, আসুন আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই

সিদ্ধান্ত মেনে নিই। এই রায়কে বাস্তবায়ন করার জন্য মাননীয় স্পীকার, আমরা মনে করি যে প্রচলিত আইনই (আন্তর্জাতিক ক্রাইম অ্যাক্ট, '৭৩) যথেষ্ট। তবু যদি আপনি মনে করেন যে, আইনের কোন ঘাটতি আছে, সেই ঘাটতিটুকু এই মহান সংসদ অবশ্যই পূরণ করতে পারে।.....

'এই মহান সংসদের সে অধিকার রয়েছে। জাতি সেই অধিকার দিয়েছে। এই সংসদ সার্বভৌম সংসদ। সেই লক্ষ্যে— একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধাচারণ, যুদ্ধ ও গণহত্যাসহ মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সাধন, বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার পরও পূর্ব-পাকিস্তান পুনরুদ্ধারের সাথে জড়িত থেকে বাংলাদেশের বিরোধিতা, বিদেশী নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে বেআইনী রাজনৈতিক তৎপরতায় লিপ্ত পাকিস্তানি নাগরিক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে ১৯৯২ সালের ২৬ মার্চ জনগণের যে মতামত প্রতিফলিত হয়েছে তাকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ আন্তর্জাতিক ক্রাইম অ্যাক্ট (Act of XIX of 1973) অনুসারে ট্রাইবুনাল গঠন করে, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ সম্পর্কে বিচারের জন্য, আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আমি আপনার মাধ্যমে এই সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। সেই লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়কে গোলাম আযম ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে মামলা দায়ের ও বিচারের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব রাখছি। একই সঙ্গে বাংলাদেশে জাতীয় সংসদে জনগণের ঐ মতামত প্রতিফলনকারী গণআদালতের উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে জারীকৃত অসম্মানজনক মামলা দায়ের করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে ঐ মামলা প্রত্যাহারের জন্য আমি আপনার মাধ্যমে সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।'[১৪]

জাতীয় সংসদে এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা বিতর্ক এবং সংসদের বাইরে প্রবল আন্দোলনের ফলে ২৯ জুন '৯২ তারিখে সরকার ও বিরোধী দলের ভেতর ৪ দফার একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যেখানে সরকার গোলাম আযমের বিচার এবং গণআদালতের ২৪ জন উদ্যোক্তার বিরুদ্ধে দায়ের করা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের শর্ত মেনে নেয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় আজ অবধি গোলাম আযমের বিচার হয়নি। একাত্তরের অন্যান্য যুদ্ধাপরাধীদের বিচারেরও তেমন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

লন্ডনে অবস্থানরত বাংলাদেশের তিনজন যুদ্ধাপরাধী সম্পর্কে সেখানকার 'টুয়েন্টি টুয়েন্টি টেলিভিশন' প্রায় এক ঘণ্টার একটি প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ করেছে 'ওয়ার ক্রাইমস ফাইল' নামে। এটি বিবিসি টেলিভিশনের চ্যানেল ফোর-এ প্রদর্শিত হওয়ার পর সেখানে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই প্রামাণ্য চিত্রটি নির্মাণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অন্যতম নির্মাতা ও প্রধান গবেষক ডেভিড বার্গম্যান বলেছেন, '৯৪ সালে সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার বসনিয়ায় সংঘটিত গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কে ইউরোপীয় সম্প্রদায়সহ সচেতন বিশ্ববাসী সোচ্চার হয়ে ওঠে। জোরালো দাবি ওঠে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের। তখনই তিনি জানতে পারেন বাংলাদেশের তিনজন যুদ্ধাপরাধী লন্ডনে বাস করছে দীর্ঘদিন ধরে এবং পরিচয় গোপন করে তারা সেখানকার বাঙালি সমাজের নেতা সেজে বসেছে। এরা বিভিন্ন ধরনের মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক তৎপরতার সঙ্গেও যুক্ত।

১৪। মুক্তিযুদ্ধের বৃত্তবন্দী ইতিহাস, শাহরিয়ার কবির, অনন্যা, ঢাকা বইমেলা ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৫৩-৫৪

এদের মুখোশ উন্মোচন করে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর জন্য তাঁরা এ ছবি বানিয়েছেন।[১৫]

'ওয়ার ক্রাইমস ফাইল' দেখে লন্ডনের বাঙালি সমাজ এবং বৃটিশ মানবাধিকার সংগঠনগুলো এদের বিচারের দাবিতে সোচ্চার হলে সেখানকার সরকার এদের সম্পর্কে তদন্তের উদ্যোগ নেয় এবং এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতা কামনা করে। তৎকালীন বিএনপি সরকার এ বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ না করলেও আওয়ামী লীগ সরকার এ বিষয়ে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেয় বৃটিশ সরকারকে। সরকার উদ্যোগী হয়ে রমনা থানায় একটি অভিযোগও দাখিল করে (কেস নম্বর ১১৫, তারিখ, ২৪.৯.১৯৯৭)।

আমরা জানতে পেরেছি কিছু জিজ্ঞাসাবাদ ও অনুসন্ধানের পর এটি আবার ধামাচাপা পড়েছে। লন্ডনের বিশিষ্ট আইনজীবী ও মানবাধিকার নেত্রী ফিয়োনা ম্যাকি বলেছেন, বৃটিশ সরকার এ বিষয়ে যথেষ্ট আন্তরিক হলেও বাংলাদেশ সরকার ততটা আন্তরিক নয় বলে তাদের ধারণা জন্মেছে। তিনি আরও বলেছেন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ডিটেকটিভ চীফ সুপারেনটেন্ডেন্ট রীস এবং ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর ওয়াল্টনকে এ ব্যাপারে তদন্তের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে।[১৬]

বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে বৃটেনের সরকার ও সচেতন নাগরিকদের আগ্রহ সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকারের অনাগ্রহ গোটা জাতির জন্য লজ্জাজনক।

পাঁচ

পাকিস্তান একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করেনি এবং বাংলাদেশও তখন পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করেনি। জুলফিকার আলী ভুট্টো ক্ষমতায় এসে একাত্তরে পূর্বাঞ্চলে পাকিস্তানের পরাজয়ের কারণ ও ঘটনাবলী জানার জন্য একটি তদন্ত কমিশন(Commission of Inquiry—1971 War)) গঠন করেছিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হামুদুর রহমানের নেতৃত্বে। বাঙালি যুদ্ধবন্দি ও বহু পাকিস্তানি এই কমিশনকে লিখিত জবানবন্দিতে বলেছিলেন পাকিস্তানি সৈন্যদের যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কে। এই কমিশনের রিপোর্ট আজ অবধি প্রকাশিত হয়নি। দেরিতে হলেও পাকিস্তানে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারে বিশ্বাসী বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তি এখন এই রিপোর্ট প্রকাশ এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি উত্থাপন করেছেন।

পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশের চাপের কারণে বাংলাদেশ সরকার তখন পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে ব্যর্থ হলেও এদেশের জনগণ সব সময় তাদের বিচার দাবি করেছে। স্বাধীন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকার যখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে তখন প্রথম বিক্ষোভ সমাবেশটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতেই। '৭২-এর ১৭

১৫। সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, লন্ডন, ২০ আগস্ট ১৯৯৬

১৬। সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, লন্ডন, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

মার্চ মুক্তিযুদ্ধে শহীদ পরিবারের কয়েক শ' সদস্য কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমবেত হয়ে দীর্ঘ পথ মিছিল করে বঙ্গভবনে এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মারকপত্র প্রদানের জন্য। দালাল আইনে বিচারে সীমাবদ্ধতা থাকলেও বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল এবং সাড়ে সাতশ'র বেশি যুদ্ধাপরাধীকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ডও দেয়া হয়েছিল।

জেনারেল জিয়া দালাল আইন বাতিল করে এই বিচার প্রক্রিয়া শুধু বন্ধই করেননি, তিনি নতুন যে রাজনৈতিক দল গঠন করেছিলেন সেখানে যথেষ্ট সংখ্যক যুদ্ধাপরাধীর সমাবেশ ঘটেছিল। যুদ্ধাপরাধীরা সেই সময় প্রধানমন্ত্রী হয়েছিল এবং মন্ত্রীসভার বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিল। তখন এদের প্রধান কাজ ছিল বিভিন্ন থানা থেকে তাদের এবং সাধারণভাবে যুদ্ধাপরাধ সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র ধ্বংস করে ফেলা। যে কারণে তারা আজ বলতে পারছে একাত্তরে তারা কিছু করেনি।

একাত্তরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর এদেশীয় দোসর জামাতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলামী প্রভৃতি দলের লোকজনের যুদ্ধাপরাধের বিবরণ সম্বলিত গ্রন্থের সংখ্যা কম নয়। এর ভেতর সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য বিবরণ সংকলিত হয়েছে যুদ্ধাপরাধীদের দুষ্কর্ম অনুসন্ধানের জন্য গঠিত জাতীয় গণতদন্ত কমিশনের দু'টি প্রতিবেদনে। বেগম সুফিয়া কামালকে চেয়ারপার্সন করে দেশের বরেণ্য আইনজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিকদের সমন্বয়ে গঠিত এই কমিশন '৯৪ ও '৯৫ সালে দু'টি প্রতিবেদন প্রকাশ করে, যেখানে ষোলজন শীর্ষস্থানীয় যুদ্ধাপরাধীর দুষ্কর্মের বিবরণ রয়েছে।[১৭] এই প্রতিবেদন রচিত হয়েছে মূলতঃ এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত ও প্রত্যক্ষদর্শীদের জবানির ভিত্তিতে।

এসব প্রমাণ ছাড়াও জামাতে ইসলামী ও তাদের সহযোগীরা কিভাবে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার দালালি করেছে, কিভাবে তাদের গণহত্যা ও অন্যান্য ধ্বংসযজ্ঞে প্ররোচিত করেছে এবং নিজেরা কিভাবে উদ্যোগী হয়ে রাজাকার, আলবদর, আলশামস প্রভৃতি বাহিনী গঠন করে গণহত্যা করেছে তার বিবরণ জামাতের মুখপত্র দৈনিক সংগ্রামের একাত্তরের ফাইলেই পাওয়া যাবে।

এদেশীয় যুদ্ধাপরাধীদের সম্পর্কে অপরাধের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেলেও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যা, নারী নির্যাতন ও অন্যান্য ধ্বংসযজ্ঞের বিবরণ

১৭। এই ষোল জনের নাম— ১। আব্বাস আলী খান, ২। মতিউর রহমান নিজামী, ৩। মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, ৪। আবদুল আলীম, ৫। দেলোয়ার হোসেন সাঈদী, ৬। মওলানা আবদুল মান্নান, ৭। আনোয়ার জাহিদ, ৮। আবদুল কাদের মোল্লা, ৯। এ এস এম সোলায়মান, ১০। সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, ১১। মওলানা আবদুস সোবহান, ১২। মওলানা এ কে এম ইউসুফ, ১৩। মোহাম্মদ আয়েন উদ-দীন, ১৪। আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, ১৫। এ বি এম খালেক মজুমদার ও ১৬। ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন। এই তালিকায় গোলাম আযমের নাম নেই কারণ তার যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কে ১৯৯২ সালে গণআদালতের সময় পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। এদের যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কে মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্রের 'একাত্তরের ঘাতক দালালরা কে কোথায়' (সম্পাদনা ঃ ডঃ আহমদ শরীফ, কাজী নূর-উজ্জামান, শাহরিয়ার কবির) গ্রন্থে আরও তথ্য রয়েছে।

খুব কমই নথিবদ্ধ হয়েছে। তারপরও '৭২-এর বিভিন্ন সংবাদপত্রে পাকিস্তানি সৈন্যদের নৃশংসতার যে সব বিবরণ ছাপা হয়েছে তা যুদ্ধাপরাধ প্রমাণের জন্য যথেষ্ট।

সংবাদপত্র ছাড়া বাংলা একাডেমী প্রথম পর্যায়ে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে 'মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র' ক্ষতিগ্রস্ত ও প্রত্যক্ষদর্শীদের কয়েক শত জবানবন্দি বাণীবদ্ধ করেছে। হাসান হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প'-এর গবেষকরাও ক্ষতিগ্রস্ত ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন যা ১৫ খণ্ডে প্রকাশিত দলিলপত্রের ৮ম খণ্ডে সংকলিত হয়েছে।

এই সব সাক্ষাৎকার ও জবানবন্দির ভেতর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণভাবে যুদ্ধাপরাধীদের উল্লেখ করা হয়েছে পাক বাহিনী হিসেবে। নির্দিষ্ট কোনও ব্যক্তির নাম খুব কমই উল্লেখিত হয়েছে। ফলে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের ভয়াবহতা এসব বিবরণ থেকে পাওয়া গেলেও নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে সনাক্ত করা কঠিন। ব্যক্তিকে সনাক্ত করা তখনই সম্ভব হয়েছে যখন বন্দী শিবিরে নির্যাতনের পরও যাঁরা প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছেন তাঁদের সাক্ষ্য থেকে। যদিও সাক্ষ্যপ্রদানকারীরা বলেছেন নির্যাতনের সময় পাকিস্তানি সৈন্য বা অফিসাররা তাদের নামের পরিচয় ফলকটি খুলে রাখত। তারপরও দিনের পর দিন বন্দী শিবিরে কাটানোর ফলে নাম জানা হয়ে যেত।

অতি সম্প্রতি ঢাকার মিরপুর অঞ্চলের মুসলিম বাজারে সন্ধান পাওয়া গেছে এক অনাবিষ্কৃত বধ্যভূমি। স্থানীয় একটি মসজিদের সম্প্রসারণের জন্য নির্মাণ কাজের সময় মাটি খুঁড়তে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে মানুষের মাথার খুলি ও দেহাবশেষ। পত্রিকায় এই খবর প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রথমে এই খননকার্য এককভাবে পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং এক পর্যায়ে তাদের সেনাবাহিনীর সহযোগিতা নিতে হয়। ৩১ জুলাই '৯৯ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর '৯৯ তারিখ পর্যন্ত একটানা ৩৯ দিন খনন কার্য চালিয়ে মানুষের দেহাবশেষ ছাড়া অন্য যে সব নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতে এটা নিশ্চিত প্রমাণিত হয়েছে যে, এগুলি ঘটেছে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে।

মুসলিম বাজার বধ্যভূমিতে খনন কার্য পরিচালনার পাশাপাশি দৈনিক পত্রিকাগুলো একাত্তরের বহু অনাবিষ্কৃত বধ্যভূমির খবর প্রকাশ করেছে। মুসলিম বাজারের বধ্যভূমির খবরের সূত্র ধরে প্রকাশিত হয়েছে '৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণের পরও কিভাবে পাকিস্তানি সৈন্যরা এবং রাজাকাররা মিরপুরের বিহারীদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে ঘাঁটি গেড়েছিল এবং কিভাবে তাদের কবল থেকে মিরপুর মুক্ত করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন বরেণ্য চিত্রনির্মাতা জহির রায়হানসহ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর শতাধিক সদস্য যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

মুসলিম বাজারের বধ্যভূমি আবিষ্কারের ফলে একাত্তরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের নৃশংসতা নতুন মাত্রায় দেশবাসীর সামনে দৃশ্যমান হয়। প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শত শত স্বজনহারা মানুষ এই বধ্যভূমি দেখতে এসেছেন। '৭২-এর ৩০ জানুয়ারি যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাদের স্বজনরা এই বধ্যভূমিতে আপনজনের লাশ খুঁজেছেন। এই বধ্যভূমি থেকে প্রাপ্ত হাড় দেখে বোঝা গেছে ঘাতকরা

হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি, নিহতদের লাশ কুচি কুচি করে কেটে কূয়োর ভেতর ফেলে দিয়েছে।

মুসলিম বাজারে সদ্য আবিষ্কৃত বধ্যভূমি এবং এর সূত্র ধরে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে নতুন বধ্যভূমি সন্ধানের খবর সর্বস্তরের মানুষকে বিচলিত করেছে। নতুনভাবে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি উচ্চারিত হচ্ছে সর্ব মহলে।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি আরও জোরালো হয়েছে তাদের ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসী ও নাশকতামূলক তৎপরতার কারণে। যুদ্ধাপরাধীদের প্রধান দল মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক জামাতে ইসলামী ও তাদের সহযোগীরা পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর মদদ নিয়ে প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতা কর্মী, বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিকর্মী, সমাজকর্মী এবং সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর একের পর এক হামলা চালাচ্ছে। '৯৮-এর ডিসেম্বরে মৌলবাদীরা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় উন্নয়ন কর্মীদের এক সমাবেশে হামলা করে দুই শ'র বেশি নারী ও শিশুকে লাঞ্ছিত ও আহত করেছে। কারণ মৌলবাদীদের স্থানীয় নেতা জনৈক 'বড় হুজুর' এর আগে নারীদের সমাবেশে অংশগ্রহণের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ফতোয়া দিয়েছিলেন।

'৯৯-এর জানুয়ারিতে পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গী মৌলবাদী সংগঠন হরকতুল জেহাদের সদস্যরা বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় কবি শামসুর রাহমানের বাসভবনে গিয়েছিল তাঁকে হত্যা করতে। অল্পের জন্য কবির প্রাণরক্ষা হলেও হামলাকারীদের প্রতিহত করতে গিয়ে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আহত হন কবিপত্নী। শামসুর রাহমানের বিরুদ্ধে মৌলবাদীদের আক্রোশের প্রধান কারণ— তাঁর লেখনি মৌলবাদের বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার। তাছাড়াও যুদ্ধাপরাধীদের দুষ্কর্ম অনুসন্ধানের জন্য গঠিত জাতীয় গণতদন্ত কমিশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন এই দেশবরেণ্য কবি, যিনি একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটিরও সভাপতি।

'৯৯-এর ফেব্রুয়ারিতে কুষ্টিয়ায় প্রকাশ্য দিবালোকে জনসভার মঞ্চে হামলা করে গুলি করে হত্যা করা হয় মহান মুক্তিযোদ্ধা কাজী আরেফ আহমেদ ও তাঁর দলের পাঁচজন নেতাকে। মৌলবাদী ঘাতকদের কাছে কাজী আরেফের 'অপরাধ' ছিল— তিনি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবিতে পরিচালিত শহীদ জননী জাহানারা ইমামের আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। গত তিন বছর ধরে বিভিন্ন জনসভায় বাংলাদেশে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর ষড়যন্ত্র ও নাশকতামূলক তৎপরতা সম্পর্কে দেশবাসীকে ক্রমাগত হুঁশিয়ার করে দিচ্ছিলেন।

'৯৯-এর মার্চে যশোরে তারা শক্তিশালী ও আধুনিক রিমোট কন্ট্রোল বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় দেশের বৃহত্তম প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠন 'উদীচী'র সম্মেলনে। এই হামলায় দশজন শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মী নিহত এবং দুই শতাধিক আহত হয়। এই আহতদের অনেকে চিরদিনের মতো পঙ্গু হয়ে গেছে। মৌলবাদীদের দৃষ্টিতে উদীচীর 'অপরাধ' হচ্ছে এই সংগঠনটি ষাটের দশক থেকে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদবিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

'৯৯-এর মার্চে উগ্র মৌলবাদী সংগঠনগুলোর মোর্চা ইসলামী ঐক্য জোট ঢাকায় জনসভা করে হুমকি দিয়েছে অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, কবি শামসুর রাহমান, ডঃ কাজী ফারুক আহমদ প্রমূখ দেশবরেণ্য বুদ্ধিজীবী ও এনজিও নেতাকে হত্যা করে বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়ে দেয়া হবে এবং ২০০০ সালের ভেতর আফগানিস্তানের স্টাইলে তারা তালেবানি বিপ্লব ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করবে। তারা আরও বলেছে সরকার যদি তাদের বাধা দেয় তাহলে এর আগেই তারা সরকার উৎখাত করবে। এই ধরনের হুমকি তারা তাদের প্রতিটি জনসভায় দিয়ে থাকে।

এই ভূমিকাটি লেখা হচ্ছে '৯৯-এর অক্টোবরে, যে মাসে তারা খুলনায় সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মসজিদে বোমা নিক্ষেপ করে নামাজরত সাতজন মুসল্লিকে হত্যা করেছে এবং আহত করেছে আরও অনেককে। এর একদিন পর ঢাকায় আহমদীয়া জামাতের মসজিদে বোমা পাওয়া গেছে। এই বোমা বিস্ফোরণের ১২ ও ১৪ দিন আগে পাকিস্তানভিত্তিক মৌলবাদী সংগঠন তাহাফফুজে খতমে নবুয়তের নেতারা দু'টি সমাবেশে আহমদীয়া সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার ঘোষণা দিয়েছেন। এই অক্টোবরের ৮ তারিখে তারা বাংলাদেশের বহুল প্রচারিত দৈনিক জনকণ্ঠ অফিসের সামনে স্থাপন করেছিল অত্যন্ত শক্তিশালী ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী মাইন যা বিস্ফোরিত হলে বিশাল জনকণ্ঠ ভবন মাটির সঙ্গে মিশে যেত, সেনাবাহিনীর তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে যা সম্ভব হয়নি। মৌলবাদী সন্ত্রাসীরা এর আগেও বহুবার জনকণ্ঠ ভবনে হামলা চালিয়েছে কারণ এই পত্রিকা সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদীদের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা ও ষড়যন্ত্র উন্মোচনের ক্ষেত্রে অকুতোভয়। জনকণ্ঠে মাইন স্থাপনের জন্য গ্রেফতার করা হয়েছে আল মারকাজুল ইসলামের তিন শীর্ষ নেতাকে।

পাকিস্তানের আইএসআই-এর অর্থে লালিত, পাকিস্তানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই মৌলবাদীরা যেভাবে একাত্তরের যাবতীয় অর্জন ধ্বংস করে বাংলাদেশকে পাকিস্তানের মতো একটি মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসী রাষ্ট্রে পরিণত করতে চাইছে, তাকে প্রতিহত করতে হলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হওয়া যেমন জরুরি, বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী রাজনীতি নিষিদ্ধ করাও জরুরি।

সম্প্রতি কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকে যুদ্ধ চালিয়েছে, যে যুদ্ধের কারণে উভয় দেশের কয়েক হাজার সামরিক বেসামরিক ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছে। একাত্তরের পর ভারতের সঙ্গে এটা পাকিস্তানের প্রথম যুদ্ধ যা ছিল সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত। কারগিলের এই অবাঞ্ছিত যুদ্ধের সময় ঢাকার বুদ্ধিজীবী সমাজ এই মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হলে পাকিস্তানকে যে কোন যুদ্ধে জড়াবার আগে দ্বিতীয়বার এবং বার বার ভাবতে হত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত নূরেমবার্গ ট্রায়ালে অভিযোগকারীরা বলেছিলেন, ভবিষ্যতে পৃথিবীতে এ ধরনের যুদ্ধে কেউ যাতে জড়িয়ে না পড়ে তার জন্যেও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রয়োজন। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করাটা শুধু আইনের দৃষ্টিতে নয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, মানবিক— যে কোনও বিবেচনায় অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ।

ছয়

বর্তমানে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের যে দাবি উঠেছে তার প্রেক্ষাপটে প্রকাশিত 'একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি' তাদের অপরাধ প্রমাণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। আমরা এর আগে এদেশীয় ঘাতক দালাল ও যুদ্ধাপরাধীদের দুষ্কর্ম সম্পর্কে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছি। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের সাক্ষ্য প্রমাণ সংবলিত এটি আমাদের প্রথম গ্রন্থ।

এই গ্রন্থটি এমনভাবে পরিকল্পিত হয়েছে যাতে করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বন্দী শিবিরের নির্যাতন, গণহত্যা, নারী নির্যাতন ও অন্যান্য ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা লাভ করা যায়। আইনের পরিভাষায় যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের যে সংজ্ঞা— পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংসতা তার সঙ্গে নতুন বহু মাত্রা যোগ করেছে। নির্যাতন ও হত্যার ক্ষেত্রে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কতটা ভয়ঙ্কর ও ব্যতিক্রমী ছিল তার পরিচয় পাওয়া যাবে এ গ্রন্থে প্রকাশিত ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকে।

এই গ্রন্থে যাঁদের সাক্ষ্য নেয়া হয়েছে তাঁরা দেশ ও সমাজের বিভিন্ন অঞ্চল ও স্তরের প্রতিনিধি। তাঁদের অনেকেই ইতিপূর্বে এ বিষয়ে কোন সাক্ষ্য দেননি। তাঁরা সকলেই বলেছেন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য কখনও যদি বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করা হয় তাহলে তাঁরা সেখানে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য প্রস্তুত রয়েছেন। সাক্ষ্য প্রদানকারীদের অন্যতম হচ্ছেন এদেশের বিশিষ্ট ভাস্কর ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী, যিনি নির্যাতিতা নারীদের একজন। আটাশ বছর পর প্রথমবারের মতো তিনি তাঁর জবানবন্দি দিয়েছেন প্রকাশের জন্য। তিনি বলেছেন, 'আজ আটাশ বছর পর আমার জীবনের সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলোর কথা আপনাদের বলছি এ জন্য যে, একাত্তরে যারা এদেশে তিরিশ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা করেছে, আড়াই লক্ষ নারীকে ধর্ষণ করেছে, তাদের আজও বিচার হয়নি। আজকের প্রজন্ম ভুলে যেতে বসেছে একাত্তরে কী ভয়ঙ্কর দুঃসময়ের মুখোমুখি আমাদের প্রতিনিয়ত লড়তে হয়েছে। আজ সেই দুঃসময়ের কথা এ কারণেও বলতে চাই— অন্য সব নির্যাতনের কথা বিস্তারিত বলা হলেও নারী নির্যাতনের কথা আমরা খুবই কম জানি। এর প্রধান কারণ সমাজ ও পরিবারের রক্ষণশীল বৈরি পরিবেশ। আমি আশা করব আমার এই জবানবন্দি অন্য সব নির্যাতিত নারীদের সোচ্চার হতে সাহায্য করবে।'

গ্রন্থটি আমরা দু'টি পর্বে ভাগ করেছি। প্রথম পর্বে রয়েছে যাঁরা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দ্বারা নির্যাতিত হয়েছেন এবং তাদের গণহত্যাযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁদের জবানবন্দি। দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে বাংলাদেশের কয়েক হাজার বধ্যভূমির ভেতর কয়েকটির বিবরণ।

গ্রন্থের পরিশিষ্টে রয়েছে '৭২-এ বাংলাদেশ সরকার যে দুইশত পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীর তালিকা প্রস্তুত করেছিল সেটি। এই তালিকায় যদিও শীর্ষস্থানীয় পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের অনেকের নাম নেই, তারপরও যেহেতু এটি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছিল সেহেতু এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এছাড়া রয়েছে গণহত্যা, নারী

নির্যাতন ও অন্যান্য ধ্বংসযজ্ঞ এবং শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন যুদ্ধাপরাধীর আলোকচিত্র। পাকিস্তানি জেনারেলদের ছবি নেয়া হয়েছে সিদ্দিক সালিকের 'উইটনেস টু সারেন্ডার' গ্রন্থ থেকে।

এই গ্রন্থে যাঁদের জবানবন্দি নেয়া হয়েছে তাঁদের কেউ কেউ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এই বলে যে, রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে তাঁরা মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি পাননি কিংবা চাকরিতে ফিরে যেতে পারেননি। হাজার হাজার শহীদ পরিবারের সদস্যরা এই ক্ষোভ দীর্ঘদিন ধরে ব্যক্ত করছেন— তাঁদের শহীদ পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা কিংবা ভাই-বোনের অবদান যথাযথভাবে স্বীকৃতি লাভ করেনি।

একাত্তরে যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পর্যুদস্ত করেছেন নয় মাসের গেরিলা যুদ্ধে, তাঁরা এক অর্থে যে ভাগ্যবান সেটা উপলব্ধি করা যাবে সেই সময় যারা পাকিস্তানিদের বন্দি শিবিরে নির্যাতিত হয়েছেন তাঁদের জবানবন্দি পাঠ করলে। অনেক মুক্তিযোদ্ধাও বন্দি হয়েছিলেন পাকিস্তানিদের হাতে, যাঁরা বন্দিশিবিরের নির্যাতনের চেয়ে মৃত্যুকে শতগুণ শ্রেয় মনে করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নয় মাসের যুদ্ধে যে নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে তা অনিবার্যভাবে ত্বরান্বিত করেছে তাদের পরাজয়। একাত্তরে যাঁরা পাকিস্তানিদের নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেছেন কিংবা যারা নির্যাতিত হয়েছেন তাঁদের শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা ক্রমশঃ রূপান্তরিত হয়েছে ঘৃণায়, ঘৃণা রূপান্তরিত হয়েছে ক্রোধে এবং ক্রোধ রূপান্তরিত হয়েছে তীব্র প্রতিরোধ ও প্রতিশোধ স্পৃহায়।

মুক্তিযুদ্ধের পর বহু বীরউত্তম, বীরবিক্রম খেতাবধারী মুক্তিযোদ্ধা একাত্তরের ঘাতক দালাল ও যুদ্ধাপরাধীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে প্রশ্রয় ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন। কিন্তু তখন যাঁরা বন্দিশিবিরে নির্যাতিত হয়েছেন, যাঁরা চোখের সামনে দেখেছেন প্রিয়জনের হত্যাকাণ্ড, যে পিতা বা যে ভাই চোখের সামনে দেখেছেন তাদের কন্যা বা বোনকে পাকিস্তানি পশুদের হাতে ধর্ষিতা হতে, তাঁরা কখনও একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি ভুলতে পারবেন না।

এই গ্রন্থের জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সদস্য, অবাঙালি ও রাজাকারদের ভেতর ভিন্ন মানসিকতার পরিচয়ও আমরা পেয়েছি। বর্তমান গ্রন্থে দুর্গাদাস মুখার্জী বলেছেন সহানুভূতিশীল অবাঙালিদের কথা। ভাস্কর ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীর জবানবন্দি থেকে জানা যায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর এই নৃশংসতা তাদের ভেতরও কারও কারও মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও ঘৃণার সঞ্চার করেছিল। প্রতীতি দেবী তাঁর জবানবন্দিতে বলেছেন একজন বেলুচ ক্যাপ্টেনের কারণে তাঁরা কীভাবে প্রাণে বেঁচেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকারদের অনেকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংসতা সহ্য করতে না পেরে সপক্ষ ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। রাজাকাররা কিভাবে পাকিস্তানিদের দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয়েছে তার একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র থেকে। কুমারখালীর বাটিয়ামারা গ্রামের খন্দকার নূরুল ইসলাম তাঁর জবানবন্দিতে বলেছেন—

'একদিন দু'জন মিলিটারি একটা রাজাকারকে বলছে, আচ্ছা দোস্ত, আওরাত মিলিয়ে দাও না। তখন রাজাকারটা তাদেরকে একটা বাড়িতে নিয়ে যায়। মিলিটারিদের খবর পেয়ে উক্ত বাড়ির পুরুষ মহিলা সবাই বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। রাজাকার ও মিলিটারি দুটি উক্ত বাড়ির মধ্যে ঢুকে আর কোন লোক খুঁজে পায় না। তখন মিলিটারি দুটি উক্ত রাজাকারকে বলে, আচ্ছা দোস্ত তোমার ডেরা কোথায়? তখন রাজাকারটা তাদেরকে সাথে নিয়ে নিজ বাড়ি যায় এবং পাকসেনারা তার বাড়ি গিয়েই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। তারা দেখতে পায়, ঘরের মধ্যে উক্ত রাজাকারের মাতা বসে আছে। তারপর একজন পাকসেনা ঘরের বাইরে চলে আসে এবং উক্ত রাজাকারের বুকে রাইফেল ধরে রাখে। আর একজন পাকসেনা তার বৃদ্ধা মাতার উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। তারপর দ্বিতীয় জন গিয়ে পাশবিক অত্যাচার করে। প্রথম জন এসে রাজাকারকে পাহারা দিতে থাকে। তারপর তাদের কাজ শেষ হলে তারা ক্যাম্পে চলে আসে। পরে এই সংবাদ রাজাকার ক্যাম্পে ছড়িয়ে পড়লে উক্ত রাজাকার আর ক্যাম্পে না গিয়ে কোথায় যে চলে গেল তার আর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। উক্ত ঘটনা হতে জানা যায় যে পাক সেনাদের হাত থেকে তাদের পরম আত্মীয় বা বন্ধুদের স্ত্রী, মা, বোন ও মেয়েরা রেহাই পায়নি। এমনকি শান্তি কমিটি, জামাতে ইসলামী বা মুসলিম লীগের লোকেরাও নয়।'[১৮]

স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রে আরও দেখেছি উর্ধ্বতন অফিসারের নির্দেশ অমান্য করায় একজন পাঠান সৈন্যকে গুলি করে হত্যা করতে।

রাজনৈতিক নেতারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টি বিভিন্ন অজুহাতে উপেক্ষা করতে পারেন, বিলম্বিত করতে পারেন কিংবা কেউ এই বিচারের দাবি নস্যাৎ করে তাদের সঙ্গে জোট বেঁধে আন্দোলন করতে পারেন; কিন্তু তিরিশ লক্ষ শহীদ পরিবার কিংবা আড়াই লাখেরও বেশি নির্যাতিতা নারী ও তাঁদের পরিবার কখনও যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা করতে পারে না।

কোনও সভ্য মানুষের পক্ষেই মানবতার এই নিষ্ঠুরতম অবমাননা ভুলে যাওয়া কিংবা তাদের ক্ষমা করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যারা গণহত্যা, নারী নির্যাতন ও অন্যান্য দুষ্কর্মের জন্য দায়ী সেই সব নাৎসি যুদ্ধাপরাধীদের আজও খুঁজে বের করে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হচ্ছে ইউরোপে।

'৯৪ সালে বসনিয়ার গণহত্যার পর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টি জোরালোভাবে পশ্চিমা বিশ্বে আলোচিত হচ্ছে। ১৯৯৮ সালে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্টের সংবিধিতে বলা হয়েছে যুদ্ধের সময় সংঘটিত ধর্ষণ, যৌন নির্যাতন, বাধ্যতামূলক শ্রমদান প্রভৃতি যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। ২০০০ সালের ডিসেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানী সৈন্যদের নারী নির্যাতনের বিচারের জন্য বিশেষ আদালত বসবে জাপানের রাজধানী টোকিওতে। চীন, উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের প্রায় দুই লাখ নারী ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত জাপানের অধিকৃত থাকাকালীন ধর্ষণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। এই সব

১৮। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৮৮

নির্যাতিতা নারীর ভেতর যাঁরা জীবিত আছেন ৫০-৫৫ বছর পর মুখ খুলেছেন এবং বিচার ও ক্ষতিপূরণ দাবি করছেন।[১৯]

শহীদ জননী জাহানারা ইমাম তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধকরণের আন্দোলনকে আখ্যায়িত করেছিলেন 'মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্ব' হিসেবে। এই পর্বের তরুণ যোদ্ধাদের কয়েকজন বর্তমান গ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। এ কাজ তাঁরা করেছেন কর্তব্য ও আদর্শের প্রেরণায়, শহীদ জননীর প্রতি তাঁদের অঙ্গীকারের তাগিদে। যাঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন তাঁরা হচ্ছেন একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সহ সভাপতি অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, সাধারণ সম্পাদক কাজী মুকুল ও তথ্য গবেষণা সম্পাদক জুলফিকার আলি মাণিক। অধিকাংশ জবানবন্দি ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন সাংবাদিক রুহুল মতিন। এছাড়া সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও প্রতিবেদন রচনা করেছেন ডঃ সুকুমার বিশ্বাস, শফিউল আলম রাজা, কৃষ্ণ ভৌমিক, গৌরাঙ্গ নন্দী, মোস্তফা হোসেইন ও পৃথ্বিজিৎ সেন ঋষি। সংক্ষিপ্ততম সময়ে ইংরেজি অনুবাদের গুরুদায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন চারজন তরুণ সাংবাদিক জাহিদ নেওয়াজ, জিয়াউল হক স্বপন, নজরুল ইসলাম মিঠু ও নাদিম কাদের। এই সুযোগে তাঁদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই।

যাঁরা সাক্ষ্য দিয়েছেন তাঁরাও কর্তব্য ও আদর্শের প্রেরণায় এগিয়ে এসেছেন। তাঁদের সহযোগিতা ছাড়া যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও শাস্তি প্রদান সম্ভব নয়। তাঁদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

আমরা আশা করব শেখ হাসিনার সরকার অবিলম্বে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের উদ্যোগ গ্রহণ করে তাদের দেয় প্রতিশ্রুতি পালন করবেন। একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না হলে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার অর্থহীন হয়ে যাবে, ব্যহত হবে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রা এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে বাংলাদেশের অস্তিত্বও বিপন্ন হবে।

শাহরিয়ার কবির
ঢাকা, ৩১ অক্টোবর ১৯৯৯

১৯। ইশতেহার : The International Organizing Committee for Women's International War Crimes Tribunal, VAWW-NET Japan

গণহত্যা, নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞের প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগীদের জবানবন্দি
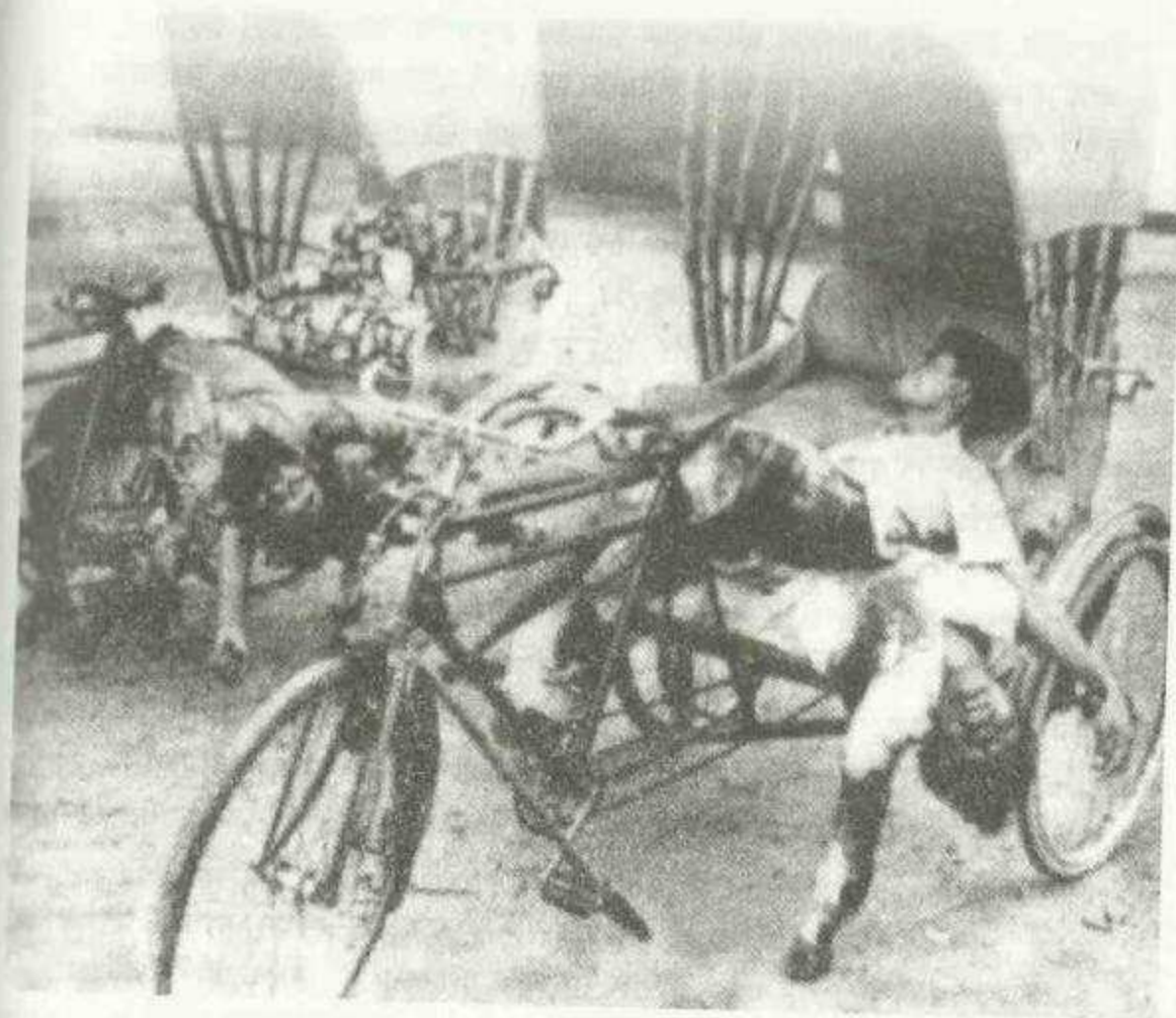
দুপুর বেলা একটা বস্তার মধ্যে ঢুকিয়ে আমাকে ফেলে রাখল আগস্টের কড়া রোদের মধ্যে

ব্রিগেডিয়ার (অব:) এম আর মজুমদার

১৯৭১ সালে ব্রিগেডিয়ার মাহমুদুর রহমান মজুমদার ছিলেন পূর্বাঞ্চলে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সবচেয়ে সিনিয়র বাঙালি অফিসার। '৭১-এর অসহযোগ আন্দোলনের সময় এম এ জি ওসমানিসহ আওয়ামী লীগের উর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। তাঁকে গ্রেফতার করা হয় '৭১-এর ২৪ মার্চ। ৩১ মার্চ তাঁকে পাকিস্তান নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর শুরু হয় দুঃসহ বন্দি জীবন, ক্রমাগত জেরা এবং নিষ্ঠুরতম নির্যাতন। ১২ সেপ্টেম্বর - ১৩ অক্টোবর '৯৯ তাঁর এ বর্ণনা চার দফায় ক্যাসেটে ধারণ করা হয়েছে।

১৯৭০-এর নির্বাচনের এক বছর আগে থেকে '৭১-এর ২৪শে মার্চ পর্যন্ত আমি চট্টগ্রামে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার-এর কমান্ড্যান্ট ও চট্টগ্রামের স্টেশন কমান্ডার হিসাবে কর্মরত ছিলাম। ৪ঠা মার্চ চট্টগ্রামে ও পার্বত্য চট্টগ্রামে মার্শাল ল এ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিযুক্ত হবার কারণে আমার যোগাযোগ ছিল একদিকে আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে, অন্যদিকে চিফ অব আর্মি স্টাফ জেনারেল আব্দুল হামিদ খান সহ যত উর্ধ্বতন আর্মি অফিসার ছিল— সবার সঙ্গে। কর্নেল এম এ জি ওসমানিও আমার পূর্ব পরিচিত ছিলেন। তাঁর মাধ্যমে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমার যোগসূত্র স্থাপিত হয়। এছাড়া সে সময় চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা জহুর আহম্মদ চৌধুরী, এম আর সিদ্দিকী, এম এ হান্নান, আবদুল মান্নান (বর্তমান মন্ত্রী), মেয়র মহিউদ্দিনসহ অন্যান্যদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে।

পহেলা মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ অধিবেশন মুলতবি ঘোষণার পর সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। এরই সূত্র ধরে পাঁচ/ছয় তারিখ রাত

তিনটায় শেখ মুজিবের পক্ষ থেকে খন্দকার মোশতাক, জহুর আহম্মদ চৌধুরী এবং এম আর সিদ্দিকী চট্টগ্রামে আমার সঙ্গে প্রায় এক ঘন্টা অতি গোপনে বৈঠক করেন। আমি শেখ মুজিবের প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন এবং আমাদের তৎকালীন সামরিক প্রাধান্যের কথা জানাই।

২রা মার্চ, 'সোয়াত' জাহাজ যখন চট্টগ্রামে নোঙ্গর করল, আমি খোঁজ নিয়ে জানলাম ওই জাহাজে কোন যাত্রী আসেনি, এসেছে ৭০০০ টন অত্যাধুনিক অস্ত্র— বাঙালিদের দমনার্থে মিলিটারি অপারেশনের জন্য। বন্দর চেয়ারম্যান মরহুম এম আর সিদ্দিকীকে আমি মাল খালাস না করার জন্য অনুরোধ করলাম। বললাম, 'ওই অস্ত্র আমাদের উপর ব্যবহার করা হতে পারে।' আমি ভাবলাম আমরা যদি পুরো দেশ দখল করতে পারি, তাহলে ওই অস্ত্র সব আমাদের হাতেই আসবে।

২রা মার্চ থেকে ২৪শে মার্চ পর্যন্ত, ২২ দিন, আমি সকল প্রকার নির্দেশ অমান্য করে মাল খালাস বন্ধ রাখলাম। সেনা প্রধান হামিদ খান ছাড়াও জেনারেল টিক্কা খান, জেনারেল মিট্ঠা খান এবং আরো অনেক উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তা আমাকে বার বার চাপ দিতে থাকল। মিট্ঠা খান ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে দেখা করে বলল, 'যে করেই হোক ২/১ দিনের মধ্যে মাল খালাস করাতে হবে।'

আমি বললাম, 'বিশেষজ্ঞ ছাড়া মাল খালাস করতে গেলে আগুন লেগে যাবে।'

সে বলল, 'সারা বাংলাদেশ যদি জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যায়, কর্ণফুলি নদী যদি রক্তে লাল হয়ে যায়, আমি আমার মাল খালাস চাই।'

মাল খালাস না করায় টিক্কা খান এও বলল, 'ইউ ডিসওবেড দ্য কমান্ড অব ইওর সুপিরিওর এ্যাণ্ড স্টপড দ্য আনলোডিং অব সোয়াত শিপ টু সাপোর্ট আওয়ামী লীগস নন কো-অপারেশন মুভমেন্ট।' পরক্ষণে নৌ বাহিনী প্রধান কমোডোর মমতাজকে ডাকালেন। সে এসেও আমার সাথে সায় দিল। মিট্ঠা খানকে জানাল, 'স্যার, আমার যে ফোর্স আছে তারা তো বাণিজ্যিক জাহাজের কার্গো হ্যান্ডলিং জানে না। এরা হ্যান্ডলিং করতে গেলে যদি কোন বিস্ফোরণ হয়, তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।' মিট্ঠা খান বুঝল।

কমোডোর মমতাজের অবশ্য ভয় ছিল সমস্ত চিটাগাং-এ আগুন জ্বলছে। যদি একটা কিছু হয়, তাহলে পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাবে। তার জন্য বোধ হয় সে ঝুঁকি নিতে চায়নি।

মিট্ঠা খান তখন বলল, 'ঠিক আছে, আমি করাচী থেকে মার্চেন্ট নেভীর লোক আনাব।' আমার অফিসে বসেই সে করাচী আর্মি হেড কোয়ার্টার-এ ফোন করল। যত দ্রুত সম্ভব মার্চেন্ট নেভীর লোক পাঠাতে নির্দেশ দিল।

বিভিন্ন টাল-বাহানা করে আমি মাল খালাস আটকে রেখেছিলাম। টিক্কা খান সকালে একবার, সন্ধ্যায় একবার আমাকে টেলিফোন করে। খোঁজ নেয় মাল খালাসের কি হল? ইতোমধ্যে আমি এম আর সিদ্দিকীর মাধ্যমে জাহাজের লোকজনকে সরিয়ে দিলাম। জাহাজ বহির্নোঙ্গরে পড়ে থাকল।

জিয়াউর রহমান-এর ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এ সময় ওয়েস্ট-এ যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। নিয়ম ছিল পশ্চিম থেকে পূর্ব কিম্বা পূর্ব থেকে পশ্চিমে সৈন্য বদলি হলে তাদের

অস্ত্রও জমা রেখে যেতে হয়। জিয়াউর রহমানের ব্যাটেলিয়ানও অস্ত্র জমা দিয়েছিল। তাদের অস্ত্র ছিল না। এ ক্ষেত্রে যে ব্যাটেলিয়ানের হাতে আর্মস থাকে না, সে তো সিভিলিয়ানের সমান। তাই আমি আমার সেন্টার থেকে ৩০০ রাইফেল ও ১০টা লাইট মেশিন গান তাদেরকে দিলাম। স্বাধীনতার যুদ্ধে এ অস্ত্রগুলিই ছিল তাদের প্রধান শক্তি।

২১ তারিখ সেনাপ্রধান জেনারেল আব্দুল হামিদ খান আমাকে নিয়ে গেলেন বেলুচ রেজিমেন্টের চিফ লেঃ কর্ণেল ফাতেমীর কাছে। জিজ্ঞেস করলেন, 'সোয়াত' খালাস হয়েছে কিনা। আমি 'না' বললাম। এ সময় পাকিস্তান আর্মির এ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল খুদাদাদ খানও ছিলেন। বেলুচ রেজিমেন্টের অফিসে যাওয়ার পর এ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল আমার হাত ধরে বললেন, 'চল মজুমদার আমরা অন্য রুমে যাই, তোমার সাথে আমার জরুরি কথা আছে।'

লেঃ কর্ণেল ফাতেমী ও জেনারেল হামিদ খান প্রায় আধা ঘন্টা আলাপ করলেন। আমি পরে বুঝেছিলাম আমাকে আলাপের সুবিধার্থে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে সরানো হয়েছে। এরপর আমরা রওনা দিলাম নেভাল হেড কোয়ার্টারে। সেখানেও একইভাবে আমাকে সরিয়ে আর্মি চিফ নেভাল চিফ-এর সাথে ২০/২৫ মিনিট আলাপ করলেন।

স্বয়ং আর্মি চিফের এ দু'টি ঘটনার পর আমার আর বুঝতে বাকি থাকল না যে, বাঙালিদের বিরুদ্ধে কোন গোপন অপারেশনের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। আর্মি চিফকে বিদায় দেয়ার পর পরই আমি চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ প্রধান এম আর সিদ্দিকী সাহেবকে টেলিফোনে বাসায় ডাকলাম। পুরো ঘটনা তাঁকে বললাম এবং এও বললাম এক্ষুণি আপনি কর্ণেল ওসমানিকে নিয়ে শেখ সাহেবের সাথে আলাপ করুন। আর সময় নাই, খুব তাড়াতাড়ি কিছু একটা ঘটবে। শেখ সাহেবকে বলুন আমাকে অনুমতি দিক। এখনও এ্যাকশান নিলে আমরা জয়লাভ করতে পারব।

সিদ্দিকী সাহেব ঢাকায় যাতায়াতের অসুবিধা দেখালে, আমি এস পি কে ফোন করে গাড়ির ব্যবস্থা করলাম। (ওই এস পি শামসুল হক মার্চের ২৬ তারিখ শাহাদৎ বরণ করেন)।

সিদ্দিকী সাহেব ফিরে এসে আমাকে জানালেন, শেখ সাহেব বলেছেন, 'ব্রিগেডিয়ার সাহেব খামোখা টেনশন করতেছেন। ওনাকে ধৈর্য্য ধরতে বলুন। আমরা রাজনীতিবিদরা আলাপ করতাছি। যতক্ষণ পর্যন্ত আলোচনা শেষ না হবে ততক্ষণ ধৈর্য্য ধরতে বলুন। সময় আসলে আমি ওনাকে জানাব।' ওসমানি সাহেব জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'সময় আসলে উনি কেমনে জানবেন?' শেখ সাহেব বলেছেন, 'ঢাকায় রেডিও স্টেশনে বাংলার অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ হলে জানবেন আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। আর আমি ওনার জন্য একটা ম্যাসেজ রেকর্ড করে রাখব এবং সেটা জহুর আহম্মেদ সাহেবের মাধ্যমে ওনাকে দেব।'

২১শে মার্চে ধারণকৃত ঐ ম্যাসেজ শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হওয়ার পর চিটাগাং-এ ২৬শে মার্চ প্রচার করা হয়।

২১শে মার্চের পর কয়েকদিন চরম উত্তেজনার মধ্যে কাটল।

২৪ তারিখে জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা ও জেনারেল মিট্ঠা খান দু'টি

হেলিকপ্টার নিয়ে চট্টগ্রাম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারে এলেন। আমাকে বললেন, 'আজ সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট ঢাকায় মিটিং করবেন। সব সিনিয়র অফিসারদের ডাকা হয়েছে। তোমাকেও যেতে হবে।'

আমি বললাম, 'চট্টগ্রামের অবস্থা থমথমে, আমি চলে গেলে এরা গোলমাল করবে। বিশেষ করে সিভিল জনগোষ্ঠির মধ্যে সাংঘাতিক অস্থিরতা চলছে।'

আমার কেন জানি সন্দেহ হল। আমি তখন আমার এক বিশ্বস্ত অফিসার ক্যাপ্টেন আমিন আহম্মদ চৌধূরীকে (এখন মেজর জেনারেল) বললাম, 'তুমি কর্ণেল ওসমানি সাহেবকে টেলিফোন করে বল ওরা আমাকে নিতে এসেছে। আমি যাব কিনা?' আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করলাম কিন্তু ব্যর্থ হলাম।

পরে জেনারেল টিক্কা খানকেও ফোন করলাম। বললাম, ওরা তো আমাকে নিতে এসেছে। কিন্তু চিটাগাং-এর অবস্থা থমথমে। আমার না গেলে হয় না?'

টিক্কা খান বলল, 'তোমার আসা খুব জরুরি। তুমি না এলে চলবে না। কারণ প্রেসিডেন্ট সাহেব সব সিনিয়র অফিসারদের সাথে কথা বলবেন। মিটিঙ শেষে দরকার হলে তোমাকে আমরা ফেরৎ পাঠাব।'

সে এমনভাবে কথা বলল, আমার কিছুটা বিশ্বাস হল। হয়তো বা বিষয়টি সত্যি। আমি ঢাকার উদ্দেশ্যে হেলিকপ্টারে চড়ে বসলাম।

ঢাকা আসার পর আমাকে নিয়ে যাওয়া হল ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাব-এর বাসায়। সে ব্রিগেডিয়ার আরবাব নামে বেশি পরিচিত। সে ছিল ২৫শে মার্চ ঢাকা 'অপারেশন সার্চ লাইটের' দায়িত্বে। আরবাব আমার পুরাতন বন্ধু। ১৯৬০-৬৪ সাল পর্যন্ত আরবাব, আমি ও জিয়াউর রহমান একত্রে কাজ করতাম। তখন জিয়া আমার অধীনে ক্যাপ্টেন। তখন থেকেই আরবাবের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

আরবাবের বাসায় গিয়ে দেখি আমার জন্য চা নাস্তা প্রস্তুত। আরবাবকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বিষয়টা কি? ওরা আমাকে বলল প্রেসিডেন্ট সাহেব মিটিং করবে। কিন্তু তেমন তো কোন লক্ষণ দেখছি না। আমাকে কেন এখানে আনা হয়েছে?'

আরবাব এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, 'মজুমদার কাউকে কিছু বলবে না। তোমাকে চিটাগাং থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। সেখানে ইতিমধ্যে ব্রিগেডিয়ার আনসারীকে পাঠান হয়েছে। আর আমাকে তোমার চার্জে দেয়া হয়েছে। তুমি আমার কাছে থাকবে, যদ্দিন পশ্চিম পাকিস্তানের কোথাও পোস্টিং না দেয়া হয়।' আরবাব কিন্তু আমাকে একথা বলল না, 'তুমি বন্দি।'

আমি অবাক হলাম। আমাকে বদলি করা হয়েছে, আমার জায়গায় অন্যকে নিয়োগও দেয়া হয়েছে অথচ আমি কিছুই জানি না। আমি আরবাবকে বললাম, 'তাহলে কি আমি আর চিটাগাং যেতে পারব না?'

সে বলল, 'না। তোমার আর যাওয়া সম্ভব নয়।'

২৪ তারিখ আমাকে ঢাকা আনার পর থেকেই ব্রিগেডিয়ার আনসারী সোয়াত থেকে মাল খালাস শুরু করল। পাঞ্জাবি ও বাঙালি অফিসার ও জোয়ানরা মাল খালাসের কাজে লেগে গেল।

২৫ তারিখ-এ দেখলাম আরবাব মহা ব্যস্ত। আমার মধ্যে সন্দেহ ঘনীভূত হল। সন্ধ্যার আগেই আরবাবের অনুপস্থিতিতে আমি সরে পড়লাম। সরাসরি আমার বড় ভাই সাজ্জাদ আলী মজুমদার-এর ধানমণ্ডির বাসায় চলে এলাম। এসেই ওসমানি সাহেবকে খবর দিলাম। তিনি বললেন, আমি আসছি।'

এদিকে মাগরিবের সময় আমার ভাবী গেলেন তাজউদ্দীন সাহেবের বাসায়। তাঁকেও আনতে, কিন্তু বাসায় পেলেন না।

ওসমানি সাহেব এলেন। তাঁকে নিয়ে আমার ভাই-এর বেড রুমে বসে বললাম, 'আপনারা অনেক দেরি করে ফেলছেন, আমি একবার দু'বার নয়— তিন তিনবার সংবাদ পাঠালাম। একবার নিজে, একবার এম আর সিদ্দিকীর মাধ্যমে, আর একবার ক্যাপ্টেন আমিনের মাধ্যমে। আপনারা কিছুই বললেন না। ওরা শুধু সময় নিচ্ছে। আসলে ওরা কোন আপোষ করবে না। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জেনে আপনাদের জানিয়েছি ওরা কোন অবস্থাতেই শেখ মুজিবকে ক্ষমতায় বসতে দেবে না। শেষ পর্যন্ত আর্মি এ্যাকশনে যাবে।' আরও বললাম, 'কয়েক দিন আগে আঘাত হানলে আমরা সহজেই জয়ী হতাম। শেখ মুজিব অনুমতি দিলে এখনো সেটা সম্ভব।'

ওসমানি সাহেব বললেন, 'না, শেখ মুজিব তো এটা চান না। উনি সরাসরি রাজনৈতিক সংলাপের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান চান।'

ওসমানি সাহেব জানতে চাইলেন, 'আপনি তো সেনা বিদ্রোহ করবেন, তো আপনার অস্ত্র কোথায়?'

আমি আমার পরিকল্পনার কথা জানালাম। বললাম, 'এখনো বাঙালি সৈন্যদের কাছে যে অস্ত্র আছে তার দ্বারা আমরা প্রথম অবাঙালি আর্মি অস্ত্রাগারগুলো দখল করে নেব। দখল করে আর্মি অফিসারদের সারেন্ডার করাব। তারা জানে দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে যদি লড়াই করে, তবে মরতে হবে। কেউ এ ঝুঁকি নেবে না।'

ওসমানি বিষয়টি শেখ সাহেবের সাথে আলোচনা করার জন্য উঠে গেলেন। প্রথমে আমাকে সাথে নিতে চাইলেও পরক্ষণে বললেন, 'দু'জন একসাথে যাওয়া ঠিক হবে না। কারণ তাঁর বাসার আশেপাশে গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন রয়েছে। পরে নিজেই গেলেন এবং বলে গেলেন, 'যেটা রেজাল্ট হয় আমি তোমাকে টেলিফোনে জানাচ্ছি।'

আমি বসে আছি তো আছিই। অবশেষে রাত ৮টার সময় টেলিফোন বাজল। ওসমানি সাহেব বললেন, 'ইয়াহিয়া খান সাহেবের সাথে শেখ মুজিবের সমঝোতা হয়েছে। তোমাকে ধৈর্য্য ধরতে বলেছে।'

রাত সাড়ে এগারটার সময় সমস্ত শহর জুড়ে গুলির আওয়াজ। বাড়ির দোতলার ছাদে উঠে দেখলাম সমস্ত শহরে আগুন জ্বলছে। আমি যা ভেবেছিলাম তাই হল।

আমি আড়াই বছর পর যখন পাকিস্তান বন্দি শিবির থেকে ফিরলাম তখন ফরাশ উদ্দীন সাহেব, বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর, আমাকে বললেন, 'ওসমানি সাহেব ২৫শে মার্চ রাত আটটায় আমার বাসা থেকে আপনাকে টেলিফোন করেছিলেন। আমি নিজ কানে সব শুনেছি।'

পরদিন খবর পেলাম আমার পরিবারকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আনা হয়েছে।

ব্রিগেডিয়ার আনসারীর বাড়িতে রাখা হয়েছে। ২৬ তারিখ আমি ক্যান্টনমেন্টে গেলাম। দেখলাম কোন ছেলে মানুষ নাই। সবাই অপারেশনে ব্যস্ত। আমি বিনা বাধায় আমার পরিবারকে নিয়ে শ্বশুর বাড়ি এলাম। সেখানে আমার স্ত্রীর মুখে ২৫ মার্চ মধ্য রাতে আমার সেন্টারকে ট্যাংক সহ আক্রমণ, আমার বিশ্বস্ত কর্নেল চৌধুরী সহ অসংখ্য বাঙালি সৈন্য হত্যা এবং আমার স্ত্রী ও পুত্রদের উপর যে নির্যাতন করেছে তার করুণ কাহিনী শুনে মর্মাহত হলাম।

আমার স্ত্রী শাহাদৎ সুলতানা মজুমদার জানিয়েছেন, '২৫ তারিখ রাতে তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন; এমন সময় রুমের ভিতরে একটা গুলির আওয়াজ শুনলেন। লাইট জ্বালিয়ে দেখলেন গুলিটা জানালা ছিদ্র করে চলে গেছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে গুলির আওয়াজ শুনতে পেলেন। আর্মিরা ট্যাংক সহ এসে বাংলোর উপর গুলি করছিল। তিনি তখন ছোট ছোট বাচ্চাদের খাটের উপর থেকে টেনে নিয়ে পালঙ্কের নিচে ঢুকে গেলেন।

ঘণ্টা খানেক পর গুলির আওয়াজ থেমে গেলে তিনি কর্ণেল এম আর চৌধুরীকে টেলিফোনে পাওয়ার চেষ্টা করলেন। তাকে না পেয়ে দেয়ালের কোণায় লেখা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ টেলিফোন নম্বর থেকে আওয়ামী লীগ নেতা এম আর সিদ্দিকীর নম্বর পেলেন। সিদ্দিকী সাহেবকে বললেন, 'ওরা ট্যাংক রাইফেল নিয়ে সেন্টার আক্রমণ করেছে, বাসার সামনে রাস্তায় ট্যাংক। তিনি যেন তাড়াতাড়ি গিয়ে জিয়াকে (মেজর) খবর দেন যাতে সে পিছন থেকে তার সৈন্য নিয়ে বেলুচ রেজিমেন্ট আক্রমণ করে। এরপর আমার স্ত্রী টেলিফোনে ঢাকায় রিং করে দেখেন লাইন ডেড। ওরা লাইন কেটে দিয়েছিল।

পরদিন ভোর বেলা সেন্টারের সেকেণ্ড ইন কমান্ড কর্নেল শিঘ্রী এসে আমার স্ত্রীকে বলল, 'তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে আপনাকে ঢাকা যেতে হবে।'

আমার স্ত্রী জানতে চাইলেন তিনি কিভাবে যাবেন?

শিঘ্রী জানাল, ঢাকা থেকে হেলিকপ্টার এসেছে বেলুচ রেজিমেন্টে, তাদের নিয়ে যেতে। আমার স্ত্রী নিজের ও বাচ্চাদের কাপড় চোপড় অলংকার ও টাকা পয়সা নিতে চাইলেন কিন্তু শিঘ্রী কিছুই নিতে দিল না। বলল, 'ওসব নেয়ার কোন দরকার নেই। আপনি তো একদিন পরে ফিরে আসবেন। কোন কিছু নেয়ার দরকার নেই।'

আমার স্ত্রী বাসা থেকে বেরিয়ে দেখেছেন গেটের কাছে অসংখ্য লাশ। এর মধ্যে একটা লাশ চিনতে পেরেছিলেন। সেটা ছিল পাশের বাসার কর্ণেল এম আর চৌধুরীর। জিপে বেলুচ রেজিমেন্টে পৌছানোর আগ পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশে অসংখ্য লাশ পড়ে থাকতে দেখেছেন আমার স্ত্রী।

পরদিন ২৭ তারিখ সকালে আমি ফজরের নামাজ পড়ে বারান্দায় বসে আছি। ক্যাপ্টেন আমিনের আসার কথা, তাকে নিয়ে চিটাগাং যাব। এ সময় দেখলাম রাস্তা দিয়ে আমার শ্বশুর বাড়ির দিকে মিলিটারি গাড়ি আসছে। বাইরে বেরিয়ে দেখি কিছু সৈন্য বাড়ির চারপাশে পাহারা দিচ্ছে। কয়েকজন সৈন্য এসে জিজ্ঞেস করল, 'স্যার আপনি কি ব্রিগেডিয়ার মজুমদার?'

উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ।'

'আমরা টিক্কা খান সাহেবের নির্দেশে আপনাকে নিতে এসেছি। আপনি তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিন।'

আমি তাদের সঙ্গে রওনা দিলাম। ২৭ তারিখ থেকে আমি পাক্কা বন্দি হয়ে গেলাম। আমার সাথে আমার পরিবারকেও রাখা হল ক্যান্টনমেন্টের এক পরিত্যক্ত বাড়িতে। সেখানে দু'দিন থাকলাম। বাড়ির বাইরে বেরুনো বন্ধ। তখন থেকে শুরু হল আমার মানসিক নির্যাতন।

'৭১-এ পাকিস্তান আর্মিরা অত্যাচার করেছে দু'ভাবে। ব্যক্তিগতভাবে আমার উপর, আর আমার আত্মীয় স্বজন ও চাকর বাকরের উপর।*২৬শে মার্চ সকালে আমাকে শ্যামলীর বাসায় না পেয়ে চাকর তসিরকে বাড়ির বাইরে এনে জনসমক্ষে জবাই করে। তার ছোট বাচ্চা ছাদের উপর পানির ট্যাঙ্কিতে লুকিয়ে আত্মরক্ষা করে। জুলাই মাসে আর্মিরা সিলেটের জকিগঞ্জে আমার বোনের দুই ছেলে ও তার স্বামীকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ওদের ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় গুলির শব্দ শুনে আমার বোন অজ্ঞান হয়ে যায়। আশেপাশে লোকজন তাকে সিলেট হাসপাতালে ভর্তি করার পর সেখানেই সে মারা যায়। আর্মিরা আমার বোনের বাড়িও জ্বালিয়ে দিয়েছিল।*

মার্চ মাসে ইয়াহিয়া খান ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলি মুলতবি করার পর চিটাগাং এর পাহাড়তলি, ফিরোজ শাহ্ কলোনী, ওয়ারলেস কলোনী ও রেলওয়ে কলোনীতে বাঙালি-বিহারী রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা হয়। এ সময় কর্ণেল ফাতেমীর অধীনস্ত পাঠান সিপাহিরা বাঙালিদের বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দেয়। বিহারীদের পক্ষ নিয়ে শত শত নিরীহ বাঙালি নারী, শিশু, বৃদ্ধদের নির্বিচারে হত্যা করে। ফাতেমী তখন চট্টগ্রামের মার্শাল ল এ্যাডমিনিস্ট্রেটর। এরপর জেনারেল ইয়াকুব খান ফাতেমীকে সরিয়ে টেলিফোনেই আমাকে ওই পদে নিয়োগ দেন। ৪ঠা মার্চ থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে প্রথমে রেলওয়ে কলোনীতে গেলাম। দেখলাম লাইন ধরে বাঙালিদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। জ্বালানো বাড়িগুলোর সামনে পাঠান সিপাহিগুলো দাঁড়িয়ে আছে। ঘরবাড়িগুলো জনশূন্য। খোঁজ নিয়ে জানলাম এখানকার যারা বেঁচে আছে তারা চিটাগাং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ও অন্যত্র ভর্তি করা হয়েছে। আমি মেডিকেল কলেজে গেলাম। দেখলাম শত শত লোক পোড়া হাত, পা, শরীর নিয়ে হাসপাতাল বেডে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। ডাক্তারদের কাছে নাম ঠিকানা খবর নিয়ে দেখলাম এদের অধিকাংশই বাঙালি।

যাহোক, ৩০ তারিখে রাত ১২.৩০ টার সময় আমার রুমে টোকা পড়ল। ১৫ মিনিটের মধ্যে আমাদের তৈরি হতে বলা হল। জানতে পারলাম আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানের করাচিতে নেয়া হচ্ছে। একটা মাইক্রোবাসে করে ঢাকা বিমান বন্দর রানওয়েতে আমাদের নামান হল। তখন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে।

করাচি আনার পর এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি নেয়া হল মালির ক্যান্টনমেন্ট। সেখানে এক রাত রাখার পর নিয়ে গেল খারিয়া ক্যান্টনমেন্ট। এরপর খারিয়া থেকে ১৪/১৫ মাইল দূরে এক জীর্ণ রেস্ট হাউসে।

এ রেস্ট হাউসটিকে তারা প্রিজনার্স কেজ বানিয়েছিল। গভীর জঙ্গলের মধ্যে এ রেস্ট হাউসটির চারপাশে কাঁটাতারের বেড়া, চার কোণায় মেশিন গান বসান, সেনা

প্রহরা ছাদের উপরে ও চারপাশে। আমি ও আমার পরিবারের সদস্যদের রাখা হল ওই রেস্ট হাউসে। আমাকে রাখা হল একটা রুমে। সেখানে কোন ফার্নিচার ছিল না। বলা হল, 'দিস রুম ইজ এক্সুলসিভলি ফর ইউ। আপনার পরিবার বাংলোর ভিতরে আশেপাশে ঘোরাফেরা করতে পারে। কিন্তু আপনি রুমের বাইরে বেরুতে পারবেন না। আপনার পরিবারের সদস্যদের উপর অবশ্য এ ধরনের বিধিনিষেধ থাকবে না, তবে তারা কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে যেতে পারবে না।'

আমার রুমে ফার্নিচার ছিল না, মেঝেতে ঘুমাতে হত। বাথরুম ছিল খোলা। একজন সিপাহি সব সময় সেখানে দাঁড়ান থাকত।

এই কেজে আমি এপ্রিল থেকে আগস্ট মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত আর্মির অধীনে ছিলাম। প্রত্যেক দিন সকালে বা বিকালে আমাকে ১০ কিলোমিটার দূর ঝেলামে নিয়ে যেত জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। প্রশ্ন শেষ হলে আবার ফিরিয়ে আনত বান্নিতে।

সেখানে কোন সময় সারা দিন কখনও সারা রাত আবার কখন দুইদিন বা দুই রাত পর্যন্ত রাখত। প্রশ্নের সময় কখন সারা রাত দাঁড় করিয়ে রাখত— খেতে দিত না। কিন্তু তারা আমাকে দৈহিক নির্যাতন করেনি, গায়ে হাত উঠায়নি। এ সময় তারা আমাকে নানা রকম প্রশ্ন করত। এর মধ্যে অন্যতম চার্জ ছিল— 'শেখ মুজিব, কর্ণেল ওসমানি ও তুমি পূর্ব পাকিস্তানে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও সেনা বিদ্রোহের পরিকল্পনা করেছিলে এবং এর মাধ্যমে পাকিস্তানকে দু' টুকরা করে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করতে চেয়েছিলে। পরিকল্পিত বিদ্রোহের হেড কোয়ার্টার ছিল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার।'*

এছাড়া অভিযোগ এনেছিল, 'তোমরা ইপিআর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস), পুলিশ ও ছাত্রদের দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি যত সৈন্য সামন্ত আছে ঘেরাও করে ফেলে তাদের

---

*এ বিষয়ে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর জনসংযোগ কর্মকর্তা সিদ্দিক সালিক লিখেছেন—কমান্ড্যান্ট কর্ণেল (পরে ব্রিগেডিয়ার) মজুমদার ছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদে উজ্জীবিত একজন সিনিয়র অফিসার। শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে তাঁর সরাসরি যোগাযোগ ছিল। এটা তাঁর মধ্যে বিরল অহংকার ও বিদ্বেষ— দুইই জন্ম দিয়েছিল। অহংকারটা ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদে উজ্জীবিত হওয়ার আর বিদ্বেষটা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। আমি তাঁর সঙ্গে তাঁর অফিসের ফ্লাওয়ার ডেক লনে দেখা করলাম এবং আমার আগমনের উদ্দেশ্য জানালাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক আলাপে আমার মনে হল তার সম্পর্কে ধারণাগুলো ভিত্তিহীন নয়। তিনি তার নিজের অবস্থান, বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং বাঙালিদের উপর যে সব অবিচার চালান হচ্ছে, সেসব নিয়ে বেশ গুরুত্বের সাথে কথা বলছিলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, 'তোমরা কেন কোটা (বাঙালি সৈন্যদের) দ্বিগুণ করার বিষয়টা নিয়ে ঢাক পিটাচ্ছ? যদি প্রেসিডেন্টের নির্দেশ পুরোপুরি বাস্তবায়ন হয় সেক্ষেত্রেও বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব (সেনাবাহিনীতে) থাকবে মাত্র ১৫ ভাগ। যদিও তারা মোট জনগোষ্ঠীর ৫৬ ভাগের প্রতিনিধিত্ব করছে।'

মজুমদারের সাথে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর আমি মধ্যহ্ন ভোজে যোগ দিলাম পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসারদের সঙ্গে। ... আমার নিমন্ত্রণকারী (হোস্ট) একটা ছোট্ট ঘটনার কথা উল্লেখ করলেন। বললেন, নব্য নিয়োগপ্রাপ্ত বাঙালি সৈন্যদের শেষ দলটি যখন করাচীর উদ্দেশ্যে জাহাজে চড়ে তখন কর্ণেল (ব্রিগেডিয়ার মজুমদার-সম্পাদক) তাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'তোমরা এখন গর্বিত বাঙালি সৈনিক। তোমরা সেখানে পাঞ্জাবি অফিসারদের জুতা পালিশ করতে যাচ্ছ না— শিগগিরই সময় আসছে ওরা তোমাদের জুতা পালিশ করবে।' (Witness to Surrender, সিদ্দিক সালিক, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচি, পাকিস্তান, প্রকাশকাল? পৃঃ ১১।)

যত অস্ত্রশস্ত্র আছে হাত করতে চেয়েছিলে। এছাড়া চেয়েছিলে ইপিআর'কে দিয়ে যত বর্ডার পোস্ট আছে বাতিল করে দিতে যাতে বাকি অস্ত্রশস্ত্র দরকার হলে ইন্ডিয়া থেকে আনা যায়। সে উদ্দেশ্যে তুমি ব্রিগেডিয়ার মজুমদার, ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ডের সঙ্গে মিটিং করেছ খুলনাতে। সে মিটিং-এ তোমাদের সব অপারেশন প্ল্যান তাকে দিয়েছ এবং বলেছ ইন্ডিয়ানরা তোমাদের কিভাবে সহযোগিতা করবে। আরও বলেছ যদি প্রয়োজন হয় তাহলে ইন্ডিয়ানরা শুধু সৈন্য সামন্ত এবং অস্ত্রশস্ত্রই দেবে না, তোমাদের ট্রেনিং-এর ভিত্তিও তৈরি করে দেবে। তোমার আরও প্ল্যান ছিল চিটাগাং-এ যত অবাঙালি আছে তাদেরকে কারারুদ্ধ করে রাখা। তারা যদি এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে তাহলে প্রয়োজনে মেরে ফেলা।'

আমাকে প্রশ্নগুলো করত আইএসআই ও পাকিস্তান আর্মি ইন্টেলিজেন্সের লোকজন। সে সময় ওদের পরিচয় জানা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

ওরা আমাকে একনাগাড়ে প্রশ্ন করে যেত, আমি সব অস্বীকার করে যেতাম।

এভাবে আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ এল। হঠাৎ একদিন ইন্টেলিজেন্সের অফিসার কর্ণেল আঞ্জুম ও কর্ণেল মোক্তার এসে আমাকে ঝেলামে নিয়ে গেল। বলল, 'লেঃ কর্ণেল ইয়াসিন নামে একজন বাঙালি আর্মি অফিসার বলেছে তুমি শেখের (মুজিব) সাথে এবং চিটাগাং-এ স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে মিটিং করেছ, এছাড়া খুলনাতে গিয়ে ইন্ডিয়ান ইস্টার্ন কমান্ড-এর জেনারেলের সাথে মিটিং করেছ। সে মিটিং-এ বাংলাদেশকে কিভাবে সহযোগিতা করা যাবে তা আলোচিত হয়েছে।'

এক পর্যায়ে তারা বলল, 'আর্মিরা তোমার কাছ থেকে স্বীকারোক্তি নিতে ব্যর্থ হওয়ায় সিদ্ধান্ত নিয়েছে তোমাকে স্পেশাল পুলিশে হস্তান্তর করা হবে।'

পরদিন ভোরে তিন/চারটা গাড়ি এল বান্নি ক্যাম্প-এ। আমাকে সামনে পিছনে প্রহরা দিয়ে নিয়ে গেল লাহোরে ফোর্ট-এর স্পেশাল পুলিশ হেড কোয়ার্টারে। আমার পরিবার পড়ে রইল পিছনে বান্নিতে। পুলিশ হেড কোয়ার্টারে আর্মিরা আমাকে (স্পেশাল) পুলিশের হাতে তুলে দিল।

পুলিশ ইন্সপেক্টর দুররানী আমাকে গ্রহণ করে আন্ডারগ্রাউন্ডের একটি সেলে আটকাল। বলল, 'ব্রিগেডিয়ার সাহেব, আমরা দুঃখিত, এখানে আমরা আপনাকে মশারি, বালিশ, চাদর কিছুই দিতে পারব না। আপনি যে অবস্থায় আছেন ওই অবস্থায় থাকতে হবে।'

১২নং সেলের কক্ষটি দেখতে অনেকটা বাথরুমের মত। দেখেই বোঝা যায় বন্দিদের জন্য বানানো। সামনে গরাদ লাগান লোহার দরজা, জানালা নেই। বদ্ধ রুমটাতে বাতাসের জন্য কোন পাখাও নেই। মাথার উপর উচ্চ শক্তির বাল্ব। একটা কমোড রাখা হয়েছে পাশে, প্রস্রাব পায়খানা করার জন্য। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা নাই।

সেলে নেওয়ার আগে ওরা আমার প্যান্ট শার্ট নিয়ে নিল এবং ওদের পোশাক—একটা পাজামা ও জামা দিল। আমার সুটকেসের মধ্যে কোরআনের একটা ওজিফা (ধর্মীয় গ্রন্থ) ছিল। ওটা ওদের কাছে চাইলাম। দিল না। বলল, 'পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পরে দেব।'

ওইদিন সারাদিন সারারাত রাখল। কোন খাবার দাবার দিল না। পরদিন ইন্সপেক্টর আবার এল। দূর থেকে দেখল। কোন কথা বলল না। চলে গেল। সারাদিন গেল, রাত্রি বেলা একজন সিপাহী পশ্চিম পাকিস্তানি তিনটি বড় সাইজের রুটি ও বাটিতে কিছু সব্জি নিয়ে এল।

লোহার দরজার নিচে ঝাড়ু দিয়ে ময়লা ফেলার ফাঁক দিয়েই আমাকে খাবারটা দিল। আমার কাছে পৌঁছুতে পৌঁছুতে দেখলাম উপরের রুটিটায় বালু ভরে গেছে। ওই অবস্থা দেখে আমি আর খেতে চাইলাম না। যেখানে ছিল, ওখানেই খাবারটা পড়ে থাকল।

কিছুক্ষণ পর সিপাহীটা আবার এল। দেখল খাবারটা ওইভাবে পড়ে আছে। কিছু বলল না। প্লেটটা তুলে নিয়ে চলে গেল। রাতেও অভুক্ত থাকলাম।

পরদিন সকালবেলা দুররানী এল। আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'কুচ্ খায়া পিয়া হ্যয়?'

বললাম, 'না, খাই নাই কিছু।'

দুররানী বলল, 'কিউ, খানে কা কুছ নেহী দিয়া?'

উত্তর দিলাম, 'ভুখ নেহী।' বললাম না যে ময়লার জন্য খাইনি।

সে বলল, 'যেয়সে খানা তুম কো মিলা থা ইঁহা তো এয়সাই খানা পাড়ে গা। নেহি খায়ে তো তুমহারা লোকসান, হামারা তে কুচ নেহি হ্যায়। ইসসে বেটার খানা ইহা হাম নেহি দে স্যেকতা।'

পরে সে চায়ের অর্ডার দিল। সাথে এল একটা বড় সাইজের রুটি।

চায়ের মগ্ তো আর দরজার নিচ দিয়ে যায় না। এজন্য ইন্সপেক্টর নিজেই দরজা খুলে মগ আর রুটিটা দিল। চায়ে ভিজিয়ে ওটা খেলাম। দুররানী মগ নিয়ে গেল।

১১টার দিকে সে ফিরে এল দুইজন সিপাহীকে নিয়ে। সেলের দরজা খুলে সিপাহীরা আমার হাত দুটো জোর করে ধরল। নিয়ে গেল উপর তলায়, আর্মির কাছ থেকে যে রুমটাতে আমাকে গ্রহণ করেছিল, সেখানে।

দুররানী বসল উঁচু চেয়ারে, যেমন বড় অফিসে অফিসের কর্তা বসে। আমাকে বসাল উল্টো দিকে একটা টুলের উপর। কাছেই বসেছিল পুলিশ অফিসার শফি ও পুলিশ ইন্সপেক্টর সফদর কাজী। তারা অনেক রকম প্রশ্ন করল। এর মধ্যে প্রধান চার্জ ছিল— 'তুমি চিটাগাং-এ অনেক অবাঙালিকে হত্যা করেছ। এ সম্পর্কে তোমার বক্তব্য কি?'

বললাম, 'আমি তো নন-বেঙ্গলি মারিনি। ওই ঘটনা তো ঘটেছে আমি যে দিন মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হলাম তার আগের দিন। তখন ওখানে চার্জে ছিল লেঃ কর্ণেল ফাতেমী। সে গোলমাল কন্ট্রোল করতে পারেনি। সৈন্যরা অনেক বাঙালিকে মেরেছে— এ সংবাদ জানার পর লেঃ জেনারেল ইয়াকুব খান রাত ৯টায় আমাকে টেলিফোনে তার স্থানে নিয়োগ দেন। আমি চার্জ নেয়ার পর ৪ মার্চ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড হয়নি।

যেমনি এ কথা বলেছি, অমনি পাশে বসা শফি উঠে এসে এমন জোরে থাপ্পড় মারল। আমাকে এত জোরে মারল যে, আমি টুলের উপর থেকে উল্টে নিচে পড়ে গেলাম।

আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। উঠে বসলাম। উর্দু ও ইংরেজী মিশিয়ে বললাম, 'বাবারা তোমরা তো আমার ছেলের বয়সী। আমার বয়স আর আমার র‍্যাংক দেখ। হাত জোড় করে বললাম, 'আল্লাহর দোহাই, তোমরা আমাকে মেরো না।'

এরপর দুররানী তার চেয়ার ছেড়ে উঠে এল। আমাকে নিয়ে নিচের সেলে গেল। যাওয়ার পথে বলল, 'অফিসাররা তোমার গায়ে হাত তুলেছে, এজন্য আমি দুঃখিত। তুমি কিছু মনে কর না।'

আমি তখন ছোট বাচ্চার মত কাঁদছিলাম। দুররানী এ অবস্থা দেখে বলল, 'ভবিষ্যতে এ রকম আর হবে না।'

সেলের মধ্যে রাখার পর আমি দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে সুরা ইয়াসিন পড়তে শুরু করলাম। আমার মনের মধ্যে একটা গভীর বিশ্বাস ছিল, সুরা ইয়াসিন যার মুখস্ত সে কখনও অপমানিত হবে না। মনের সে জোর থেকে সুরা ইয়াসিন পড়ছিলাম আর দেয়ালের মধ্যে মাথা ঠুকিয়ে ঠুকিয়ে কাঁদছিলাম, আল্লাহকে ডাকছিলাম। কারণ যে ঘটনাটা তারা ঘটিয়েছে, আমি সেটা আশা করতে পারিনি। আমার মত সিনিয়র অফিসারকে ওরকম একজন পুলিশ অফিসার থাপ্পড় দেবে আমি ভাবতেও পারিনি। আর্মিরাও এ কাজ করেনি।

আমি যখন এই সব করছি এমন সময় দুররানী আবার এল। আমাকে ও উপরে নিয়ে গেল।

এবার যখন গেলাম, দেখলাম, কামরার সামনে মোটা ৫/৬ জন লোক। কেউ দাঁড়িয়ে কেউ বসে। কামরার ভেতরে চেয়ার টেবিল কিছুই নেই— একেবারে ফাঁকা। শফি ও কাজী দাঁড়ানো। শফিকে দুররানী বলল, 'শফি সাহেব, কিছু না স্বীকার করলেও ওনাকে মারবেন না।'

শফি বাঘের মত বলল, 'আপনি কি বলেন? মারধর না করলে এ শালা কিছু বলবে না। এ চিটাগাং-এ হাজার হাজার পাকিস্তানি ভাইকে হত্যা করেছে। শেখের সাথে মিলে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বেঈমানী করছে, দুশমনি করছে। ওকে দেখতে ছোট, কিন্তু একটা বড় বদমাইশ। যতক্ষণ আমি ওকে থাপড়াতে না পারব, ততক্ষণ শান্তি নেই।'

শফি ও কাজী এক নাগাড়ে কিল, ঘুষি, থাপ্পড়, লাথি মারল। যখন থামল তখন বাইরে দাঁড়ান লোকগুলো ভিতরে এল।

কারো হাতে ব্যাগ, কারো হাতে দড়ি, পানির ব্যাগ, আবার কারো হাতে হকিষ্টিক। দুররানী দূরে দাঁড়িয়ে। শফি ও কাজী এগিয়ে এল। আমার হাত দুটো পিছনে বেঁধে দাঁড় করাল।

হঠাৎ দুররানী বলল, 'মজুমদার তো হিন্দু হোতা হায়, দেখোতো এ হিন্দু, না মুসলমান?'

বলার সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়ান সিপাহিগুলো আমার পায়জামা একটানে ছিঁড়ে ফেলল। আমাকে একেবারেই উলঙ্গ করে ফেলল। আমি জোরে কেঁদে উঠলাম। ওরা দেখল।

দুররানীকে বললাম, 'ইন্সপেক্টর তুমি তো বলেছিলে আমার উপর কোন অত্যাচার হবে না। এর চেয়ে আর বড় বেশি জুলুম আর কি হতে পারে? আমি বয়স্ক মানুষ।

আমার চেহারা দেখ, র‍্যাংক দেখ, পুলিশের সামনে তোমরা আমাকে উলঙ্গ করলে, আমার আর কি বাকি থাকল?' ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে আমি তখন কাঁদছিলাম।

দুররানী সিপাহীদের নির্দেশ দিল, 'পায়জামা দিয়ে দাও।'

আমাকে সেলে ফেলে রেখে গেল। সমস্ত শরীরের ব্যথা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকল। বিভিন্ন জায়গা ফুলে যাচ্ছে, কোথাও কালো দাগ হচ্ছে। আমি অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে মেঝের মধ্যে পড়ে থাকলাম। বিকাল আসতে আসতে ব্যথা তীব্রতর হল। রাত্রে উচ্চ ক্ষমতার লাইট জ্বালান থাকত। অনেক নিচু করে, ঠিক মাথার ওপর। সমস্ত রুম আগুনের মত গরম হয়ে যেত। গায়ের শার্ট খুলে আমি বাতাস করতাম।

রাতে সমস্ত শরীর ফুলে গেল। আমাকে ওরা মেরেছে সে কষ্টের চেয়ে বেশি কষ্ট হচ্ছে ওরা কেন আমাকে উলঙ্গ করে মেরেছে! সারারাত কাঁদলাম, আল্লা-বিল্লাহ করলাম, নামাজ পড়লাম— রাত চলে গেল।

পরের দিন প্রায় ১০টা/১১টার সময় ওরা আবার এল। দুররানী এসে আমাকে নিয়ে গেল। দেখলাম ওই লোকগুলো একই অবস্থায় দাঁড়ানো। ভিতরে ঢোকার পর লক্ষ্য করলাম কামরাটা আগের মত খালি। শফি ও দুররানী আমাকে বসাল এবং বলল, 'গতকাল তো তুমি বললে কিছুই জান না, ভারতীয় ইস্টার্ণ কমান্ডের সাথে মিটিং করনি, কিন্তু কর্ণেল ইয়াসিন তো তোমার ব্যাপারে সব কিছু বলেছে।'

আমি বললাম, 'তাহলে ইয়াসিনকে নিয়ে আস আমার সামনে। আমি তাকে দু'একটা প্রশ্ন করব, তাতেই তোমরা বুঝে নেবে সে যা বলেছে সবই মিথ্যা। আমি তো ভারতীয় ইষ্টার্ণ কমাণ্ডের সাথে কোন মিটিং করি নাই।'

তারা দু'জন আমাকে বসিয়ে রেখে ইয়াসিনকে আনতে বাইরে গেল। কিছুক্ষণ পর ফিরে এল। বলল, 'আমরা যখন গেছি, দেখি ইয়াসিন বসে কোরআন শরীফ পড়ছে। সে কোরান শরীফ মাথায় নিয়ে বলেছে আমি যা বলেছি সবই সত্য, কিন্তু ব্রিগেডিয়ার এর সামনে আমাকে নিও না, নিলে আমার অসুবিধা হবে।'

আমি তখন বললাম, 'তোমরা তাহলে কোরআন নিয়ে আস আমি মাথায় নিয়ে বলি ইয়াসিন যা বলেছে সবই মিথ্যা।'

তারা বলল, 'ইয়াসিন কোরআন মাথায় নিয়েছে, সে কিভাবে মিথ্যা বলে? সে যা বলেছে সবই সত্যি।'

এটা বলা মাত্রই শফি ঝাঁপিয়ে পড়ল। অমনি বাইরে যারা দাঁড়িয়েছিল, ভিতরে এল। সাথে দুটো চেয়ার হাতে করে আনল। এ দুটোকে পাশাপাশি রাখল। এরপর আমার হাত ও পা বাঁধল। একটা হকিষ্টিক বাঁধা হাত পায়ের ভিতর দিয়ে ঢুকিয়ে, কশাইরা যেরকম ছাল ছাড়াবার জন্য জবাই করা খাসি ঝোলায় সেভাবে আমাকে চেয়ার দু'টির মাঝখানে ঝোলাল। এ সময় ওরা আমার শার্ট, পাজামা খুলে ফেলেছিল। ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি লম্বা তার এনে তারা একটা রডের সাথে কানেকশন দিল। দুররানি নিজেই রডটা আমার রেকটামের মধ্যে ঢুকিয়ে ইলেকট্রিক শক দিতে লাগল। তীব্র যন্ত্রণায় আমি চিৎকার করে উঠলাম। প্রায় বেহুঁশ হয়ে গেলাম। এ সময় দুররানি বলল, 'তোমাকে যেটা জিজ্ঞেস করেছি, সেটা না বলা পর্যন্ত তোমাকে ছাড়ব না।'

আমি বললাম, 'আমাকে এত কষ্ট না দিয়ে বরং মেরে ফেল। আমাকে এত যন্ত্রণা আর দিও না।'

সে তখন বলল, 'মরনে সে পহেলে তো বহুৎ কুছ বাকী হ্যায়।'

কিছুক্ষণ শক দেয়ার পর আমাকে নিয়ে গেল সেলে।

এভাবে কয়েকদিন চলার পর একদিন দুপুরবেলা আমাকে একটা বস্তার মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলে রাখল আগস্টের কড়া রোদের মধ্যে। স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করতে থাকল। আমি অস্বীকার করতে থাকলাম। এরপর আমাকে নিয়ে গেল আগের টর্চার সেলের পাশের একটা রুমে। সেখানে দেখলাম প্রচুর ইলেকট্রিকের যন্ত্রপাতি।

এ সময় তারা বলল, 'বল তোমার পয়গম্বর মুজিব ও ওস্তাদ ওসমানির সাথে তুমি কী ষড়যন্ত্র করেছিলে?'

আমার কাছ থেকে কাঙ্খিত উত্তর না পেয়ে আবারও শুরু করল অত্যাচার। এবার আমাকে খাটের উপর উঠিয়ে উপরে ঝোলান রশির সাথে হাত বাঁধল আর অন্যটার সাথে পা। কিছুক্ষণ পর হাতের বাঁধন খুলে মাথা নিচের দিকে ঝুলিয়ে দিল। আমি চৌকিতে ভর দিলাম। চৌকিটাও সরিয়ে নিল। শুরু করল নির্মমভাবে পিটুনি।

হট ওয়াটারের ব্যাগ ও পাটের দড়ি দিয়ে ইচ্ছামত পেটাল মাথায়, বুকে, পিঠে, সমস্ত শরীরে। আমার শরীরে যাতে দাগ না পড়ে সে জন্য তারা লাঠির বদলে এ পদ্ধতি গ্রহণ করে।

আমার কাছ থেকে কিছু উদ্ধার করতে না পেরে দড়ি থেকে নামাল। মাটিতে পড়ে গেলাম। আমি তখন চিৎকার করছি, 'পানি দাও, পানি।'

শফি প্যান্ট খুলে আমার মুখের মধ্যে প্রস্রাব করে দিল। বলল, 'ইয়ে লো পানি।'

আমি বলে বোঝাতে পারব না কী বীভৎস ছিল সেই নির্যাতন। ওই সব অমানুষিক নির্যাতনের ভয়ঙ্কর স্মৃতি আজও আমাকে ভয়ানক কষ্ট দেয়।'

ওরা চলে গেল। প্রস্রাবের মধ্যে পড়ে আছি। মিনিট দশেক পরে আবার সদলবলে ফিরে এল। আমাকে দাঁড় করিয়ে শফি বলল, 'তুম ইনসান হ্যায় ইয়া হাওয়ান হ্যায়—? তুমহারা উপর ইতনা জুলুম হো রাহা হ্যায়, ফিরভি তুম সাচ নেহি বোলতা? যব তক তুম সাচ নেহি বোলেগা, হাম তুমকো নেহি ছোড়েগা।'

এবার ওরা আমাকে চৌকির মধ্যে শোয়াল। পিঠ থেকে মাথা পর্যন্ত চৌকিতে রাখল, আর পা দু'টো উঁচু করে ধরল সহযোগী পুলিশরা। দুররানি এসময় ফোলা রেকটামের মধ্যে আবারও ইলেকট্রিক শক দিতে আরম্ভ করল। আমার চিৎকারের আওয়াজ যাতে বাইরে না যায় সেজন্য দরজা জানালা ভাল করে বন্ধ করতে অর্ডার দিল।

একজন সিপাহি ঠিক এসময় আমার অণ্ডকোষ দু'হাত দিয়ে চেপে ধরল। আমি চিৎকার করে উঠলাম। মনে হল আমার জান বের হয়ে আসছে।

সহ্য করতে না পেরে বললাম, 'তোমরা কি চাও আমার কাছে, বল। আমার উপর আর অত্যাচার করো না। তোমরা যা চাও আমি দেব। যা বলবে তাই করব।'

দুররানি তখন বলল, 'আব দিমাগ ঠিক হুয়া, আব হুশ আয়া। ঠিক হ্যায় উঠো।'

সিপাহিরা এ সময় একটা চেয়ার, টুল এবং এক জগ পানি এনে ঘরের ভিতর রাখল।

আমি প্রাণভরে পানি খেলাম। দুররানী বলল, 'তোমার উপর যতগুলো চার্জ আনা হয়েছে ওগুলো কাগজে লিখ, নাহলে ঐ দেখ তোমার বন্দোবস্ত। বলে সে ছাদের সাথে ঝুলানো রশি, ইলেকট্রিক তার সহ আরও যত নির্যাতনের সরঞ্জাম আছে দেখাল এবং বলল, 'ওগুলো তোমার ওপর প্রয়োগ করা হবে। আর যদি সোজা হও তো সোজা পথে চল।'

আমি বললাম, 'তারচে' ভাল হবে তুমি লিখ। আমি তাতে দস্তখত করে দেব।'

সে মনে মনে হয়ত বুঝল সে যা চায় আমি লিখতে পারব না অথবা বেশ কম হবে। বলল, 'ঠিক আছে।'

এরপর তারা আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করল। প্রথমবারের মত আমাকে ভাত খেতে দিল, সাথে মাংস। কিন্তু আমি শরীরের যন্ত্রণা ও বেদনায় অস্থির হয়ে গেলাম। বিশেষ করে রেকটামে ইলেকট্রিক শকে ফুলে ঘা হয়ে গেছে, অন্ডকোষ ফুলে মোটা হয়ে গেছে। আমি দুররানিকে বললাম, 'ভাই, আমার অবস্থা তো খুব খারাপ— রেকটামে ঘা হয়ে গেছে, অণ্ডকোষ ফুলে গেছে, আমি প্রস্রাব করতে পারছি না।'

তখন সে বলল, 'আমরা আজ তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।'

ওই ফোর্টের মধ্যে আবার হাসপাতালও ছিল। আমাকে সন্ধ্যার সময় ডাক্তারের কাছে নেয়া হল। ডাক্তার আমার কাপড় খুললেন। দুররানী তখন দাঁড়িয়ে। তারা দেখল আমার লিঙ্গের মুখ ফুলে বন্ধ হয়ে গেছে। অণ্ডকোষ ফুলে সাংঘাতিক মোটা হয়েছে, রেকটামে ঘা হয়েছে। ডাক্তার বলল, 'তাকে তো এখানে রাখতে হবে। অবস্থা তো খুবই খারাপ।'

দুররানী রাজী হল না। বলল, 'কোনভাবেই তাকে এখানে রাখা যাবে না।' এ সময় ডাক্তার দুররানীকে দূরে সরায়ে নিয়ে কানে কানে কি যেন বলল। দুররানি রাজী হল।

আমাকে হাসপাতালে রাখা হল। রাতে পেইন কিলার জাতীয় ওষুধ দিল। দু/তিন দিন থাকলাম ওখানে। হাসপাতাল ছাড়ার পর দুররানী বলল, 'তুমি তো ইংরেজী ভাল পার। আমি উর্দুতে বলি, তুমি ইংরেজীতে লিখ। লেখার পর সে বলল তুমি যে এটা লিখেছ এবং এটা যে তোমারই দস্তখত, তোমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে গিয়ে বলতে হবে। তো, কালকে তোমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে যাব।'

পরদিন আমার নিজস্ব কাপড় চোপড় দিয়ে দিল। একটা গাড়িতে দুররানী আর শফি আমাকে নিয়ে এল লাহোরের ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট রুমে।

ম্যাজিস্ট্রেটের রুমে ঢোকার আগে রুমের সামনে নেম প্লেইটে লেখা দেখলাম কী যেন- 'বাজওয়া'। বাজওয়া আমাকে কিছু পানীয় দিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'বাড়ি কোথায়, কি পড়াশুনা করেছি' ইত্যাদি। তাঁকে জানালাম আমি ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি গ্র্যাজুয়েট। এরপর তাঁকে বললাম, 'ভাই, আপনি তো আর পুলিশ না, ম্যাজিস্ট্রেট, শিক্ষিত মানুষ। আমার বড় ভাইও ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। দেখেছি ম্যাজিস্ট্রেটরা খুব নীতিবান হয়। পুলিশরা মারধর করে যখন আসামীকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে দেয়, তখন সে আশ্বস্ত হয়ে সত্যি কথাই বলে। আমিও সত্যি কথা বলতে চাই। এই যে সমস্ত লেখা হয়েছে, এগুলো আমার স্বীকারোক্তি না, তারা অমানুষিক নির্যাতনের মধ্যে মনগড়াভাবে সব লিখেছে, কর্ণেল ইয়াসিন না কে যেন আমার বিরুদ্ধে কি যেন বলেছে আর ওরা এগুলো লিখে বলপূর্বক আমার স্বাক্ষর নিয়েছে। আমি আপনার সামনে সমস্ত

লেখা অস্বীকার করছি।'

কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, 'ব্রিগেডিয়ার সাহেব, আজ কাল দেশে মার্শাল ল'। আপনি যদি পুলিশে দেয়া জবানবন্দি অস্বীকার করেন তাহলে যেমনি রুম থেকে বেরুবেন অমনি ওরা ধরে ৩/৪ গুণ বেশি নির্যাতন করবে। হয়ত মারতে মারতে মেরেই ফেলবে। তারচেয়ে সব কিছু স্বীকার করে নেয়া ভাল।'

আমি যখন দেখলাম ম্যাজিস্ট্রেটও ওই দলের, তখন বললাম, 'আপনিও যদি এ কথা বলেন, আমি স্বাক্ষর করি।'

এরপর আমাকে ফেরত নিয়ে এল পুলিশ হেডকোয়ার্টারে। কিছুদিন পর সেখানে এল ব্রিগেডিয়ার এজাজ। সে আমাকে বলল, 'তোমার স্বীকারোক্তির প্রেক্ষিতে কোর্ট মার্শাল অনিবার্য।'

এর আগে দুররানী আমাকে কড়া হুমকি দিয়ে বলেছে, 'সাবধান, নির্যাতনের কোন ইঙ্গিত ব্রিগেডিয়ার এজাজকে দিলে তুমি পস্তাবে।' এজাজের উপস্থিতিতে সে নিজে সামনে দাঁড়িয়ে থাকল।

এরপর আমাকে অন্ততঃ দশটি দুর্গ, জেল ও সেলে খাবার, ঘুম ও নামাজের অনিয়মিতার মধ্যে নিঃসঙ্গ রেখে ঘুরাল। এতে প্রতি মুহূর্তে আমার দুশ্চিন্তা— আমাকে কোর্ট মার্শাল করে মারবে, না এমনিই মেরে ফেলবে। স্ত্রী ও ছেলেদের কি আর দেখব না!

মালাকান্দ ফোর্ট আমার শরীর খুব খারাপ হয়ে গেল। রেক্টামে ইনফেকশন, জ্বর, মুখমণ্ডল ফুলে গেল। অগত্যা আমাকে মারদান কম্বাইন্ড মিলিটারি হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসাধীন রাখল। সেখানে থাকাকালে ১৬ই ডিসেম্বর একাত্তর দেশ স্বাধীন হল।

১৫ জানুয়ারি '৭২ আমাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিয়ে বলল, 'তুমি এখন স্বাধীন।'

আমি চলে গেলাম রাওয়ালপিণ্ডিতে আমার এক আত্মীয়ের বাসায়। সেখানে শুনলাম আমার পরিবার দেশে চলে গেছে অনেক ভোগান্তির পর। পহেলা মার্চ '৭২ পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি হামিদুর রহমানের নেতত্বে পরিচালিত 'পাকিস্তান কমিশন অব ইনকোয়ারি ১৯৭১ ওয়ার' থেকে সমন পেলাম। ১০ মার্চ '৭২ তারিখে স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে জবানবন্দি দিলাম। সেখানে সংক্ষেপে লিখে এবং বলে দিলাম, অমানুষিক নির্যাতনের মাধ্যমে বলপূর্বক পুলিশ তথাকথিত স্বীকারোক্তিতে স্বাক্ষর নিয়েছে।

পুলিশী নির্যাতন এবং তাদের তৈরি স্বীকারোক্তিতে বলপূর্বক আমার স্বাক্ষর নেয়ার কথা পাকিস্তান আর্মির হেডকোয়ার্টারে নালিশ করে জানানোর পরই আবার আমাকে গ্রেফতার করে সুদূর দক্ষিণ ওয়াজিরিস্থানের ওয়ানা দুর্গে নিয়ে গেল। সেই নিঃসঙ্গ কারাগারে কড়া পাহারাধীন অসহনীয় অমানুষিক নির্যাতনের মধ্যে ৫ নবেম্বর '৭৩ পর্যন্ত বন্দি রাখল।

৬ নবেম্বর বন্দি বিনিময় চুক্তির অধীনে আমি স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখলাম।

সাক্ষাৎকার ঃ রুহুল মতিন

একদিন তারা বিরক্ত হয়ে আমাকে বরফের স্ল্যাবের ওপর ফেলে রাখে

লেঃ কর্ণেল মাসুদুল হোসেন খান (অবঃ)

লেঃ কর্ণেল মাসুদুল হোসেন খান ছিলেন দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর রেজিমেন্টের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড মেজর শফিউল্লাহর নেতৃত্বে এ রেজিমেন্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সামরিক বাহিনীর ভেতর বিদ্রোহের অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় '৭১-এর ২৩শে মার্চ। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে তাঁকে পাকিস্তান নেয়া হয় এবং শুরু হয় দুঃসহ বন্দি-জীবন ও নিষ্ঠুরতম নির্যাতন। ৯ই অক্টোবর '৯৯ তারিখে তার এ জবান বন্দি ক্যাসেটে ধারণ করা হয়েছে।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে আমি ছিলাম জয়দেবপুর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার ইন কমান্ড। মার্চের শুরুতে ঢাকা স্টেডিয়ামে ছিল অস্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্তানের ক্রিকেট খেলা। আমিও খেলা দেখতে গিয়েছিলাম। খেলা শুরু হওয়ার আগে খবর শুনলাম ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির অধিবেশন স্থগিত করা হয়েছে। '৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একচ্ছত্রভাবে জয়লাভ করেছিল। কিন্তু এ দলটি যাতে ক্ষমতায় যেতে না পারে সে জন্য এ দুরভিসন্ধি। সমস্ত স্টেডিয়াম যেন বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। খেলা পণ্ড হয়ে গেল। লোকজন নেমে এল রাস্তায়।

এরপর তো শুরু হয় ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে অসহযোগ, হরতাল। এ কারণে ব্যাংক বন্ধ থাকায় আমার রেজিমেন্টের সৈন্যদের ১ তারিখে বেতন দেয়ার কথা থাকলেও সেটা সম্ভব হয়নি। এমনকি ঢাকা থেকে তাদের জন্য রেশনও আনতে পারছিলাম না। ক্রমশঃ এ ধরনের নানা অসুবিধা হচ্ছিল।

১৯শে মার্চ আমার বস ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাব ৮/১০ গাড়ি সৈন্য নিয়ে জয়দেবপুর এলেন। উনি বলেছিলেন জয়দেবপুরে আমাদের অবস্থা ও সমস্যা দেখতে

আসাই তার উদ্দেশ্য। কিন্তু এত বিশাল সৈন্য সামন্ত দেখে আমার সেটা মনে হয়নি। এত সৈন্য আনার পিছনে মতলব ছিল। সেটা ছিল আমাদের ডিজআর্ম করা। কয়েকদিন আগে থেকে আমি এ ধরনের আভাস পাচ্ছিলাম।

এ সময় আমার রেজিমেন্টে ৯০০ সৈন্যের মধ্যে মাত্র ২৫০ সৈন্য বর্তমান ছিল। রেজিমেন্টে ৪টি কোম্পানির মধ্যে কেবলমাত্র হেড কোয়ার্টার কোম্পানিটা জয়দেবপুর ছিল। বাকী তিনটাকে ইন্ডিয়ান বর্ডারে অশান্তি রোধ ও অন্যান্য অজুহাতে বাইরে পাঠান হয়েছিল। একটিকে গাজীপুরে অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি রক্ষা করা, আর দুটিকে ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল ও জামালপুর (মহকুমা)-এ পাঠিয়েছিল ভারতীয় আগ্রাসনের অজুহাতে। মূল উদ্দেশ্য ছিল হেড কোয়ার্টার থেকে বাঙালি সেনা সরানো।

শুধু আমার ধারণাই নয়, স্থানীয় লোকজনেরও মনে হয়েছিল আমাদের নিরস্ত্র করার জন্য ব্রিগেড কমান্ডার এখানে এসেছে। এজন্য জনসাধারণ টঙ্গী থেকে আরম্ভ করে জয়দেবপুর রাজবাড়ি পর্যন্ত, যেখানে আমরা ছিলাম, ব্যারিকেড সৃষ্টি করেছিল। যাতে করে সৈন্যরা না পৌছুতে পারে।

আমরাও অবশ্য সে সময় প্রস্তুত ছিলাম। কারণ আমাদের উপর আগে থেকেই অর্ডার ছিল সব সময় প্রস্তুত থাকতে, কারণ যে কোন মুহূর্তে ভারতীয় সৈন্য বর্ডার অতিক্রম করে পূর্ব পাকিস্তানে আগ্রাসন চালাতে পারে। বিভিন্ন ব্যারিকেড সরিয়ে আসতে আসতে ব্রিগেডিয়ার আরবাব আর তার দলের যথেষ্ট সময় লেগেছিল। তাড়াতাড়ি খেয়ে দেয়ে ওরা যখন ফিরে যাবার পরিকল্পনা করছিল এ সময় জনসাধারণ জয়দেবপুর লেবেল ক্রসিং-এ মালগাড়ি টেনে এনে ব্লক করে দিয়েছিল।

সে সময় ব্রিগেডিয়ার আরবাব আমাকে অর্ডার দেয়, 'তুমি ব্যারিকেড সরাও। এখানে এত আন্দোলন কেন? প্রয়োজনে লোকের ওপর বেপরোয়া গুলি চালাও। যাতে আমি ঠিকমত ঢাকা ফিরে যেতে পারি।'

বললাম, 'দেখি, আমি কি করতে পারি।' নিজেদের লোকদের উপর তো বেপরোয়া গুলি বর্ষণের প্রশ্নই ওঠে না।

কিছুক্ষণ পর ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাব বুঝল, আমি গুলি চালাতে ইতস্ততঃ করছি। গুলি করছি না বা মাঝে মাঝে একটা দুইটা গুলি করছি। তখন সে আমার কোম্পানি কমান্ডার বাঙালি মেজর মঈনকে অর্ডার দিল। আমি মঈনকে বললাম, 'তুমি এমনভাবে দু'একটা গুলি চালাও যাতে মাথার উপর দিয়ে বা পায়ের নিচে দিয়ে যায়, যাতে লোকজন না মরে। এটা দেখতে পেয়ে জাহানজেব আরবাব তার নিজের ট্রুপসকে অর্ডার দিল গুলি চালানোর জন্যে। আমাদের পেছনে বামে গুলি করল। ফলে আমরা অনেকটা ঘেরাও হয়ে গেলাম। পাকিস্তানি সৈন্যরা মেশিনগান থেকে গুলি ছুঁড়ল। কিছু লোক মারা পড়ল, বাকিরা পালিয়ে গেল। মারা পড়ার মধ্যে মনু মিয়া ও খলিফা নামে দুই জন ছিল। বলা প্রয়োজন, এ সময় স্থানীয় জনসাধারণও শটগান, বন্দুক, বল্লম নিয়ে প্রস্তুত ছিল; কিন্তু হেভি মেশিনগানের মুখে এগুলো আর কতক্ষণ?

আমরা নিজেদের সৈন্যদের সরিয়ে দিয়ে জাহানজেবের সৈন্যদের চলে যেতে সহযোগিতা করে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছিলাম। সে সময় আমরা সামরিক শক্তি

প্রয়োগের কথা চিন্তা করি নি। কারণ শেখ সাহেব ইয়াহিয়া খানের সাথে আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিকভাবে পরিস্থিতি সমাধান করার চেষ্টা করছিলেন।

জাহানজেব আমাকে হুমকি দিয়ে শাসিয়ে গেল, 'তোমার সৈন্যদের তুমি ঠিকমত কমান্ড কর, এভাবে চলবে না।' আমাকে অনেকটা ইঙ্গিত দিয়ে গেল যে ভবিষ্যতে হয়ত আরও কিছু অসুবিধা হতে পারে।

২৩শে মার্চ একটা কনফারেন্সের অজুহাতে আমাকে ঢাকায় ডাকা হল। সকালে আমি ঢাকা এলাম। জানলাম কনফারেন্স একটা ভাওতা মাত্র। আমার পরিবার ঢাকাতে ছিল। আর্মি ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার এ যখন গেলাম তখন ব্রিগেড স্টাফ আমাকে বলল, 'ব্রিগেড কমান্ডার নেই, উনি ঢাকা শহরে গেছেন। শহরে অনেক গোলমাল হচ্ছে।'

বুঝলাম আসলে উনি বাঙালি নিধন প্রকল্পে ব্যস্ত ছিলেন। ব্রিগেড মেজর বলল, 'আপনি তো অনেকদিন পরিবারের সাথে থাকেন না; এখন ওদের সাথে থাকেন। কমান্ডার এলে আপনাকে খবর দিয়ে নিয়ে আসব।'

প্রায় ঘন্টা দুয়েক পরে আমাকে টেলিফোন করল, আমি গেলাম। ব্রিগেড কমান্ডার বলল, 'কর্ণেল মাসুদ তুমি আর জয়দেবপুরে ফিরে যাচ্ছ না। ইউ আর নো মোর কমান্ডিং অফিসার অব সেকেন্ড বেঙ্গল। সামবডি উইল কাম এন্ড টেক ওভার। তুমি বাড়িতে থাক। বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবে না। আর প্রত্যেক দিন স্টেশন হেড কোয়ার্টার-এ হাজিরা দেবে।'

বস্তুতঃ আমাকে ২৩ তারিখেই হাউস এ্যারেস্ট করল। কারণ বাড়িতে যাওয়ার পর দেখলাম সাদা পোশাকধারী ইন্টার সার্ভিস ইনটেলিজেন্স (আই এস আই) আশে পাশে ঘোরাফেরা করছে। আমি ওদের অনেককে চিনতাম। আমার বাড়ির পাশে একটা রেস্ট হাউস ছিল। আমি ওদেরকে ওখানে আগে দেখেছি। ওরা ওই সময় আমার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবকে বাসায় ঢুকতে বাধা দিত। আর আমার তো ওই পরিস্থিতিতে বাইরে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

ইতিমধ্যে রেজিমেন্ট থেকে গাড়ি এল আমাকে নিতে। ওরা ফেরৎ পাঠাল। আমি জয়দেবপুর থেকে চলে আসার পর সেকেন্ড ইন কমান্ড মেজর শফিউল্লাহ আমার স্থলাভিষিক্ত হন। কিছুদিন পর আরও একজন বাঙালি কর্ণেল রকিব, যিনি ৩২ পাঞ্জাব রেজিমেন্টে কমান্ড করছিলেন, ওখানে যোগদান করেন। কিন্তু বাঙালি সৈন্যরা কর্ণেল রকিবকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেনে নিতে পারেনি। মেজর শফিউল্লাহই মোটামুটি চালাচ্ছিলেন।

২৫ তারিখ রাতে ঢাকায় খুব গোলাগুলি শুরু হল, ট্যাংক চলাচলের আওয়াজ পাচ্ছি। সেদিন এত বেশি গোলাগুলি হল যা জীবনে কখনও শুনিনি। সাথে সাথে আমি জয়দেবপুর মেজর শফিউল্লাহকে ফোন করলাম। বললাম, 'শফিউল্লাহ, ঢাকায় তো এখন খুব গোলাগুলি চলছে, তোমাদের ওখানে খবর কি?'

সে বলল, 'না, আমাদের এখানে তো কিছু হচ্ছে না।'

তখন বললাম, 'ইউ শুড বেটার গেট প্রিপেয়ার্ড। জয়দেবপুর তো রেজিস্টার্ড টার্গেট, যে কোন সময় হামলা হতে পারে।'

পুরো ব্যাটেলিয়ানকে আমি আগেই বলেছিলাম, 'জয়দেবপুরে থাকা চলবে না, কিছুদিনের মধ্যে আমাদের হয়ত মধুপুর জঙ্গল বা অন্য কোথাও আশ্রয় নিতে হতে পারে।' আমি মার্চের গোড়ার দিকেই এ কথা ওদের বলেছিলাম।

তখনই শফিউল্লাহ বলেছিল, 'স্যার হোয়াই ইউ সে সো লাউড?' আমি বলেছিলাম, 'আমি তো তোমাদের কাছেই বলছি, আর কাউকে তো বলছি না। এখানে তো সবাই বাঙালি আছ।'

ওই অনুষ্ঠানে ছিল বিভিন্ন র‍্যাংকের বাঙালি অফিসাররা।

তখন সবাই হেসেছিল। আমি বলেছিলাম, 'কালকে আমি নাও থাকতে পারি। আমরা সবাই যে সব সময় বেঁচে থাকব, সেটা নয়। আমার যে চিন্তা ধারা সেটাই তোমাদের বলছি।'

টেলিফোনে শফিউল্লাহকে বললাম, 'ইউ বেটার ট্রাই এন্ড লিভ দ্যাট প্লেস্।' অবশ্য সেও তখন একই কথা ভাবছিল।

ফোন পাওয়ার পর পরই সে পুরো ব্যাটেলিয়ান এবং অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ নিয়ে পালিয়ে গেল। সাথে করে নিয়ে গেল পুরাতন ও অতিরিক্ত গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র। পুরাতন যেগুলো জমা দেবার কথা ছিল সে গুলোও রেখে যায়নি।

আর্মিরা যখন জানল শফিউল্লাহ পালিয়েছে, তখন তারা আমাকে সন্দেহ করল এবং ২৬ তারিখ সন্ধ্যা বেলা বাড়ি থেকে নিয়ে গেল স্টেশন হেডকোয়ার্টারে। নেবার সময় তারা বলল, তোমাকে তো বাসায় রাখা যাবে না, অন্যত্র থাকতে হবে। প্রথমে ভাবলাম হয়ত অফিসার্স মেসে রাখবে কিন্তু পরে দেখলাম মিলিটারি কারাগার 'কোয়ার্টার গার্ড'-এ নিয়ে আটকাল।

এটি ছিল পাঞ্জাব রেজিমেন্টের একটি কোয়ার্টার গার্ড। সাধারণত প্রত্যেক রেজিমেন্টের একটা করে কোয়ার্টার গার্ড থাকে সাধারণ সিপাহীদের জন্য। আমি কর্ণেল, আমাকে রাখার জায়গা ওটা না। তারপরও ওখানে রাখল। বলা যায় তখন থেকেই আমার উপর নির্যাতনের সূত্রপাত।

সেখানে সাধারণ সেনাদের মত আচরণ করা হত আমার উপর। নানাভাবে আমার উপর মানষিক নির্যাতন করা হয়েছে, তবে তখনও দৈহিক কিছু হয়নি। ওখানে কোন দিন সকাল ৭টার নাস্তা ১০ টায়, দুপুরে ১২:৩০ টার খাবার ৩:৩০ টায় দিত, আবার কোনদিন দিতই না। কখনও দিত ঠাণ্ডা চা, শক্ত রুটি।

আট/দশ দিন পর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে কোন এক রাতে হঠাৎ এক সুবেদার এসে বলল, 'আপনি রেডি হন, আমার সাথে যেতে হবে।'

বললাম, 'কোথায় যাব?'

সঠিক কিছু না বলে জানাল, 'নিয়ে যাব আপনাকে।'

আমি আতঙ্কিত হলাম। জানতে চাইলাম 'কোথায় নিয়ে যাবে? কি করবে?'

তারপর জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি আমার উর্দি পরব?

সে বলল, 'না, পোশাক লাগবে না, সাদা পোশাকেই চলবে।'

একটা ব্যাগ ছিল আমার কাছে। যা কাপড় চোপড় ধরে গুছিয়ে নিলাম ব্যাগে।

আমাকে জিপে তুলল। এর পরই আমার দু'হাতে হাত কড়া পরাল এবং পিছন দিকে উল্টো করে বাঁধল। সঙ্গে লাগাল কয়েদীদের মত লম্বা চেইন।

আমাকে নিয়ে গাড়ি এয়ার হেড কোয়ার্টারের দিকে এগুলো। শুনেছিলাম ওখানে মুক্তিবাহিনীর লোকজনকে ধরে নিয়ে গুলি করে হত্যা করা হত। ভাবলাম আমাকেও বোধহয় মারার জন্যই নিয়ে যাচ্ছে। ভয়ে আমার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা যে কি সেটা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানো কোন ব্যক্তিই উপলব্ধি করতে পারবে।

এয়ার হেড কোয়ার্টার-এ ভিতর দিয়ে গাড়ি এয়ার স্ট্রিপ ক্রস করল। এসে দাঁড়াল হ্যাংগারের কাছে। দেখলাম বিরাট বোয়িং দাঁড়ান। হাতে লম্বা চেইন বাঁধা অবস্থায় আমাকে প্লেনে ওঠাচ্ছিল। জিজ্ঞেস করলাম, 'সুবেদার সাহেব আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?;

সে উত্তর দিল, 'আপ জা রাহে হে ওয়েস্ট পাকিস্তান।'

'আমাকে এভাবে চেইন দিয়ে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছ কেন? আমি গরু না ছাগল?'

সে বলল, 'আমার ওপর হুকুম এ রকমই, এভাবেই নিতে হবে।'

পিছমোড়া দিয়ে হাত বাঁধা অবস্থায় আমাকে প্লেনের সিটে বসাল। আমি চিৎকার করে। বললাম, 'ক্যান আই সিট লাইক দিস?'

পাকিস্তান এয়ার লাইন্সের একজন ক্যাপ্টেন এল। সম্ভবতঃ একজন বিদেশী হবে। সে বলল, 'হি ক্যান নট সিট লাইক দিস। ১০/১২ ঘন্টার ফ্লাইট।'

তখন ভারতের উপর দিয়ে প্লেন চলাচল বন্ধ ছিল। যেতে হত কলম্বো ঘুরে।

ক্যাপ্টেনের কথায় আমার হাতটা সামনে এনে দিল, কিন্তু চেইন বাঁধাই থাকল।

আমার মনে হল ওই প্লেনে আমিই প্রথম বাঙালি আর্মি অফিসার যাকে পশ্চিম পাকিস্তান নেয়া হচ্ছে। বাকিরা ছিল পাকিস্তানি যাত্রী। যুদ্ধের কারণে তাদের দেশে পাঠান হচ্ছিল।

১০/১২ ঘন্টার যাত্রায় চেইন বাঁধা অবস্থায় টয়লেটে যেতে হত। বাইরে থেকে সুবেদার অন্য প্রান্ত ধরে রাখত।

করাচী বিমান বন্দরে ওই অবস্থায় নামানো হল। সেখান থেকে মালি ক্যান্টনমেন্ট-এর একটা কোয়ার্টার গার্ডে। সেখানে একজন ক্যাপ্টেন আমাকে রিসিভ করল। আমার চোখে ছিল একটা কালার গ্লাস (লুকিং)। সে আমাকে বলল, 'কর্ণেল, ইউ ক্যান নট উইয়ার এ সান গ্লাস। ইউ হ্যাভ বিন কিলিং আওয়ার পাকিস্তানিয।' বলেই সান গ্লাসটা খুলে নিল। সেই সাথে টাকা পয়সা যা ছিল সবই নিল।

তিন/চারদিন পর একদিন ভোরে রাতে তিনজন অফিসার এসে বলল, 'কর্ণেল ইউ আর গোয়িং উইথ আস; এন্ড উই আর টেকিং ইউ সাম হ্যয়ার এল্‌স।'

আমাকে জীপে তুলল। এবার কিন্তু হ্যান্ড-কাফ লাগাল না। এছাড়া এবার আমাকে এ্যারেস্ট করল অফিসার র‌্যাংকের লোক।

সাধারণত নিয়ম হচ্ছে একজন আর্মিকে এ্যারেস্ট করবে তার সমপর্যায় র‌্যাংকের কেউ। এই প্রথম দেখলাম কর্ণেল হিসাবে আমাকে সমপর্যায় র‌্যাংকের কেউ স্কট করল।

আমার সাথে আরও ২/৩টা জিপ ছিল। পথে থামিয়ে ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ও তাঁর পরিবারকে গাড়িতে তুলল। দেখেই মজুমদারকে আমি চিনতে পারলাম।

প্লেনে করে আমাদের সবাইকে করাচি থেকে লাহোর নেয়া হয়। আমার পরিবার তখনও ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট-এ। লাহোর হয়ে আমাদেরকে নেয়া হল খাড়িয়া ক্যান্টনমেন্ট-এর বাইরে মেইন রোডের পাশে পন্নু নামক জায়গাতে।

রোডস্ এ্যান্ড হাইওয়েজ-এর পুরাতন জীর্ণ এক রেস্ট হাউজে আমাদের রাখা হল। রেস্ট হাউজের চারপাশে ডাবল করে কাঁটাতারের বেড়া— ভিতরে একটা, বাইরে একটা। ছাদের উপরেও কাঁটাতার। সেখানে বসানো হয়েছে মেশিন গান। রেস্ট হাউজের চারপাশে সুসজ্জিত অস্ত্রধারী সৈন্যরা পাহারা দিচ্ছিল। অবস্থা দেখে মনে হল এটা 'প্রিজনার অব ওয়ার ক্যাম্প।'

ওখানে ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ও তাঁর পরিবারকে একটা অংশে রাখা হল। আমার একটা ফ্ল্যাট তো দূরে থাক, রুমই দিল না। থাকতে দেয়া হল ছাদে ওঠা সিড়ির নিচে ছোট্ট একটা কামরায়— সেখানে না আছে ফ্যান, না আছে কোন ফার্নিচার। একটা ছোট দড়ির খাটিয়া আর একটা কম্বল। তখন এপ্রিল মাস, মরুভূমির খাড়িয়া অঞ্চল। প্রচণ্ড গরম, তারপর মশার কামড়। দু/তিন দিন থাকার পর অতিষ্ঠ হয়ে গেলাম। অনেক অনুরোধ করার পর লেঃ কর্ণেল র‍্যাংকের একজন আমাকে একটা মশারি দিল আর ছোট একটা ফ্যান। ওখানে খাওয়া দাওয়া কিছুটা ভাল কিন্তু কোন কিছুই সময়মত দিত না।

একদিন এক কর্ণেলকে জিজ্ঞেস করলাম, বাড়িতে আমার পরিবারের সাথে যোগাযোগ করতে পারব কিনা।

সে বলল, 'হ্যাঁ পারবে।'

আমি চিঠি লিখতাম। কিন্তু সব চিঠি যেত সেন্সর হয়ে। অনেক দেরি করে তারা পোস্ট করত। আমাকে আমার বাড়ির চিঠিও দেয়া হত দেরি করে, প্রায় এক মাস পর। বাড়ি থেকে চিঠি এলে আগে ওরা পড়ত। তারপর আমাকে দিত। আমার ঠিকানা ছিল— জি এস কিউ পাকিস্তান। প্রযত্নে এম আই ডাইরেক্টোরেট, জেনারেল হেড কোয়ার্টার, রাওয়ালপিণ্ডি। খাড়িয়া বা পন্নু এসব কোন কথাই থাকত না। সব চিঠি ইংরেজীতে লিখতে হতো, যাতে ওরা পড়তে পারে।

মাস খানেক থাকার পর প্রশ্ন করার জন্য আমাকে পন্নু থেকে ঝেলাম নেয়া শুরু হল। ঝেলাম ছিল রাওয়ালপিণ্ডি যাওয়ার পথে। সেখানে একটা রেস্ট হাউসে আমাকে ইন্টারোগেশন করা হত।

এক নাগাড়ে দু'দিন/তিন দিন ইন্টারোগেশন চলত। একজন ইন্টারোগেশন করে যাচ্ছে আবার আরেকজন আসছে।

এ সময় রাতভর হাই পাওয়ার বাল্বের নিচে বসিয়ে রাখত সরাসরি মুখে ফোকাস করে। বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করত তারা। এগুলোর মধ্যে ছিল— শেখ সাহেবের সাথে তুমি কিভাবে পরিচিত? তার সাথে কি আলোচনা করেছিলে? জয়দেবপুরে তুমি কি করেছিলে? আওয়ামী লীগের সাথে কতটুকু যোগাযোগ ছিল? — এ ধরনের নানা রকম প্রশ্ন।

আমি কোনটা অস্বীকার করতাম। কোনটা উত্তর দিতাম।

ওখানে যারা প্রশ্ন করত তাদের মধ্যে আমার পুরাতন কলিগ কর্ণেল আবদুল কাইয়ূম আঞ্জুমও ছিল। সে আমার বন্ধু ছিল।

আঞ্জুম আমাকে অনেক প্রলোভন দেখিয়েছিল। বলেছিল, 'মাসুদ তুমি আমার ক্যাডেটমেট ছিলে। আমি তোমাকে ভাল করেই চিনি। তুমি সত্যি বল। আমি তোমাকে মুক্ত করব। তাছাড়া তুমি পূর্ণ কর্ণেল হবে।' সে আরও জানাল, 'কর্ণেল ইয়াসিন তোমার নামে স্টেটমেন্ট দিয়েছে। জয়দেবপুরে তোমার সাথে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মিটিং হয়েছে এবং সেখানে তোমরা পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধীন করার পরিকল্পনা করেছিলে।'

আমি বলেছিলাম, 'তাহলে আমাকে তার মুখোমুখি কর।' ওখানে কিছু না পেয়ে আগস্ট মাসে তারা আমাকে লাহোরে ফোর্টে পাঠিয়ে দিল। আঞ্জুম আগেই জানিয়েছিল লাহোর ফোর্ট-এ কর্ণেল ইয়াসিন রয়েছে এবং এও বলেছিল, 'তোমাকে তার কাছে নেয়া হবে।'

লাহোরে ফোর্টের ভিতর আমাকে স্পেশাল ইন্টারোগেশন সেন্টারের কাছে একটা সেলে রাখল। সেখান থেকে সেন্টারে নিয়ে যেত প্রশ্ন করতে। আবার রেখে যেত। এসময় যাদের চিনেছি ওদের একজনের নাম কর্ণেল সিদ্দিকী, পাঞ্জাবী, অন্যজনের নাম কর্ণেল মোহাম্মদ আনোয়ার, কালো উঁচু লম্বা করে দেখতে। ইন্টারোগেশনের সময় ওরা আমাকে কর্ণেল ইয়াসিনের উদ্ধৃতি দিয়ে নানারকম প্রশ্ন করত।

আমি যথারীতি অস্বীকার করতাম।

সিদ্দিকী আমাকে প্রথম দিন জিজ্ঞেস করল, 'আওয়ামী লীগের সাথে তোমার কতটুকু যোগাযোগ ছিল? শেখ এবং আওয়ামী লীগের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করে তুমি ষড়যন্ত্র করছিলে। তুমি রাজনীতিতে জড়িয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার ষড়যন্ত্র করছিলে।'

আমি সরাসরি অস্বীকার করলাম। বললাম, 'প্রশ্নই ওঠে না। আমি একজন আর্মি অফিসার। আমি আর্মি ডিসিপ্লিন ভঙ্গ করে কখনও রাজনীতি করিনি বা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগও রক্ষা করিনি।'

এ রকম দু/তিন দিন অস্বীকার করার পর একদিন কর্ণেল সিদ্দিকী আমার চুল ধরে টেনে তুলল। কিল, চড় ঘুষি মারল। এক পর্যায়ে আমার পায়ে জ্বলন্ত সিগারেট চেপে ধরল। আমি অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলাম।

সিদ্দিকী ও আনোয়ার এরপর থেকে দু'চারটা ঘুষি, চড় থাপ্পড় মেরে দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। আর অপেক্ষামান সিপাহীরা এসে ইচ্ছামত পেটাতো।

একদিন তারা নুতন ধরনের প্রশ্ন করল আমাকে। বলল, 'তুমি জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে জয়দেবপুর রাজবাড়িতে বর্তমান ও অবসরপ্রাপ্ত আর্মি অফিসারদের নিয়ে পিকনিক করেছ। সেখানে ব্রিগেডিয়ার এম আই মজিদ, কর্ণেল ওসমানী সহ অনেক সিনিয়র অবসরপ্রাপ্ত বাঙালি অফিসারকে সপরিবারে নিমন্ত্রণ করেছিলে। ওই পিকনিকে মহিলারা যখন রান্নাবান্নায় ব্যস্ত, তোমরা তখন মিটিং করেছিলে, দেশ বিভক্তির ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিলে।'

আমি অস্বীকার করলাম।

তারা বলল, 'এ কথা কর্ণেল ইয়াসিন ও ব্রিগেডিয়ার মজুমদার বলেছে। তুমি কেন অস্বীকার করছ?'

আমি বললাম, 'ওদের কাছে আমাকে নিয়ে যাও।'

আমাকে তখন ওরা মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে মারধর শুরু করল। কিল চড় ঘুষির পাশাপাশি আমার নখের মধ্যে সুঁচ ফুটাল। পায়ের গোড়ালি থেকে হাঁটু পর্যন্ত একের পর এক জ্বলন্ত সিগারেট চেপে ধরে নিভাল। এক পর্যায়ে অজ্ঞানও হয়ে গেলাম। জ্ঞান ফিরলে আবার অত্যাচার শুরু করল। এক পর্যায়ে তারা আমার বুকের নিপলে ইলেকট্রিক শক দিল, আমি আবার অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

কয়েকদিন পর ব্রিগেডিয়ার কাদের এসে বললেন, 'গত কয়েক বছর তোমার উপর রিপোর্ট খুব ভাল— খুবই কনফিডেন্সিয়াল। এ বছর ব্রিগেডিয়ার আরবাব যে রিপোর্ট দিয়েছে তাতে তো তোমার কেরিয়ারে ধ্বস নেমেছে। তবে জেনারেল খাদেম হোসেন রাজা আর ইস্টার্ন কমান্ডের জেনারেল ইয়াকুব তোমার সম্পর্কে যে রিপোর্ট দিয়েছে, তা খুবই প্রশংসনীয়। তুমি কেন সত্যি কথা বলছ না? যদি তুমি সত্যি বল আমিই তোমাকে বের করে আনব। তোমাকে পদোন্নতি দিয়ে ব্রিগেডিয়ার বানাব। তুমি কেন এ সুযোগ হাতছাড়া করছ?'

এ ধরনের মিষ্টি প্রলোভন দেখাল, ভোলাতে না পেরে পরপরই শুরু করল নির্যাতন। কর্ণেল সিদ্দিকী আমাকে রাবার জড়ানো লোহার রড দিয়ে পেটাল। রাবার জড়ান ছিল এ জন্য যাতে দাগ না পড়ে। মারতে মারতে আমি প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেলে ফেলে রাখত।

নির্যাতনের ক্ষেত্রে তারা প্রায়ই অভিনব পন্থা বের করত। একদিন তারা বিরক্ত হয়ে আমাকে বরফের স্লাবের উপর ফেলে রাখল। কতক্ষণ আর সহ্য করা যায়। কিছুক্ষণ পর আমি জোরে জোরে চিৎকার করতে থাকলাম। ওরা চার হাত পা ধরে রাখল জোর করে। এক পর্যায়ে আবারও অজ্ঞান হয়ে গেলাম। বহুবার অজ্ঞান হয়েছি এভাবে।

মাঝে মাঝে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তারা পায়ে দড়ি বেঁধে লটকিয়ে রাখত। ওই অবস্থায় পেটাত। নাক দিয়ে রক্ত বেরুত। এক সময় অজ্ঞান হয়ে যেতাম। কতক্ষণ অজ্ঞান থাকতাম জানি না। জ্ঞান ফিরলে দেখতাম নিজের রক্তের উপর নিজেই শুয়ে আছি। একদিন তারা লোহার ডান্ডা লাল টকটকে গরম করে আনল। বলল, 'যা জিজ্ঞেস করব ঠিকমত উত্তর না দিলে তোমার পাছার মধ্য দিয়ে ঢুকিয়ে দেব।'

আমাকে প্রশ্ন করা শুরু করল। সবই অস্বীকার করলাম। ওরা ক্ষেপতে থাকল। এক পর্যায়ে ওই গরম রড আমার পাছায় চেপে ধরল। আমি চেঁচিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলাম। কতক্ষণ সংজ্ঞাহীন ছিলাম জানি না। জ্ঞান ফিরলে দেখলাম পুলিশ হাসপাতাল বিছানায় শুয়ে আছি।

এর মধ্যে একদিন দাঁতের মাড়িতে প্রচণ্ড ব্যথা হল। যন্ত্রণা হচ্ছিল। আমি ওদেরকে বললাম, 'আমি তো দাঁতের যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছি, আমাকে একটু ডেন্টিষ্টের কাছে নিয়ে চল। যেমনি বলা অমনি এসে আমার দাঁতে এমনভাবে ঘুষি মারল যে দাঁতটাই পড়ে

গেল। মুখ দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকত। আসলে ওরা নির্যাতনের ক্ষেত্রে যে বর্বরতা প্রদর্শন করেছে তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

দু' মাস হয়ে গেল। বাড়ি থেকে কোন চিঠিপত্র পাচ্ছি না। একদিন এক ক্যাপ্টেন এসে আমাকে একটি চিঠি দিল। এক মাস আগে এসেছে চিঠিটা। দেখে বোঝা যাচ্ছে এটা ওরা খুলে পড়েছে। চিঠি পড়ে জানতে পারলাম আমার আট বছর বয়সী ছেলেটা নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হয়েছে। ছেলেটা দৈহিকভাবে একটু দুর্বল ছিল কিন্তু মানসিকভাবে ছিল সবল। একে প্রথমে কম্বাইন্ড মিলিটারি হাসপাতালে (সিএমএইচ)-এ ভর্তি করতে নিয়ে গেলেও ওরা ভর্তি করায়নি। আমার পরিবারের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকায় ক্যান্টনমেন্টের বাইরে ভর্তি করানো যাচ্ছিল না। স্বাভাবিক কারণেই সি এম এইচ-এর উপর নির্ভর করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। নয় দিনে ছেলেটার একটা ফুসফুস নষ্ট হয়ে যায়। অন্যটি আক্রান্ত হলে তারপর ভর্তি করান হয়।

নিয়ম অনুযায়ী আর্মি পার্সন বা তাদের পরিবারের কেউ মারাত্মকভাবে অসুস্থ হলে পরিবারের কর্তাকে খবর দেয়, তাকে পাশে থাকার সুযোগ দেয়া হয়। আমার ক্ষেত্রে খবর দিল কিন্তু যেতে দিচ্ছিল না।

ওরা বলল, 'তোমার ছেলে তো খুব অসুস্থ, মৃত্যু শয্যায়, তুমি যদি যেতে চাও, আমাদেরকে বলতে পার।'

বললাম, 'আমি যেতে চাই।'

তখন ওরা বলল, 'তোমাকে শিগগিরই দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে।' এর আগে একদিনের ঘটনা। আমার ছেলে মেয়েদের ছবি পাঠাল দেশ থেকে। ওরা খুলে দেখে বলল, 'তোমার ছেলে মেয়েরা তো খুব সুন্দর, লেখাপড়ায়ও খুব ভাল। কিন্তু ওরা তো এখন আমাদের হাতের তালুর মধ্যে। তুমি যদি স্বীকার না কর তবে ওদের মুঠোর মধ্যে পিষে মেরে ফেলব।'

নির্যাতনের পাশাপাশি এ ধরনের হুমকি তারা প্রায়ই দিত। বার বার অস্বীকার করতে থাকায় একদিন তারা কর্ণেল ইয়াসিন ও ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের স্বাক্ষর দেয়া স্টেটমেন্ট এনে দেখাল। বলল, 'তারা তো সত্যি বলে বের হয়ে যাচ্ছে। তুমি সত্যি বল, বের হতে পারবে।'

এভাবে প্রলোভন দেখাল, বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করল। আমার এ বিধ্বস্ত মানসিক অবস্থার মধ্যে তখন পদোন্নতির প্রলোভন চিন্তা হচ্ছে না। মনে হচ্ছে যদি কোনভাবে বের হয়ে আমার অসুস্থ ছেলেটাকে দেখতে পারি।

অগত্যা আমি বললাম, 'ঠিক আছে, আমিও তোমরা যা বলবে তাই বলব।'

একটা স্টেটমেন্ট টাইপ করে নিয়ে এল। আমি সাইন করলাম। সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে আমাকে লাহোর ফোর্ট থেকে নেয়া হল লায়ালপুর জেলে। ওই সময় জেলের গার্ডরা বলত, 'শেখ মুজিব ও কামাল হোসেন ওই জেলে আছে।'

তারপর শুনলাম ওই জেলের ভিতরেই স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল কোর্ট। জানলাম আমি নিজেও অভিযুক্ত, আমার বিচারও হবে। কোর্টে গিয়ে আমি যদি রাজসাক্ষী দিই তাহলে আমার নিস্তার মিলবে। যা বলেছি স্টেটমেন্ট-এ, সেটা আবার কোর্টে গিয়ে বলতে হবে।

ট্রাইবুন্যালে চেয়ারম্যান ছিলেন ব্রিগেডিয়ার এ রহিম। একজন সিভিলিয়ান বিচারপতি সহ আরও ৩/৪ জন ছিল।

ব্রিগেডিয়ার রহিম ট্রায়ালের সময় আমাকে একটা এ্যালবাম দিলেন। তার থেকে একটা ছবি দেখিয়ে বললেন, 'দেখ তো, এর মধ্যে কাউকে চিন কিনা?'

'চিনতে পারলাম না।'

পরে বললেন, 'আচ্ছা বলতো এ ছবিতে কোনটা মতিয়া চৌধুরী?'

'আমি চিনতে পারলাম না। আসলে আমি তাকে কোনদিন দেখিও নি। চিনতামও না। আমি দেখাতে পারিনি তাদেরকে।' সুতরাং স্টেটমেন্ট-এর অভিযোগ, আওয়ামী লীগের সাথে আমার এত যোগাযোগ ধোপে টেকেনি।

ব্রিগেডিয়ার আরেকটা ছবি বের করলেন। তাতে কয়েকটা বাড়ি। এবার বললেন, 'বল তো, কোনটা শেখ সাহেবের বাড়ি?'

বললাম, 'আমি চিনতে পারছি না।' তখন দেখেছি শেখ সাহেব গালে হাত দিয়ে মুচকি হাসছেন চেয়ারে বসে।

আমাকে কোর্টে পাঁচ মিনিট জেরা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার পর যেতে বললেন।

এর দু'দিন পর আমাকে আনা হল রাওয়ালপিন্ডিতে এক রেস্ট হাউসে। ওই রাতেই আমার পুরাতন এক কলিগ মেজর সারোয়ার বলল, 'স্যার, আপনি সন্ধ্যার ফ্লাইটে দেশে যাচ্ছেন। আপনার ছেলে গুরুতর অসুস্থ।'

অক্টোবরের ৮ তারিখে প্লেনে চড়ে কলম্বো হয়ে ঢাকা পৌঁছলাম। সরোয়ার আমার সাথে এল। হস্তান্তর করল অন্য এক মেজরের হাতে।

আমাকে সরাসরি আমার বাসায় নিয়ে গেল পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা করার জন্য। সেখান থেকে নিয়ে গেল সি এম এইচ-এ আমার ছেলের কাছে। ছেলে তো আমাকে দেখে ভীষণ কান্না!

আধা ঘন্টা থাকার পর মেজর বললেন, 'তোমাকে আমার সাথে যেতে হবে।'

বললাম, 'কোথায়, আমার বাসায়?'

বলল, 'না, বাসা তোমার জন্য নিরাপদ নয়। মুক্তিবাহিনী তোমাকে হত্যা করবে।' 'তোমাকে একটা অফিসার্স মেসে রাখা হবে।'

যাহোক, মেসে নেয়ার আগে প্রথমে আমার বাসায় নিল। দেখলাম, 'বাসায় ঢুকতে পারছি না। আমার ড্রইং রুমে দারোয়ান বসে আছে। গেস্ট রুমে গিয়েও ঢুকতে পারলাম না। শুনলাম এখানে খালেদা জিয়া ও তার ছেলেদের রাখা হয়েছে। অর্থাৎ এক গার্ড দুই ফ্যামিলিকে পাহারা দিচ্ছে।'

আমাকে নিয়ে অর্ডিন্যান্সের একটা গেস্ট রুমে রাখল। অনুমতি নিয়ে সঙ্গে আনলাম সবচে ছোট ছেলেকে। ওর বয়স তখন ৩/৪ বছর। আমার সাথে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল ওর।

ওই অবস্থায় প্রতিদিন পাহারা দিয়ে আমার অসুস্থ ছেলেকে দেখাতে নিয়ে যেত। কয়েকদিন পর দেখলাম আমার লনের উল্টো দিকে এনে রাখা হয়েছে খালেদা জিয়া ও তার ছেলেদের।

এখানে থাকার সময় আমার বাসার ট্রানজিস্টারটা রাখার অনুমতি পেয়েছিলাম। আমার স্ত্রীকে বলেছিলাম পাঠানোর সময় ওটার ব্যাটারী বক্সে আমার ছোট পিস্তলটাও ভরে দিতে। তখন স্বাধীন বাংলা বেতারের খবরে শুনতাম কোথাও কোথাও মুক্তিবাহিনী জয়লাভ করছে। আমার ভেতরও মুক্তির স্বপ্ন বেড়ে উঠছিল। তারপরও যদি এ অবস্থায় আমার উপর শেষ আক্রমণ করে তাহলে আমি অন্তত একজনকে মারতে পারব। আমার ছেলের প্রতিরক্ষার জন্যও এটার দরকার ছিল। এজন্য ওটা এনেছিলাম ট্রানজিস্টারকে কখনও ওরা সন্দেহ করেনি।

এভাবে নভেম্বর মাস প্রায় শেষ। আমার ছেলের অবস্থার আদৌ উন্নতি হল না। প্রতিদিন তাকে অক্সিজেন দিতে হচ্ছে। এ অবস্থার মধ্যে তাকে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র দিল। কারণ প্রতিদিন প্রচুর আহতরা আসছে, লাশ আসছে। জায়গা দিতে পারছে না। এজন্য বাঙালিদের সরিয়ে নিয়ে তারা জায়গা খালি করছে। আমাকে বলল, 'তোমার ছেলেকে অন্য কোথাও চেষ্টা কর।'

আমি বললাম, 'ক্যান্টনমেন্টের ভিতর তো হাসপাতাল নেই। আমাকে তো বাইরে যেতে হবে।'

তারা বলল, 'না, বাইরে যাওয়ার পারমিশান নাই। পারলে বাইরে থেকে ডাক্তার আনাও।'

খুবই মরণাপন্ন অবস্থায় ওকে ছাড়ল। কিন্তু আর চিকিৎসা করাতে পারিনি। ওই অবস্থায় তার দুটি ফুসফুসই নষ্ট হল। শেষ অব্দি আমাদের কোলেই ছেলেটা মারা যায়।

১৪ ডিসেম্বর ক্যান্টনমেন্ট-এ ভারতীয় যুদ্ধ বিমান সাংঘাতিক বম্বিং করল। আমাদের পাশে নিয়াজির হেড কোয়ার্টার ছিল। ওটাই ছিল টার্গেট।

আমাদের অফিস এলাকায় ৭/৮ টা বম্ব পড়েছে, একটা একটা পুকুরের মত গর্ত হয়েছে। কিন্তু আমাদের ঘরটি অলৌকিকভাবে বেঁচে যায়। ছোট ছেলেটাকে বাসাতে পাঠিয়ে দিলাম। একাই থাকলাম ওখানে।

১৬ই ডিসেম্বর খবর শুনলাম পাকিস্তানি সৈন্যরা স্যারেন্ডার করবে আজ বিকালে। সাথে সাথে ফোন করলাম, একটা নম্বরে। যেটা ওরা খুব প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করতে বলেছিল। ওটা ছিল আই এস আই-এর। তাদের বললাম, 'তোমরা তো স্যারেন্ডার করছ, এবার আমাকে ঘরে ফেরার অনুমতি দাও, আমি আমার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করি।'

বলল, 'আমাদের তো অর্ডার নেই। আমরা তো রাওয়ালপিন্ডির সাথে যোগাযোগ করতে পারছি না।'

আমি বললাম, 'ইউ উইল নেভার বিন কনট্যাক্ট উইথ রাওয়ালপিণ্ডি। হাউ ডু ইউ এক্সপেক্ট দ্যাট? বাংলাদেশ অল রেডি বিন এসট্যাবলিষ্ট।

তারপর বললাম, 'আজ বিকেলেই তো স্যারেন্ডার অনুষ্ঠান হচ্ছে। তোমরা কি শোননি?'

বলল, 'শুনেছি কিন্তু তোমার ব্যাপারে আমাদের কিছু করার নেই।' এরপর বলল, 'আমরা স্যারেন্ডার করছি, বন্দী হয়ে যাব। তুমিও আমাদের সাথে বন্দী হবে। আমাদের

অতিথি হবে।'

বললাম, 'তোমরা তো মুক্তিবাহিনীর গেস্ট হচ্ছ এখন।'

আমাকে ছাড়ল না। নিয়ে গেল অর্ডিন্যান্স ওয়ার্কশপে। ওখানে আছে প্রায় দেড় শ' পাকিস্তানি অফিসার। চার ধারে ইণ্ডিয়ান গার্ড।

এ সময় মেজর ইফতেখার নামে একজন পাকিস্তানি আমাকে দেখে বলল, 'স্যার আপনাকে খামোখা আটকে রেখেছে।'

বললাম, 'তাহলে আমার মুক্তির ব্যবস্থা কর।'

আমার গায়ে তখন মোটা দামী জ্যাকেট। ওর গায়ে হালকা সুতি জামা। ইফতেখার বলল, 'আপনি যদি আপনার গায়ের জ্যাকেটটা আমাকে দিয়ে দেন, তাহলে আমি ব্যবস্থা করতে পারি।'

এর কারণ ছিল ও সময় ডিসেম্বর মাসের সাংঘাতিক ঠাণ্ডা।

আমি রাজী হলাম। জ্যাকেটটা ওকে দিয়ে দিলাম। বললাম, 'আরো দু'একটা কিছু দরকার হলে নাও।' ও আমাকে সন্ধ্যার সময় বেরুনোর প্রতিশ্রুতি দিল। সন্ধ্যার আগে ও পথ ঘাট ঘুরে দেখে এল। আমাকে যখন নিয়ে যাচ্ছে তখন পাকিস্তানি গার্ড জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছ?' ইফতেখার সামাল দিল।

বেশ কিছুদূর যাবার পর সে বলল, 'এবার আপনাকে একা যেতে হবে। সামনে ইন্ডিয়ান গার্ড। আপনাকে ওটা ম্যানেজ করতে হবে। আমাকে দেখলে আপনাকে যেতে দেবে না।'

সামনে যেতেই একটা শিখ সৈন্য আমাকে আটকাল, প্রশ্ন করল। বললাম, 'আমি বাঙালি কর্ণেল। আমাকে নয় মাস এখানে আটকে রেখেছিল। অনেক টর্চার করেছে।' তাকে টর্চার চিহ্ন দেখালাম। ও টর্চ দিয়ে দেখল এবং বলল, 'ঠিক হে যাও।'

এভাবে ১৬ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭টার দিকে মুক্তি পেলাম, দীর্ঘ শারীরিক মানসিক যন্ত্রণা থেকে।

আজ আটাশ বছর পরেও যখন পায়ের দিকে তাকাই, পিঠের কাছে হাত দিই, আমি যেন ফিরে যাই ওই বর্বর, নারকীয় ভয়ানক মুহূর্তগুলোতে। আমি শিউরে উঠি বার বার।

সাক্ষাৎকার ঃ রুহুল মতিন

ওরা সিগারেটে টান দিয়ে গলায় চেপে ধরে নেভাত

মাসুদ সাদেক চুল্লু

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে মাসুদ সাদেক চুল্লু ছিলেন দুই নম্বর সেক্টরের গেরিলা স্কোয়াড ক্র্যাক প্ল্যাটুনের দুঃসাহসী মুক্তিযোদ্ধা। ঢাকায় অপারেশন করতে এসে তিনি গ্রেফতার হন ৩০শে আগস্ট। গ্রেফতারের পর তাঁকে আনা হয় ঢাকার কুখ্যাত নির্যাতন কেন্দ্র নাখালপাড়ার এমপি হোস্টেলে। তাঁর উপর শুরু হয় অমানুষিক নির্যাতন। তাঁকে তারা হত্যা করতে পারেনি তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এ এইচ কে সাদেক (বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী) এর কারণে, যিনি তখন ছিলেন পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের নামকরা আমলা। মাসুদ সাদেক চুল্লুর জবানবন্দি ক্যাসেটে ধারণ করা হয় ২০শে সেপ্টেম্বর '৯৯।

১৯৭১-এর ২৯শে আগস্ট, মধ্যরাত। ঢাকার এলিফ্যান্ট রোডের 'টেনামেন্ট হাউসে' বড় ভাই এ এইচ কে সাদেক সাহেবের সরকারী বাসভবনে শুয়ে আছি। তিনি তখন সিভিল সার্ভিসের নামকরা আমলা। আমাদের ১৭/১৮ জনের গেরিলা গ্রুপ, যেটা ২নং সেক্টরের ক্র্যাক প্লাটুন হিসাবে পরিচিত ছিল, ভাইয়ের বাসায় রাত কাটাতাম। সেখানে আর্মস এমিউনেশন জমা রাখতাম। এত অস্ত্র জমা রেখেছিলাম, যা দিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে দিব্যি চার ঘন্টা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া যেত। হঠাৎ মাঝরাতে পাক বাহিনী এসে আমাদের বাসা ঘেরাও করে ফেলল। মেজর কাইয়ূমের নেতত্বে ৪/৫ জনের একটা গ্রুপ দরজায় কড়া নাড়ল। ভাই দরজা খুলে দিলেন।

মেজর জিজ্ঞেস করল, 'স্যার আপনার বাসায় কে কে থাকে?'

'আমার মা, বোন, বউ, বাচ্চা', উত্তর দিলেন ভাই।

'আর কে?' আবার প্রশ্ন মেজরের।

'আমার ছোট ভাই মাসুদ সাদেক।' ভাই বললেন, আমার ডাক নাম এড়িয়ে।

'ওনার কি কোন ডাক নাম আছে?'

'হ্যাঁ, চুল্লু।'

আমি দরজার সাথে লাগোয়া ঘরে শুয়ে সব শুনছিলাম। ভাইয়ার ডাকে বেরিয়ে এলাম। আর্মিরা একে অপরের মুখের দিকে তাকাল। মেজর বলল, 'স্যার, ওনাকে আমরা ঘন্টা খানেকের জন্য থানায় নিয়ে যাব। তারপর পৌঁছে দেব।'

আগেই আমি আশঙ্কা করেছিলাম এ ধরনের পরিস্থিতির। ২৯ তারিখে সকালে আমাদের গেরিলা গ্রুপটির আজিমপুর একটি অপারেশনে যাওয়ার কথা ছিল। এজন্য আমি আমার ধানমণ্ডি ২৮-এর ভাড়া বাসায় গিয়েছিলাম। বাসাটি আমরা ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করতাম। মাটির নিচে পিলারের তলায় অস্ত্র জমা রাখতাম। বাসায় ঢোকার সময় পাশের বাসার বয়স্ক দারোয়ানটি জানাল আমাদের গ্রুপের কয়েকজন গেরিলা ধরা পড়েছে। তাদেরকে এ বাড়িতে আনা হয়েছিল। আমি চমকে গেলাম। কিন্তু বুঝতে পারলাম না কে ধরা পড়েছে। আমাদের গেরিলা গ্রুপটি ৪ জনে ভাগ হয়ে ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গায় থাকতাম। আজ এখানে তো, কাল ওখানে। যে বাসা থেকে বেরুতাম ঐ বাসায় আর ফিরতাম না। ধরা পড়া বা সন্দেহ এড়াতে এটা করতাম। ওই দিন ভাই-এর বাসায় ফিরে জানালে সবাই আমাকে পালাতে বলল। মা, বোন, ভাই-এর পরিবারের কথা চিন্তা করে পালালাম না। প্ল্যান করলাম, ভোর বেলায় আর্মস নিয়ে পালাব। রাতে টেনশনে প্রায় ঘুম হল না। এর মধ্যে চারিদিক পাকিস্তানি আর্মি।

বড় ভাই দারোয়ানকে বললেন গেট খুলে দিতে। মেজর বললেন, 'তার দরকার হবে না। আমার মত ওনারও দেয়াল টপকানোর অভ্যাস আছে।' উপলব্ধি করলাম মেজর কি বোঝাতে চেয়েছে। অপেক্ষা করতে থাকলাম ভয়ংকর কোন অবস্থার জন্য। গাড়িতে তুলেই ওরা আমার চোখ বেঁধে ফেলল। হাত দু'টো ঘুরিয়ে পিছন দিকে বাঁধল। গাড়ি কোন পথে কিভাবে চলল বুঝতে পারলাম না।

প্রায় আধাঘন্টা চলার পর থামল এমপি হোস্টেলে এসে। গাড়ি পথে কয়েক জায়গায় থেমেছে। ফিস ফিস করে কথা বলেছে। আমাকে জিপে বসিয়ে রেখে তারা মেজর ডালিমের বাসা ঘেরাও দিয়েছে তার ছোট ভাই স্বপনকে ধরার জন্য। স্বপন ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে প্রাণে রক্ষা পেয়েছিল।

ওরা আমাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে হাঁটিয়ে একটা ঘরের মধ্যে নিল। একজন সিপাহী চোখ খুলে দিল। অন্ধাকারাচ্ছন্ন ঘরটি বড় জোর দশ ফিট বাই দশ ফিট হবে। ফিল্ড ইন্টারোগেশন ইউনিটের কর্ণেল হেজাজী কড়া ভাষায় জিজ্ঞেস করল— 'নাম কি?' উত্তর দিলাম।

হেজাজী গালাগালি করে বলে উঠল— 'মুসলমান কা বাচ্চা মুসলমান কো মারতা হ্যায়।' বলল, 'তুমি আমার ভাইকে মেরেছো কুমিল্লাতে।' লাফিয়ে উঠে সে লাথি মারল আমার মুখে।

বুটের আঘাতে মনে হল আমার চোয়াল ভেঙে গেছে, দাঁতগুলো খসে পড়েছে। এরপর ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করল— 'এ পর্যন্ত কত জন পাকিস্তানি মেরেছো? কোথায় কোথায় অপারেশন করেছ?'

উত্তর দিলাম, 'আপনি কি বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

হেজাজী ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, 'একটু পরে সব কিছু বুঝবে।' হাবিলদারকে নির্দেশ

দিল— 'সফিনগুল, ইসকো ঝুলাও।'

আমাকে সিলিং ফ্যানের আংটার সাথে ঝোলাল। পায়ের আঙুল মাটি ছুঁই ছুঁই করে। হেজাজী নিজেই আমাকে মুখে চোখে, শরীরের কিল ঘুষি মারল কিছুক্ষণ। সে সরে দাঁড়ানোর পর হাবিলদার সফিনগুল ও আরো ৪ জনের একটি দল আমাকে বর্বরভাবে পেটাতে থাকল। সফিনগুল ছিল এমপি হোস্টেল নির্যাতন সেলের সবচেয়ে ভয়ংকর শয়তান। এ সময় নির্যাতন ও জিজ্ঞাসা একই সঙ্গে চলেছে।.জিজ্ঞেস করছে— 'অস্ত্র কোথায়?'

কাতরাতে কাতরাতে উত্তর দিলাম 'আমি কিছু জানি না'।

যত অস্বীকার করি মারের তীব্রতা তত বেড়ে যায়। এক সময় বেহুঁশ হয়ে গেলাম। কতক্ষণ সংজ্ঞাহীন ছিলাম বলতে পারব না। এক সময় আমাকে নামান হল। একটা চেয়ারে বসিয়ে মুখের উপর সার্চ লাইট ফেলল। সামনের দিকে একটা জানালা খোলার শব্দ হল। হেজাজী এগিয়ে গেল। ফিসফিসিয়ে কি জানি জিজ্ঞেস করল। একটা শব্দ ভেসে এল, 'হ্যাঁ, ইয়ে তো চুল্লু হ্যায়।' ভয়ংকর মনে হল শব্দগুলো।

হেজাজী বলল, 'তুমিই তাহলে ঢাকা শহরের কমাণ্ডার। তুমি ওদের চিনতে পারোনি কিন্তু ওরা তোমাকে চিনেছে। বলো অস্ত্র কোথায়?'

অস্বীকার করলাম। ভয়ংকর গর্জন করে উঠল হেজাজী। অর্ডার দিল টর্চার করার। আমাকে আবার ঝোলানো হল। পিটাল ইচ্ছেমত। অজ্ঞান হয়ে গেলাম। হুঁশ ফেরার পর দেখলাম বিকাল হয়ে গেছে। অর্থাৎ ৩০ তারিখ বিকাল বেলা। ঝুলন্ত অবস্থায় বুঝতে পারলাম, আমার পরনের সাদা শার্ট ও কালো প্যান্ট রক্তে ভিজে শক্ত হয়ে লেপ্টে আছে শরীরের সাথে। আমি চোখ খোলার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। বুঝতে পারছি না, আমি জীবিত, না মৃত। পা দুটো ভারী হয়ে আছে। উঁচু করতে পারলাম না। মাথা উঁচু করে তোলার ইচ্ছে হল। ব্যর্থ হলাম। অনুভব করলাম ভীষণ তৃষ্ণা পেয়েছে। অস্ফুট স্বরে পানি চাইলাম।

ওরা পানি দিল না। হাত দুটোতে তখন অসহ্য যন্ত্রণা। টর্চার চেম্বারের আর্মিরা মনে করল আমি বোধহয় মারা যাচ্ছি। একজন আমাকে নামাতে বলল। সাথে সাথে আমাকে নামানো হল। তখন মাগরিবের আযান পড়েছে। শুয়ে শুয়ে দেখলাম সামনের লম্বা বারান্দায় লাইন ধরে সবাই নামাজে দাঁড়িয়েছে। সামনে সবুজ মাঠ। একটু পরে তারা সবাই ফিরে এল। এবার আমাকে ঝোলানো হল দেয়ালের সাথে আটকানো ক্ল্যাম্প-এর সাথে। জিজ্ঞেস করল— 'বাতা দো আর্মস কাহা?'

'আমি জানি না।' বলার সাথে সাথে সফিনগুল আমার পেটে সজোরে ঘুষি মারল। বেত দিয়ে উপর্যুপরি পেটাল। এরপর ৪ জন বাঁশের বা লোহার রডের দুই প্রান্ত ধরে আমার উরু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত চাপ দিল দেয়ালের গায়ে চেপে। তীব্র যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে অজ্ঞান হয়ে গেলাম। ঘোরের মধ্যে বললাম, 'আমাকে ছেড়ে দাও আমি বলব।'

ছাড়ার পর বললাম, 'আমি কিছু জানি না।' আবার আটকানো হলো ক্লাম্পে। একইভাবে প্রশ্ন, নির্যাতন। একসময় আবার অজ্ঞান হয়ে গেলাম। এর আগে আমার

মনে হয় ঘোরের মধ্যে কিছু কিছু বাড়ির নাম বলেছি। যেখানে কোন এক সময় আমরা আর্মস রাখতাম। এটা বুঝেছি পরে। তবে আমি আসল জায়গার নাম কখনও বলিনি— যদি বলতাম হয়ত তারা আমার মা, ভাই সবাইকে মেরে ফেলত। অস্ত্র উদ্ধার করত। প্রায়ই তারা আমার কথা মত অপারেশন করে এসে বলত, 'তুমি মিথ্যা বলেছ।'

পরদিন নিজেকে আবিষ্কার করলাম একটা বাথরুমের মধ্যে। দু'পায়ে অসহ্য ব্যথা, ফুলে গেছে। চামড়া উঠে গেছে হাড়ের গায়ে চাপ লেগে। বাইরে রোদ তেতে উঠেছে। আমাকে আবার পাঠানো হলো কর্ণেল হেজাজীর কাছে, ইন্টারোগেশনের জন্য। আবারও একই প্রশ্ন। অস্বীকার করলাম সবকিছু, ঠিক আগের মতই। সফিনগুলের কাছে হস্তান্তরের সময় নির্যাতনের মাত্রা তীব্র করার নির্দেশ দিল।

আমাকে সফিনগুল সেই দশ ফুট বাই দশ ফুট অন্ধকার রুমটিতে নিল। উপুড় করে শুইয়ে কয়েকজন সেনা পিঠের উপর বসল। আর দু'জন পা ধরে উল্টে ধনুকের মত করে চাপ দিল। মনে হল পেটের চামড়া ছিঁড়ে নাড়ি ভুড়ি বেরিয়ে আসবে। কিছুক্ষণ এ অবস্থায় প্রশ্ন করার পর ছেড়ে দিল। তারপর দু'হাত প্রসারিত করে আটকাল জানালার সাথে। এ টর্চার সেলটিতে দেয়ালের গায়ে, জানালার গায়ে, ছাদের সাথে ক্লাম্প বসানো। নির্যাতনের জন্য সব ব্যবস্থাই করা আছে। জানালার সামনে বিশাল উঁচু দেয়াল। এর ফাঁক দিয়ে বলতে গেলে এতটুকু আলো ঢুকতে পারত না।

ওরা সিগারেটে টান দিয়ে আমার গলায় চেপে ধরে নেভাত। যন্ত্রণায় আমি চিৎকার করতে থাকতাম। গলা থেকে হাটুর নিচ পর্যন্ত এ বর্বর নির্যাতন চলত। এক সময় নরপশুরা আমার রেকটামে জলন্ত সিগারেট চেপে ধরল। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেলাম। কখন যে হুঁশ হারালাম বলতে পারব না। কত ঘন্টা, কত মিনিট, কত সেকেণ্ড বেহুশ ছিলাম জানি না। এও জানি না তখন আমি জীবিত, মৃত, না তার মাঝামাঝি কোন অবস্থায়। হুঁশ ফিরলে দেখতাম মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়ে আছি।

তারা আমার রেকটামে বরফ ঢুকিয়েও কথা আদায়ের চেষ্টা করেছে। প্রতিদিন নতুন নতুন কায়দায় অত্যাচার করেছে আমার উপর। প্রথম ৫/৬ দিন নির্যাতনের পর আমি চোখে ঠিক মত দেখতাম না। শুধু কথা শুনতাম। এর মধ্যে একদিন এমপি হোস্টেলের এক সেলে দেখা হল মুক্তিযোদ্ধা এস্‌ফির বাবার সাথে। বর্বররা এ বয়স্ক নিরীহ লোকটাকে ধরে এনেছে। আমাকে দেখে উনি চমকে গেলেন। বললেন, 'বাবা, তুই কিছু স্বীকার করিসনে। ওরা আর্মস পেয়ে যাবে। আমাদের এ যুদ্ধ অসমাপ্ত থেকে যাবে। তুই তো জানিস একদিন না একদিন তোকে মরতে হবে।'

আমি বললাম, 'চাচা আমি তো আর পারছি না।' আমি আজও অবাক হয়ে যাই কিভাবে সেদিনের অত্যাচার সহ্য করেছি। অত্যাচারের সময় মা, ভাই, বোনের নিরাপত্তার কথা চিন্তা হতো বলেই হয়তো বলিনি।

তখন প্রতিদিনের রুটিন ছিল সিলিং ফ্যানের সাথে ঝুলিয়ে, দেয়ালের ক্ল্যাম্পে আটকে নির্যাতন ও ইন্টারোগেশন। একদিন এফইউসি-এর একজন ক্যাপ্টেন এসে আমাকে শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আমাকে বলো আর্মস কোথায় লুকিয়ে রেখেছো। আমি তোমাকে ছেড়ে দেবো।'

বুঝলাম আমাকে ব্লাফ দেয়া হচ্ছে। প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় আমাকে নামানো হল ঝুলানো থেকে। অন্ধকার ঘরটাতে নিঃসঙ্গ অবস্থায় পড়ে থাকলাম। আমার পাশে কাকে নির্যাতন করছে দেখতে পারতাম না। শুধু গোঙানি আর চিৎকার শুনতাম। প্রথম দু'তিন দিন আমি বলতে গেলে বুঝতেই পারিনি কখন রাত হচ্ছে কখন দিন হচ্ছে। ভোরের অন্ধকার থাকতে নির্যাতন সেলে আনা হতো আর অনেক রাতে ফেরত নিয়ে যেতো রমনা থানায় থাকার জন্য।

প্রায় এক সপ্তাহ উপর্যুপরি অত্যাচারের পর যখন আমার কাছ থেকে কোন কথা বের করতে পারল না, তখন সহযোদ্ধা বদিউল আলম বদিকে আমার সামনে আনা হল। সিপাহিটি বলল, 'বদি বলেছে তোমার কাছে অস্ত্র আছে।'

বদির মুখ ফুলে ছিল। কী বিভৎস চেহারা হয়েছে ওর! দেখে চেনা যায় না। চোখের ভাষায় বুঝলাম নিরুপায় হয়ে বলেছে। বদি আর আমাকে শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলে রাখা হল করিডোরের মধ্যে। সে আমাকে শোনাল তার ধরা পড়া ও নির্যাতনের ভয়ঙ্কর কাহিনী। এ সময় তার কথাগুলো জড়িয়ে আসছিল। সে বলল, এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করবে, প্রতিশোধ নেবে অথবা মরবে। সে আমাকেও পালানোর জন্য প্রস্তুত হতে বলল।

কিন্তু আমার তখন দৌড়ানোর অবস্থা বা শক্তি কোনটাই নেই। অত্যাচারে হাঁটুর হাড় ভেঙে গেছে। দাঁড়িয়ে হাঁটতে পারতাম না। হামাগুড়ি দিয়ে চলতাম। সে অবস্থায় বদির এ পরিকল্পনা বিস্মিত করল আমাকে। আমাদেরকে যখন অন্য রুমে নিচ্ছিল সে সময় হঠাৎ বদি ঝাঁপিয়ে পড়ল এক সিপাইয়ের উপর। স্টেনগান ছিনিয়ে নিয়ে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করল।

আমি উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। সাথে সাথে চারদিকে থেকে সিপাহিরা দৌড়ে গিয়ে ঘিরে ফেলল। প্রচণ্ডভাবে কিল, ঘুষি, লাথি মারা শুরু করল। বদির নাক, মুখ দিয়ে দরদর করে রক্ত ঝরতে লাগল। এক সময় দেখলাম বদির দু'হাত ঝুলে গেছে। দু'জন অজ্ঞান হয়ে গেলাম। দু'দিন পর বদিকে কোথায় যেন নিয়ে গেল। তারপর আর দেখা হয়নি বদির সাথে। পালানোর অপরাধে আমাকেও কয়েকদিন হাত পা বেঁধে ফেলে রাখল নিঃসঙ্গভাবে। আমি জীবিত না মৃত, দিন বা রাত কিছুই বুঝতাম না। কোন একসময় দুর্গন্ধ খাবার ও টিনের কৌটায় পানি দিয়ে যেত।

সেপ্টেম্বর মাসের ১০ কি ১১ তারিখের দিকে আমাকে হুমকি দেয়া শুরু হল গেরিলা কিম্বা অস্ত্র কোনটার সন্ধান না দিলে তোমাকে ফাঁসি দেয়া হবে। আমি মৃত্যুর জন্য প্রহর গুনতে শুরু করলাম। এ সময় নির্যাতনে আমার চেহারা বিভৎস হয়ে গিয়েছিল। কোন কোন সেপাই এসে খবর দিত আজ কত জন মারা হয়েছে, ফাঁসি দেয়া হয়েছে। এসব করত, আমাকে ভয় দেখাবার জন্য। বলতো, 'শিগগিরই তোমার বিচার শুরু হবে।'

আমার বড় ভাই এর মধ্যে অনেক দেন-দরবার করেছেন আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য। শেষে একদিন তিনি এলেন এমপি হোস্টেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে। শিউরে উঠলেন আমার চেহারা দেখে। নাক, মুখ ফুলে বিভৎস চেহারা হয়েছে। দাঁতের মাড়ি ফুলে প্রায় বাইরে চলে এসেছে। আমি চোখে তখন খুব কম দেখতাম। চোখ ফুলে প্রায়

বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ভাই-এর কাছে শুনেছি আমাকে ধরার পর তাকেও আর্মিরা ইন্টারোগেশনের জন্য ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ঘন্টার পর ঘন্টা আটকে রেখে প্রশ্ন করেছে, আমাদের গেরিলা গ্রুপ সম্পর্কে। বলেছে— 'আপনার বাসায় প্রতিরাতে এতজন করে যুবক ছেলে যাতায়াত করতো আর আপনি কিছুই জানেন না?'

এ সময় শুনেছি অন্যান্য সিএসপি অফিসাররা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট-এর কাছে প্রতিবাদ করেছে বার বার। বলেছে এখানকার জেনারেলরা সিএসপি সদস্যদের ক্ষেপিয়ে তুলছে।

সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় আব্দুস সামাদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক আহসানুল হক-এর সাথে আমাকেও শেরে বাংলা নগর এমপি হোস্টেলের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে থেকে রমনা থানা সেলে স্থানান্তরিত করা হল। সেখান থেকে প্রতিদিন এমপি হোস্টেলে নেয়া হত ইন্টারোগেশনের জন্য।

দেড় মাস এ অবস্থা চলার পর নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে নেয়া হল ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে। প্রথম কয়েকদিন রাখা হল ফাঁসির পরোয়ানা পাওয়া আসামীদের কনডেমনড সেল-এ। এরপর নিঃসঙ্গভাবে রাখা হল এর উল্টো দিকের একটি কক্ষে। সেন্ট্রাল জেলে আনার আগে পর্যন্ত আমি একই ড্রেসে ছিলাম। রক্ত শুকিয়ে শক্ত হয়ে গিয়েছিল পোশাকগুলো। নির্যাতনের সময় কখন প্রসাব, পায়খানা করেছি টের পাইনি। সেগুলোও শুকিয়েছে ওর সাথে। সমস্ত শরীরে সিগারেটের আগুন আর নির্যাতনের ক্ষত। জেলে আনার পর পাল্টানো হল ও পোশাক। তখন পরতে হল কয়েদির পোশাক। জেলে আসার পর আর বলতে গেলে নির্যাতন করেনি। তবে অনেকের অত্যাচারিত হবার চিৎকার শুনতাম। প্রতিদিন শুনতাম কতজনকে মারা হয়েছে এসব খবর। কখনও সিপাহী, কখনও কয়েদীরা কখনও বা জেল পুলিশ জানাতো খবরগুলো। জেল সুপার শামসুর রহমান সে সময় আমার প্রতি ছিলেন খুব সহানুভূতিশীল।

একদিন রাতে কয়েক সিপাহী এসে সাদা কাগজে সই নিয়ে গেল। নভেম্বরের ৭/৮ তারিখের দিকে আমাকে চার্জশিট দেয়া হল। অপরাধগুলো ছিল— গেরিলা গ্রুপকে নেতৃত্ব দেয়া, অবৈধ অস্ত্র জমা রাখা, সরবরাহ করা, বিভিন্ন স্থানে বোমা হামলা, নিরীহ পাকিস্তানি সামরিক ও বেসামরিক লোককে হত্যা সহ আরো বেশ কিছু। এরই মধ্যে একদিন সকালে এক সিপাহী খবর দিল তোমার সেলের উল্টো দিকে মাঠের মধ্যে আজ ফাঁসি দেয়া হবে দু'জনকে। দু'জনই তৎকালীন পিআই-এর কর্মচারী। এপ্রিল মাসে গুলিস্তানে একজন পাক মিলিশিয়াকে হত্যার অভিযোগ তাদের বন্দী করা হয়। এদের দু'জনের ফাঁসির সমস্ত আয়োজনই হয় আমার চোখের সামনে। আমার সেলে দেয়ালের উপরে লোহার গ্রিল দিয়ে সব দেখা যাচ্ছিল। মৃত্যুর সময় তারা শরবিদ্ধ সিংহের মত চিৎকার করল।

প্রতিদিন খবর পেতাম প্রহসনমূলক বিচারের রায় বেরুচ্ছে, মৃত্যুদণ্ড দেয়া হচ্ছে। নভেম্বরের ২২/২৩ তারিখে শুরু হল আমার বিচার। আমি অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বসে রায় পাবার জন্য প্রহর গুনতাম। শুনতাম কাল আমার রায় হবে কিন্তু আবার পিছিয়ে যেত। ট্রায়ালের সময় ভাই এসে আমাকে দেখে গেলেন। এভাবে ডিসেম্বর মাস চলে এল। তিন

তারিখ ভারতীয় সৈন্যরা আক্রমণ শুরু করল। বিচার স্থগিত হল। তখনও শুনছি সেন্ট্রাল জেল থেকে আমাদেরকে ক্যান্টনমেন্ট-এ নিয়ে গুলি করা হবে।

তিন তারিখের পর প্রতিদিন কারো না কারো মুখে শুনতাম আজ মুক্তিযোদ্ধা এবং ভারতীয় সৈন্যরা পাকিস্তানি আর্মিদের এখানে হারিয়েছে, ওখানে হারিয়েছে। আমার মধ্যে বাঁচার স্বপ্ন সঞ্চারিত হল। আমার দলের গেরিলারা তখনও জানতো না আমি মরে গেছি, না বেঁচে আছি। ১৬ তারিখ দেশ স্বাধীন হল। ১৭ তারিখ ভোর বেলা আমার সহযোদ্ধা ক্রাক প্লাটুনের গেরিলা আলম, জিয়া, মায়া, আকাশে অনবরত গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে আমাকে নিতে এল। জেলার তখনও বলছে, সরকারী নির্দেশ ছাড়া মুক্তি দেয়া যাবে না।

জেলারের কথা শুনে ওরা যখন মারমুখি হয়ে উঠল, তখন তিনি অনুমতি দিলেন। বাইরে বেরিয়ে দেখলাম জেল গেটে হাজার হাজার মানুষ। উদ্বিগ্ন স্বজনরা খুঁজছে আপন জনকে। আকাশে বাতাসে মুহুর্মুহু গুলি। বিজয়ের উল্লাস।

সাক্ষাৎকার ঃ রুহুল মতিন

অনেক মৃত্যু দেখেছি, নারী নির্যাতনের কথা শুনেছি কিন্তু কখনও ভাবিনি আমি তার শিকার হব

ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী

বাংলাদেশের বিশিষ্ট ভাস্কর ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী, যিনি মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস খুলনায় ক্রিসেন্ট জুট মিলে কর্মরত অবস্থায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের হাতে কার্যতঃ বন্দি ছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন হানাদার বাহিনীর বর্বর নির্যাতন, গণহত্যা এবং ধ্বংসযজ্ঞ। তিনি দেখেছেন জুট মিলে গিলোটিনের মতো পাট কাটার মেশিনের ব্লেডের নিচে ফেলে কিভাবে বাঙালিদের দেহ দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে। প্রিয়ভাষিণী নিজেও শিকার হয়েছিলেন পৈশাচিক নির্যাতনের। ২৫ সেপ্টেম্বর '৯৯ থেকে ২ নবেম্বর '৯৯ পর্যন্ত সাত দফায় তাঁর জবানবন্দি ধারণ করা হয়েছে।

আমি ফেরদৌসী বেগম। ছোটবেলায় আমার মাতামহ আব্দুল হাকিম, যিনি এক সময় পূর্ব পাকিস্তান গণপরিষদের স্পীকার ছিলেন, আদর করে আমার নাম রেখেছিলেন প্রিয়ভাষিণী। আমি একাত্তরের আড়াই লক্ষ ধর্ষিতা নারীর একজন।

আজ আটাশ বছর পর আমার জীবনের সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলোর কথা আপনাদের বলছি এ জন্য যে, একাত্তরে যারা এদেশে তিরিশ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা করেছে, আড়াই লক্ষ নারীকে ধর্ষণ করেছে, আজও তাদের বিচার হয়নি। আজকের প্রজন্ম ভুলে যেতে বসেছে একাত্তরে কী ভয়ঙ্কর দুঃসময়ের মুখোমুখি আমাদের প্রতিনিয়ত লড়তে হয়েছে। আজ সেই দুঃসময়ের কথা এ কারণেও বলতে চাই— অন্য সব নির্যাতনের কথা বিস্তারিত বলা হলেও নারী নির্যাতনের কথা আমরা খুবই কমই জানি। এর প্রধান কারণ সমাজ ও পরিবারের রক্ষণশীল বৈরি পরিবেশ। আমি আশা করব আমার এই জবানবন্দি অন্য সব নির্যাতিত নারীদের সোচ্চার হতে সাহায্য করবে।

আপনারা একাত্তরের নারী নির্যাতনের কথা 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের

দলিলপত্রে'র অষ্টম খণ্ডে পড়েছেন। অধ্যাপিকা নীলিমা ইব্রাহিম নাম না বলে কয়েকজন বীরাঙ্গনার কথা তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেছেন। কয়েক বছর আগে শহীদ জননী জাহানারা ইমাম ও তাঁর সহযোদ্ধারা যখন গণআদালতে গোলাম আযমের বিচার করেন তখন কুষ্টিয়া থেকে সাহস করে তিনজন বীরাঙ্গনা এসেছিলেন সাক্ষ্য দেয়ার জন্য। পরে তাঁরা গ্রামে গিয়ে কী লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার শিকার হয়েছিলেন তাও আমি জানি।

নীলিমা ইব্রাহিম তাঁর অসাধারণ গ্রন্থ 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি'তে লিখেছেন কিভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশের সমাজ তাঁদের অবদান অস্বীকার করেছে। শুধু সমাজ নয়, এই বীরাঙ্গনাদের পরিবারও তাঁদের গ্রহণ করতে রাজী হয়নি। অস্বীকার করেছে পিতা, অস্বীকার করেছে স্বামী। সমাজ ও পরিবারের লাঞ্ছনা গঞ্জনার হাত থেকে বাঁচার জন্য কয়েকজন বীরাঙ্গনা বর্বর পাকিস্তানী সৈন্যদের সঙ্গে পাকিস্তানে চলে যাওয়া শ্রেয় মনে করেছেন, যদিও তাঁরা জানতেন সেখানে তাঁদের পরিণতি কী হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বীরাঙ্গনাদের সম্মানের সঙ্গে পুনর্বাসিত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেননি। মাঝে মাঝে ভাবি একাত্তরে পাকিস্তানি সৈন্যদের যে নৃশংস পাশবিক চেহারা দেখেছি, আমাদের সমাজেও কি তাদের প্রতিচ্ছায়া নেই? আমাকে যারা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছিল তারা এদেশেরই মানুষ। একাত্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক বীরত্বের কথা শুনেছি। দেশ হানাদার মুক্ত হওয়ার পর সেই বীরত্ব দেখিনি। তাঁরা কেউ কথিত বীরাঙ্গনাদের পাশে এসে দাঁড়াননি। একাত্তরে যখন নারীরা পাকিস্তানিদের দ্বারা নির্যাতিতা হচ্ছিলেন, তখন তাদের পিতা, স্বামী, ভাই কিংবা পরিবারের অন্য পুরুষ সদস্যরা পালিয়ে গিয়েছেন অথবা হানাদার বাহিনীর হাতে জীবন দিয়েছেন। পালিয়ে যাওয়ার পথ জানা ছিল না, কিংবা রক্ষা করার মতো কেউ ছিল না বলেই তখন এত বেশি নারী পাকিস্তানিদের নৃশংস নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন।

একাত্তরের কথা বলার আগে আমার আগের জীবন সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। পিতৃকূল এবং মাতৃকূল উভয় দিক থেকে আমি ছিলাম অত্যন্ত বনেদি ও অভিজাত পরিবারের সন্তান। তবে এই আভিজাত্য ছিল অন্তসারশূন্য। আভিজাত্যের খোলস অহঙ্কার ছিল ষোলআনা, অথচ অর্থের রসদ ছিল না। আমি ছিলাম আমার পিতামাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান। আট ভাইবোন আমরা। আমার বয়স যখন পনের তখন আমার পিতামাতার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। যার কারণে ম্যাট্রিক পরীক্ষার পরই পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য আমাকে চাকরি নিতে হয়।

বাষট্টি সালে আমার বিয়ে হয় ইঞ্জিনিয়ারিং-এ অধ্যয়নরত একজনের সঙ্গে। অবস্থা তখন এমনই দাঁড়িয়েছিল যে, ছোট ভাইবোনদের পাশাপাশি স্বামীর পড়াশোনার ব্যয়ও আমাকে বহন করতে হয়েছে। চাকরি করার পাশাপাশি আমাকেও পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হয়েছে, তবে স্নাতক উত্তীর্ণ হওয়ার পর তা আর সম্ভব হয়নি।

আটষট্টি সালে আমার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে, যখন আমি তিন পুত্র সন্তানের জননী। আমার ছেলেরা খুলনায় দাদির কাছে থাকত। আমি তখন ক্রিসেন্ট জুট মিলে চাকরি করি। মা আর ছোট ভাইবোনদের সঙ্গে খুলনার খালিশপুরে থাকি।

এই সময়ে আমাদের অসহায় পরিবারটির প্রতি সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন আমার এক উর্ধ্বতন সহকর্মী, যাঁর নাম আহসানউল্লাহ আহমেদ।

আমি কখনও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলাম না। তবে পারিবারিক পরিমণ্ডলে ছিল উদার সাংস্কৃতিক পরিবেশ। আমার পিতা প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরীর নৃত্যদলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁর সঙ্গে ইউরোপের বহু দেশ ঘুরেছেন। আমার মা ওস্তাদ মুনসী রইসউদ্দিনের কাছে গান শিখেছিলেন। আমার মামা সদ্যপ্রয়াত নাজিম মাহমুদ এদেশের একজন অগ্রগণ্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। মূলতঃ তাঁর কারণেই খুলনার সন্দীপনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। নাচ, গান সবই শিখেছিলাম উত্তরাধিকার সূত্রে।

একাত্তরের প্রথম দিকে রাজনৈতিক পরিস্থিতি যখন খুব অনিশ্চিত, তখন আহসানউল্লাহর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হয়। আহসানউল্লাহর পরিবার তিন সন্তানের জননীকে বাড়ির বউ হিসেবে মেনে নিতে রাজী ছিল না। আমি নিজেও সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভেবে এবং আগের বিয়ের তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে এ বিয়েতে প্রথমে রাজী ছিলাম না। আহসানউল্লাহ আমাকে রাজী করাতে না পেরে আমার মামা নাজিম মাহমুদের দ্বারস্থ হন। পরে মামার কথায় আমি এ বিয়েতে সম্মত হই।

বাংলাদেশের অন্য সব জনপদের মতো একাত্তরের মার্চে খুলনার খালিশপুরও ছিল ঘটনাবহুল ও উত্তপ্ত। সংঘর্ষ চলছিল বাঙালি-বিহারীদের মধ্যে। অবস্থা খারাপ দেখে ২০ তারিখেই আমাদের বেতন দেয়া হল। আমাদের সবার জন্য এটা ছিল অত্যন্ত আনন্দের দিন। মা আর সাত ভাইবোন ছাড়াও আমার তিন সন্তানের ভরণপোষণের ভার মূলতঃ আমার কাঁধের ওপর। সারা মাস অপেক্ষা করতাম বেতনের দিনটির জন্য।

২৪ তারিখে অফিসে গেলাম, কিন্তু ফিরে এলাম তাড়াতাড়ি। শহরে বাঙালি-বিহারী দাঙ্গা বেঁধেছে। কয়েকটি বাঙালি বাড়িতে আগুনও দিয়েছে বিহারীরা। ইপিআর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্)-এর মধ্যেও অসহযোগিতা শুরু হয়েছে। পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেবে সেটা তখন নির্ভর করছিল ২৫ মার্চ ইয়াহিয়ার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর বৈঠকের উপর। বয়সের কারণে হোক বা অন্য যে কারণে হোক, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, বা আমি কি করব। সাধারণত হরতাল হয়, মিটিঙ-মিছিল হয়, দাঙ্গা-হাঙ্গামাও হয়, তারপর আবার সব স্বাভাবিক হয়ে যায়—বিষয়টি ওরকমই মনে হচ্ছিল আমার। মনে হচ্ছিল বঙ্গবন্ধুর দাবি মেনে নেয়া হবে, সব কিছু আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে। তারপরও অফিসের সবার ভেতর উদ্বেগ লক্ষ্য করেছি। সেই উদ্বেগ আমার ভেতরও সঞ্চারিত হচ্ছিল। ভয় ছিল যদি কোন কারণে অনেক দিন অফিস বন্ধ থাকে তাহলে বেতন পাব না। নিজের সন্তান ও ভাইবোনদের নিয়ে অনাহারে দিন কাটাতে হবে।

পরদিন অফিস করলাম না। ইপিআর রাস্তায় নামল। আমাদের বাসায় এসে পানি চাইল ওদের একটা দল। জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা বিহারী, না বাঙালি?'

কী উত্তর দেব বুঝতে পারলাম না। কিছুক্ষণ পর বললাম, 'বাঙালি।'

ওরা বলল, 'তাহলে আমাদের কিছু খেতে দিন।' তারপর আমাদের সতর্ক করে দিল, 'পরিস্থিতি বিশেষ ভাল মনে হচ্ছে না। মনে হয় না আলোচনা ফলপ্রসু হবে।

আপনারা কেউ এখান থেকে যাবেন না।'

২৬ তারিখে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল। পরের দু'দিনে তা ভয়াবহ রূপ নিল। যে দিকে তাকাই দাউ দাউ আগুন। ২৯ তারিখ আর্মি নামল শহরে। আহসানউল্লাহ তখন বার বার আমাদের বাসায় আসছেন, যাচ্ছেন। তাগিদ দিচ্ছেন অন্যত্র চলে যাওয়ার জন্য।

তিনি তখন যশোরের জে জে আই জুট মিলের লেবার অফিসার। ওঁর সঙ্গে তখনও আমার বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা বাকি ছিল। এ জন্য পুরোপুরি প্রটেকশনও দিতে পারছিলেন না। পারিবারিক বন্ধু হিসাবে যতটুকু করার ততটুকু করছিলেন।

৩০ তারিখ দুপুরে ভয়াবহ উত্তেজনার মধ্যে তিনি একটা জীপ নিয়ে এলেন আমাদের নিতে। দূরে কবরস্থানের পাশে রাস্তায় জিপ রেখে বাসায় ঢুকলেন। বললেন, 'রেডি হও। আমি আসছি, নিয়ে যাব।' বলেই আবার বেরুতে উদ্যত হলেন।

ওঁকে বললাম, 'কোথায় নিয়ে যাবে? আমরা এতগুলো ভাইবোন, কে জায়গা দেবে?'

'অত কিছু বোঝার দরকার নেই, বেরিয়ে পড়।' বলেই রাস্তার দিকে এগিয়ে গেলেন। একটু পরেই আবার ফিরে এলেন। বললেন, 'আর্মি আর বিহারীরা এদিকে আসছে।'

মা আর ভাইবোনদের নিয়ে হুড়মুড় করে বেরুলাম। দেখি পিছনের বাঙালি বাড়িগুলোতে আগুন জ্বলছে। রাস্তায় মানুষ ছুটছে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য। মানুষের মাথা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। আমাদের জিপে না তুলে কবরস্থানের উপর দিয়ে যশোর-খুলনা মহাসড়কের দিকে ছুটলেন আহসানউল্লাহ। আমরা জ্ঞানহারার মত তাঁর পিছনে ছুটছি। কবরস্থান পার হওয়ার সময় পায়ের নিচে নরম মত কি যেন ঠেকল। নিচে তাকিয়ে দেখি চারপাশে ছড়িয়ে আছে মানুষের লাশ। এগুলো বিহারীরা মেরে ফেলে রেখেছিল ওই অবস্থায়।

রাস্তা পার হয়ে আমরা কিছুটা পথ হেঁটে পৌঁছলাম গ্রামের এক মাতব্বরের বাড়িতে। লোকটি আমাদের পূর্ব পরিচিত। তিনি আমাদের দেখে বললেন, 'আমাদের এখানে একদিনও থাকা যাবে না। যারা আওয়ামী লীগ করে তাদের আমরা জায়গা দিতে পারব না।' উনি মুসলিম লীগ করতেন।

আমরা অনুনয় করে বললাম, 'এখন তো বিকেল হয়ে গেছে। রাতটুকু থাকি, কাল সকালে একটা ব্যবস্থা করে নেব।'

তখন ওঁর মন একটু নরম হল। বললেন, 'এক রাত থাকতে পারেন। কিন্তু আমি যেহেতু মুসলিম লীগ করি, ইপিআর আক্রমণ করলে আপনাদেরও মরতে হবে।'

মুসলিম লীগের লোক হয়ে ইপিআরের হাতে প্রাণ হারাবার প্রবৃত্তি হল না। মাতব্বরের বাড়িতে রাত কাটাবার চিন্তা বাদ দিতে হল। বিকেলেই আমরা খুলনার নানা বাড়ির পথে রওনা হলাম। গোয়ালখালী গেটের কাছে এসে রিক্সা নিলাম। নূরনগর এসে দেখি পাকিস্তানি আর্মিরা পজিশন নিয়ে আছে। তারা একটি বাস ও রিক্সায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। রিক্সার চাকা কোন কারণে ফেটে গেলে শব্দ শুনে আর্মিরা গুলি করবে— এই ভয়ে রিক্সা ছেড়ে দিলাম। পায়ে হেঁটে খুলনা শহরে মুসলিম পাড়ায় নানা

বাড়ি পৌঁছুলাম।

কিছু দিন থাকার পর নানা বাড়ির অবস্থাও ভাল লাগল না। এতগুলো মানুষ ওদের উপর চেপে আছি। ওরাও ভাল চোখে দেখছে না। বিষয়টি আত্মসম্মানে লাগল। মা বললেন, 'চল, আমরা যেখান থেকে এসেছি, ওখানেই ফিরে যাই।'

এ সময় নানা বাড়িতে আরও অনেক লোক আশ্রয় নিয়েছিল। এমন এক অবস্থা যে, কেউ কাড়ুকে দেখতে পারছে না। মাঝে মাঝে আর্মি আসছে। আমরা গোয়ালঘর, ধানক্ষেত বা অন্য কোথাও লুকোচ্ছি।

এ সময় এক মজার ঘটনা ঘটেছিল। পাশে থাকত এক হিন্দু পরিবার। আমরা যখন আর্মির ভয়ে পালাচ্ছি, তখন ওই পরিবারের এক বৃদ্ধা বললেন, 'বুবু, তোমরা পালাচ্ছ কেন?' বললাম, 'আর্মি আসছে, শিগগির পালাও।' বৃদ্ধা জীবনে আর্মির নাম শোনেননি। বললেন, 'বুবু আম্মি (আর্মি) ভাল, না খারাপ, কও না।' বললাম, 'শোনার দরকার নেই, পালাও।' বৃদ্ধা তখন বললেন, 'আমি পালালে আমার গরু ছাগলের কী হবে?' দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে এই ছিল সাধারণ মানুষের ধারণা। একাত্তরে পাকিস্তানিরা এদেরই হত্যা করেছে নির্বিচারে।

আমরা সেদিন আর্মির ভয়ে একটা বাড়িতে গোয়ালঘরের নিচে শুয়ে কাটিয়েছিলাম। বৃষ্টির মত গুলি হচ্ছিল সারা দিন। কয়েক দিন পর যখন পরিস্থিতি একটু শান্ত হল, মাকে বললাম, 'চল খালিশপুর যাই। মরলে ওখানেই মরব।'

আবার খালিশপুর এলাম। দেখলাম বাড়িঘর আগের অবস্থায় নেই— ভাঙাচোরা, লুটপাট করে নিয়ে গেছে সবকিছু। কিছুই করার ছিল না। মা কয়দিনের ময়লা কাপড় চোপড় ধুয়ে রোদে শুকোতে দিলেন। দূর থেকে কাপড় শুকোনো দেখে আহসানউল্লাহ এলেন। আমাকে বললেন, 'তোমরা কেন ফিরে এসেছ? দেখছ না কিভাবে কিলিং হচ্ছে? আমি আজই পালিয়ে যাচ্ছি। আর্মিরা আমাকে খুঁজছে। আমি ওখানে থাকতে পারব না।' মাকেও বললেন, 'এখানে কেন এসেছেন খালাম্মা?'

মা বললেন, 'তুমিই বল বাবা, তাহলে আমরা কোথায় যাব?'

ঠিক এ সময় দেখলাম কয়েক ট্রাক আর্মি বাড়ির পাশে রাস্তায় টহল দিচ্ছে। তক্ষুণি আমরা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। তারপর জানালাটা একটু ফাঁক করলাম। হঠাৎ এক সাথে অনেকগুলো কণ্ঠের আর্ত চিৎকার শুনে চমকে উঠলাম। দেখলাম, রাস্তার ওপারে মুন্সি বাড়ির সামনে একই পরিবারের ১৫/১৬ জনকে ব্রাশ ফায়ার করা হয়েছে। তরতাজা জীবনগুলো লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে। ভয়ে আমরা আধমরা হয়ে গেলাম।

আহসানউল্লাহ বললেন, 'আমি এখানে থাকলে আর্মিরা আপনাদেরও মেরে ফেলবে। এর পর এক মুহূর্তও এখানে থাকা সম্ভব নয়।' আহসানউল্লাহ চলে গেলেন।

মা আর ছোট ভাইবোনদের নিয়ে আমি আবার রাস্তায় বেরুলাম। মা বললেন, 'তুই আমাদের রিক্সায় তুলে দে। আমি যশোর চলে যাই। কপালে যা থাকে তাই হবে।'

মাকে আমার শেষ সম্বল একশটি টাকা দিয়ে বললাম, 'অফিস খুললেই জয়েন করব। তোমাদের সময় মতো টাকা পাঠাব।'

মা বললেন, 'ঠিক আছে, দুঃখ করিস না, বেঁচে থাকলে দেখা হবে।'

আসলে ওই পরিস্থিতিতে মায়ের উপরও মায়া হচ্ছিল না। বরং তাঁকে একটা বোঝা মনে হচ্ছিল। মাকে বললাম, 'কোন রকমে চলে যাও। ট্রেন ভাড়া দিও না।' রিক্সাওয়ালাকে হাত ধরে বললাম, 'তোমার রিক্সা ভাড়া তো আট আনা, পারলে পয়সা নিও না। ওনাকে একটু স্টেশনে পৌছে দাও।'

ছোট ভাই বোনদের নিয়ে মা চলে গেলেন। আহসানউল্লাহও চলে গেছেন। আমি একা হয়ে গেলাম। পূর্ব পরিচয়ের সুবাদে একাধিক বাড়িতে গিয়েছিলাম আশ্রয়ের জন্য। সবাই তখন নিজেদের বাঁচাবার জন্য দিশেহারা। কোথাও জায়গা পাইনি। কয়েকদিন ছিলাম এক প্রকৌশলীর বাড়িতে। সেখানেও একই সমস্যা। তাঁর স্ত্রী কিছুতেই আমাকে রাখতে চাইলেন না। বাড়ির কর্তা রাজী হলেও অন্যরা নয়। আমাকে কেন্দ্র করে শুরু হল পারিবারিক কলহ। ভদ্রলোক বললেন, 'এ অবস্থায় একটা অসহায় মেয়েকে আমি কোথায় বের করে দেব?' স্ত্রী তাঁর কথা শুনতে রাজী নয়।

আমার খুব খারাপ লাগল। রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। ভাবছি কি করব, কোথায় যাব? চোখ ফেটে কান্না আসছিল। দু'চোখে অন্ধকার দেখেছিলাম। হঠাৎ ওখানে দেখা হল আমার অফিসের অবাঙালি একাউন্টট্যান্ট জাহাঙ্গীর কেরেলার সাথে। আর তখন থেকেই শুরু হল আমার দুর্দশা আর দুঃস্বপ্নের সময়।

জাহাঙ্গীর আমাকে দেখেই বলল, 'আরে বাজী, এখানে দাঁড়িয়ে কেন?' ও আমাকে 'বাজী' অর্থাৎ বোন বলে ডাকত।

বললাম, 'আমি খুব খারাপ অবস্থায় আছি।' মনে হল অফিস খোলা থাকলে বেতন থেকে কিছু টাকা ধার করতে পারব। জানতে চাইলাম অফিস খোলা কিনা।

সে বলল, 'হ্যাঁ, তুমি কি জয়েন করতে চাও? তাহলে আমার বাইকে ওঠ।'

জাহাঙ্গীরকে বললাম, 'আমি তো বাইকে চড়তে পারি না। তার চেয়ে তুমি আমাকে রিক্সায় নিয়ে চল।' সে আমার রিকশার সঙ্গে সঙ্গে এল।

খালিশপুর পার হয়ে সে আমাকে ওয়ারলেস কলোনীর সুন্দর একটা জলপাই রঙের বাড়ির সামনে দাঁড় করাল। ওটা ছিল এক আগাখানির বাড়ি— 'মাসকাট হাউস'। আমাকে সে ঢোকাল ওই বিশাল বাড়িতে। আমি অবাক হয়ে জানতে চাইলাম, 'আমাকে এখানে কেন এনেছ?'

ঘরের ভেতর নিয়ে জাহাঙ্গীর আমার সাথে অশোভন আচরণ শুরু করল। যে আমার সাথে আগে চোখ তুলে কথা বলারও সাহস পায়নি, সেই আমাকে ধাক্কা দিয়ে বলল, 'তুমি এখানে বস। সন্ধ্যায় এখানে কিছু আর্মি অফিসার আসবে। তোমার চাকরির ব্যবস্থা হবে।' এই বলে সে বাইরে গেল।

শয়তানটা বেরিয়ে যাওয়ার পর পরই ঠিক করলাম যেভাবে হোক এখান থেকে পালাতে হবে। ঢোকার সময় বাইরে দুজন দারোয়ান দেখেছি। জানালার ফাঁক দিয়ে দেখলাম ওরা আমার ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে নিজেদের ভেতর কি যেন বলাবলি করছে। আমি দরজা খুলে বাইরে এলাম। ওদের বললাম, 'একটু চা হবে তোমাদের কাছে?'

'হ্যাঁ। খাবেন?' জানতে চাইল একজন।

ওদের গেট থেকে সরাবার জন্য বললাম, 'হ্যাঁ চা খাব।'

অল্প বয়সী দারোয়ানটা বলল, 'কেতলিতে ঠাণ্ডা চা আছে, খাবেন?'

বললাম, 'তাহলে এক কাপ ঠাণ্ডা চা দাও।'

ছেলেটি চা আনতে গেল। এ সময় অন্যজন মুখে অল্প দাড়ি, আমাকে হাত দিয়ে ইশারা করে চলে যেতে বলল। লোকটাকে মনে হল ফেরেশতা।

যখন রাস্তায় নেমে পড়েছি তখন চা আনতে যাওয়া ছেলেটা ফিরে এল। চিৎকার করে বলল, 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আপনাকে তো যেতে মানা করেছে সাহেব।'

রিক্সায় উঠতে উঠতে বললাম, 'এক্ষুণি আসছি। কাপড়-চোপড় কিছু আনিনি তো, ওগুলো আনতে যাচ্ছি।'

রিক্সা থামল মিল গেটে। ভিতরে ঢুকে দেখি আমার অফিসের বয়স্ক জেনারেল ম্যানেজার ফিদাই সাহেব। পাইপ টানছেন। আমাকে দেখে বললেন, 'আরে! তুমি কোত্থেকে?'

তার মনে করুণা জাগাবার জন্য বললাম, 'স্যার, এখানে আমি একা। পরিচিত সবাই মুক্তিযুদ্ধে চলে গেছে। আমি কি করব বুঝতে পারছি না।'

'তুমি কি জয়েন করতে চাও?' জিজ্ঞেস করলেন ফিদাই।

বললাম, 'হ্যাঁ স্যার। কিন্তু আমার তো পায়ে স্যাণ্ডেল নেই। কাপড় চোপড়ও তেমন কিছু নেই। কিভাবে অফিস করব?'

উনি একটা চিরকুট লিখে দিলেন। বললেন, 'যাও, চিফ একাউন্টট্যান্ট-এর সঙ্গে দেখা কর।'

চিফ একাউন্টট্যান্ট তিনশ টাকা দিল। আর বলল, 'গাড়ি নিয়ে যাও, কিছু কেনা কাটা কর। আর কাল সকালে তোমাকে আনতে গাড়ি যাবে। তুমি যেন কোথায় থাক?'

আমি ঠিক করেছিলাম বিহারীদের ভেতর খালিশপুরে না থেকে পাবলায় পরিচিত এক দারোগার বাড়িতে থাকব। ওদের বাসার ছেলেরা প্রায় সন্ধ্যায় আমাদের বাড়িতে আসত। ওরা ভাল গান গাইতে পারত। ওই বাসাটা ছিল একটু ভিতরে, ঘুরে ঘুরে যেতে হত। বাড়িটা চেনাতে চাইলাম না। একাউন্ট্যান্টকে বললাম, 'আমি যেখানে থাকি ওখানে তো গাড়ি যায় না।'

সে বলল, 'অসুবিধা নেই। ড্রাইভারকে বলে দিও কোথায় দাঁড়াতে হবে। গাড়ি যাবে সাড়ে সাতটায়। তুমি প্রস্তুত থেকো।'

পরদিন গাড়ি এল। আমি ঠিকমত অফিসে এলাম। জয়েন করার আধা ঘন্টার মধ্যে একজন একাউন্টট্যান্ট সুলতান পাঞ্জোয়ানী নামে এক আগাখানি, যার সাথে আমি আগে কথাও বলতাম না, আমাকে বলল, 'আপনি কেমন আছেন? আপনাকে তো খুব ভাল দেখাচ্ছে।' বলে অশোভন ইঙ্গিত করল। আমি কড়াভাবে তাকালাম তার দিকে।

একটু পর হঠাৎ ফিদাই সাহেব ফোন করলেন। বললেন, 'তুমি লাঞ্চে কোথায় যাবে?'

বললাম, 'এখানেই করব।'

তিনি বললেন, 'না, না, তুমি আমার সাথেই লাঞ্চ কর।'
জি এমকে চটালে ক্ষতি হতে পারে ভেবে লাঞ্চ করতে রাজি হলাম।
লাঞ্চের সময় উনি আমাকে বললেন, 'সন্ধ্যার সময় ক্যাপ্টেন ইশতিয়াক আসবে। তোমাকে সিনেমা দেখতে নিয়ে যাবে।'
বললাম, 'স্যার, আমি তো সিনেমা দেখি না।'
'তুমি এসব বিষয়ে আপত্তি করবে না। তোমার নামে অনেক অভিযোগ রয়েছে। ওর সঙ্গে যেতে হবে তোমাকে।' কড়া আদেশ দিল ফিদাই।
উনিশ শ' একাত্তরের আগে এই লোকটাকে ফেরেশতার মত মনে হত। দীর্ঘদিন কাজ করেছি তার সাথে। কখনও এতটুকু মনে হয়নি— এ লোকটা খারাপ কাজ করতে পারে, বা মানুষকে কষ্ট দিতে পারে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পর তার চেহারা পুরোটাই পাল্টে গেল— যেন একটা আস্ত শয়তান। ফিদাই বলল, 'তুমি উপরে এস। আলাপ কর ক্যাপ্টেন ইশতিয়াকের সঙ্গে।'
উপরে যাওয়ার পর ইশতিয়াক জিজ্ঞেস করল, 'তুমি টিভি কিম্বা সিনেমা দেখ না?'
উত্তর দিলাম, 'না, দেখি না,'
সে বলল, 'চল, আজকে একটা মুভি দেখে আসি।'
জি এম আদেশ করল, 'বিকেলে তুমি নাস্তা খেয়ে ওর সঙ্গে যাবে।'
বিকেলে ইশতিয়াক এল সিনেমায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। অসুস্থতার দোহাই দিয়ে, আরেক দিন যাব বলে সে যাত্রা ওর হাত থেকে রেহাই পেলাম। কিন্তু ফিদাই আমাকে রেহাই দিল না।
অফিস ছুটির পর ফিদাই এসে বলল, 'তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে। আমার সঙ্গে চল।'
জি এমকে অধস্তন কর্মচারীরা বাঘের মতো ভয় পেত। প্রতিবাদ করার সাধ্য ছিল না। ও আমাকে নিয়ে গেল ওর খালিশপুরের ফ্ল্যাটে, যেখানে কেউ থাকত না।
নির্জন ফ্ল্যাট দেখে আমি ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। ফিদাই আরও ভয় ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'তোমার ভাইরা মুক্তিযুদ্ধে গেছে। তুমি কোনও অবস্থায় আর্মির হাত থেকে রক্ষা পাবে না। এর মাশুল তোমাকে দিতে হবে।'
ফিদাইর কাছে আমি করুণা ভিক্ষা চেয়েছিলাম। বলেছিলাম, 'আপনি আমার বাবার মত। আপনার কথায় আমি কাজে যোগ দিয়েছি। আপনি আমাকে বাঁচান।'
ফিদাই বলল, 'বাঁচাতে পারি, যদি তুমি আমার সঙ্গে সহযোগিতা কর।' এই বলে সে আমাকে জড়িয়ে ধরতে চাইল।
আতঙ্কে, অপমানে আমি কান্নায় ভেঙে পড়লাম। ফিদাই ধমক দিয়ে বলল, 'চ্যাঁচামেচি করলে কোন লাভ হবে না। আর্মিরা তোমাকে পেলে ছিঁড়ে খাবে।'
আর্মিরা ছিঁড়ে খাওয়ার আগে সেই রাতে ফিদাই আমাকে ছিঁড়ে খেতে চেয়েছিল। যতক্ষণ শক্তি ছিল বাধা দিয়েছি। পরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম।
জ্ঞান ফেরার পর ফিদাই ক্রুদ্ধ গলায় বলল, 'তুমি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করনি। এর ফল তোমাকে ভোগ করতে হবে।'

আমি কোন রকমে বললাম, 'বাড়ি যাব।'

নির্বিকার গলায় ফিদাই বলল, 'চলে যাও।'

বাইরে তখন বেশ অন্ধকার। রাত আটটা নটা হবে। একটা রিকশাওয়ালা বসেছিল। ওকে নিয়ে আমার কোয়ার্টারে এলাম। শূন্য ঘরে মেঝের উপর উপুড় হয়ে হাউমাউ করে কাঁদলাম। ফিদাইর কথা মাথার ভেতর হাতুড়ির মতো আঘাত করছিল— আর্মির হাত থেকে রক্ষা পাবে না। আর্মিরা তোমাকে ছিঁড়ে খাবে।

সারা রাত এক ফোঁটা ঘুমোতে পারিনি। একবার ভেবেছি আত্মহত্যা করব। আরেকবার ভেবেছি পালিয়ে যাব। যতবার এসব কথা মনে হয়েছে ততবারই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার তিন শিশু সন্তান, যাদের তখন বয়স চার থেকে সাতের ভেতর আর আমার ছোট ভাইবোনগুলো, নয় বছর ধরে যারা বেঁচে আছে মূলতঃ আমার উপার্জনের উপর।

তখন প্রচণ্ড রাগ হয়েছিল আহসানউল্লাহর উপর। যদিও আনুষ্ঠানিকতার পর্ব বাকি ছিল তাঁকে আমি মনে মনে স্বামী হিসেবে ভাবতাম। তিনিও ছিলেন আমাদের অভিভাবকের মতো। কেন আমাকে এভাবে ফেলে চলে গেলেন? মেজ ভাই শিবলী যখন যুদ্ধে যায় তখন ওর জন্য কী গর্বই না হয়েছিল! অথচ ওরই জন্য আমার এ দুর্দশা। ধিক্কার দিয়েছি নিজেকে, ধিক্কার দিয়েছি গোটা পৃথিবীকে। বার বার মনে হয়েছে আমার চেয়ে অসহায় মানুষ দ্বিতীয়টি কোথাও নেই। যদিও অনেক মৃত্যু দেখেছি, নারী নির্যাতনের কথাও শুনেছি, কিন্তু কখনও ভাবিনি আমি তার শিকার হব।

রাত ভোর হল। বাথরুমের শাওয়ার খুলে দাঁড়িয়ে থাকলাম। ঘন্টা পেরিয়ে গেল। উত্তপ্ত মস্তিষ্ক একসময় শীতল হল। অফিসে যাওয়ার জন্য তৈরি হলাম। মনে হল কারাগারে ফাঁসির আসামীদের যে রকম একা সেলে রাখা হয় আমি সে রকম এক সেলে বন্দি হয়ে গেছি। এই কারাগার থেকে আমার মুক্তি নেই যতদিন না এ দেশ স্বাধীন হবে। ততদিন আমাকে আর্মিদের ছিঁড়ে খাওয়ার ভয় বুকে চেপে সন্তান আর অসহায় ছোট ভাইবোনদের মুখের অন্ন জোগাতে হবে।

কয়েকদিন ফিদাই আমাকে কিছু বলেনি। ভাবলাম লোকটা বুঝি অনুতপ্ত হয়েছে। আমার ধারণা মিথ্যে করে একদিন ফিদাই আমাকে তার ঘরে ডেকে পাঠাল। গম্ভীর গলায় বলল, 'নেভাল কমান্ডার গুলজারিন তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তুমি প্রফেসর ভূঁইয়া মার্ডারের দিন স্পটে ছিলে। তোমার বিরুদ্ধে মার্ডার চার্জ আছে।'

বুঝলাম নুতন ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। প্রফেসর ভূইয়া ছিলেন আমার বাবার দৌলতপুর কলেজের কলিগ। তিনি ছিলেন পিস কমিটির নেতা। যেদিন আমি পাবলায় আফিলউদ্দীন সাহেবের বাড়িতে যাই সেদিনই নকশালরা তাকে আমার খুব কাছেই গুলি করে হত্যা করে।

আগে থেকেই গুলজারিনের কথা শুনেছিলাম— ভয়ঙ্কর একজন নারী নির্যাতনকারী। ফিদাইকে অনুনয় করে বললাম, 'আমাকে আপনি চাকরিতে বহাল করলেন, আর আপনিই আমার সাথে এমন করছেন। আমার কেউ নেই স্যার।'

কিছুতেই টলানো গেল না তাকে। বলল, 'আজকেই তোমাকে মিলের বাংলোতে

উঠতে হবে।'

বললাম, 'আমার পদমর্যাদা অনুযায়ী আমি এত বড় বাংলো পাই না।'

ওরা জোর করে আমাকে ওখানে ওঠাতে চাইল, 'ওখানে না থাকলে তোমার বিরুদ্ধে মার্ডার চার্জ আনব।'

শেষে আমি বললাম, 'আমি একা ওখানে ভয় পাব— অতবড় বাংলোতে। তার চেয়ে আমাকে একটা ফ্ল্যাট দিন জুনিয়র অফিসার কলোনিতে।'

শেষ পর্যন্ত ফিদাই আমাকে একরকম জোর করেই নেভাল কমান্ডারের কাছে পাঠাল। নেভাল কমান্ডার বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ। মুখে ভদ্র ব্যবহার কিন্তু চেহারাটা ভয়ংকর। আমাকে দেখেই বলল, 'এসো, এসো, বস।'

ভয়ে আধখানা হয়ে গেছি। কোনরকমে সোফার এক কোনে বসলাম।

গুলজারিন আমাকে দেখছিল, মুখে তার শয়তানের হাসি। বলল, 'তুমি আমার কি হতে চাও— বন্ধু হতে চাও, না কন্যা হতে চাও, না কি অন্য কিছু?'

ঢোক গিলে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বললাম, 'একজন ভদ্রলোক যে ব্যবহার করেন, আমার সাথে সে ব্যবহার করুন।'

গুলজারিন বলল, 'আমি তোমাকে কিছু প্রস্তাব দেব। তুমি সেটা গ্রহণ করতে পার, আবার প্রত্যাখ্যানও করতে পার। আমার সাথে এক মাস থাক। আমি অবশ্য এ জন্য বিশেষ কিছু দিতে পারব না। কিন্তু তুমি থাকলে আমি খুশি হব।' এরপর আমার পিঠে থাবা দিল, কাঁধ ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিল।

আমি বললাম, 'এটা কিভাবে হয় স্যার, আমি কিভাবে এখানে থাকব?'

গুলজারিন বলল, 'কেন থাকতে পারবে না?' আমি তোমাকে প্রচুর পয়সা দেব। তোমার পরিবারের জন্য টাকা পাঠাব।' একটু থেমে আবার বলল, 'তোমার ভাইরা মুক্তিযুদ্ধে গেছে। তোমার নিরাপত্তা দরকার। তুমি থাক আমার সাথে। আমি অনেক ভেবে চিন্তে তোমাকেই নির্বাচন করেছি। আমার তো একটা সেক্রেটারি দরকার। তুমিই এজন্য উপযুক্ত।'

আমি কাঁদতে শুরু করলাম। বার বার বললাম, 'আমাকে যেতে দিন।'

আমি যখন সাংঘাতিক অসহিষ্ণু হয়ে উঠলাম তখন সে বলল, 'তুমি কি জান না কোনও মেয়ে কমান্ডার গুলজারিনের হাতে এসে ফিরে যায় না? তুমি বোধহয় শোননি এটা। কিন্তু তুমি ফিরে যেতে পারবে। উদ্বিগ্ন হয়ো না।'

এ সময় দু'জন অফিসার হ্যা হ্যা করে হাসতে হাসতে ঘরে এসে বলল, 'স্যার, মেয়েটাকে আমাদের হাতে দেন না। একটু ঘুরে আসি।'

গুলজারিন বলল, 'নো নো।' তারপরও ওরা দু'জনে ঠাট্টা করছিল আমাকে নিয়ে।

তখন আমি অবিরাম কাঁদছি। আমার সঙ্গে ওরা যখন অশোভন আচরণ করতে চাইল আমি গুলজারিনকে বললাম, 'আমি মাঝে মাঝে তোমার কাছে আসব। আমার অনেক ভাইবোন। আমি পালিয়ে যেতে পারিনি। এখান থেকে পালাতে পারবও না। এখন আমাকে ছেড়ে দাও।'

এত কিছু বলার পরও গুলজারিন আমাকে ছাড়েনি। তার চেহারাটা ক্রমশ বীভৎস

এক পশুর মতো হয়ে উঠল। পশুর মতোই নির্যাতন করেছিল সে।

বিকালের দিকে আমার কাছ থেকে ও লিখিত বন্ড নিল। আমাকে যখন ডাকা হবে তখনি আসতে হবে। আমি চলে এলাম মিলে।

পরদিন দুপুরে দু'জন অফিসার এল বিরাট গাড়িতে করে। নেভাল ক্যাপ্টেন আসলাম ও ক্যাপ্টেন গণি। আসলামের বয়স কম কিন্তু গণির বেশি। দেখে বোঝা যায় গণি সুবেদার থেকে এই বয়সে এসে ক্যাপ্টেন হয়েছে। ওরা সাথে করে বৃদ্ধ জুট ইন্সপেক্টর ফজলুর রহমানকে এনেছিল। ওনার বাড়িটাকে তখন বিহারীরা কসাইখানা বানিয়েছে। গণি ওনাকে নিয়ে বাইরে গেল। যাওয়ার সময় রহমান সাহেব মলিন মুখে আমার দিকে তাকালেন। ক্যাপ্টেন আসলাম আমার কাছে পানি চাইল।

আমি কাজে ছিলাম। আমার পিওনকে বললাম 'পানি দাও।'

ফজলুর রহমানকে নিয়ে বিহারীদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিল গণি। কিছুক্ষণ পরে শুনেছি বিহারীরা তাঁকে হত্যা করে টুকরো টুকরো করে 'হুলিয়া' খেলেছে। ওদের ভাষায় ওরা হোলি খেলাকে 'হুলিয়া' বলে। দেখলাম বিহারীরা কেউ কেউ গায়ে হাতে ফজলুর রহমান সাহেবের রক্ত মেখে এসেছে আসলামকে দেখাতে।

ক্রিসেন্ট জুট মিলের ঠিক পিছন দিক দিয়ে বয়ে গেছে ভৈরব নদী। নদীর তীর ঘেঁষে মিলের পাট গুদাম। আমার কোয়ার্টার থেকে ওটার দূরত্ব হবে বড় জোর দুশ' ফুট। তখন আমার এক ছোট বোনকে আমার সঙ্গে রেখেছিলাম। একা থাকতে ভয় লাগত বলেই ওকে এনে রেখেছিলাম। একদিন ও আমাকে বলল, 'আপা, ঘুমের মধ্যে আমি কাদের যেন বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করতে শুনি। আমার কেমন লাগছে এখানে থাকতে।'

ওকে আশ্বস্ত করে বললাম, 'ঠিক আছে, আমি জেগে থাকব।'

সারাদিন চাকরি আর বন্দি জীবনের মানসিক ক্লান্তিতে সন্ধ্যায় অবসন্ন হয়ে পড়তাম। রাত জাগতে পারতাম না। তাড়াতাড়িই ঘুমিয়ে পড়তাম। সেদিন ওর কথা শুনে জেগে থাকলাম।

রাত প্রায় তিনটার দিকে নদীর দিকে থেকে অস্পষ্ট শব্দ ভেসে এল— 'বাঁচাও বাঁচাও।'

আমি উঠে বসলাম। জানালা একটু ফাঁক করে দেখি গুদামের কাছে একটা ট্রাক দাঁড়ানো। মুখে কালো কাপড় বাঁধা কয়েকজন মানুষ বিক্ষিপ্ত হাঁটাহাঁটি করছে। হঠাৎ আলোর তীব্রতা কমে গেল। মনে হল একটা ছাড়া বাকি লাইট নিভিয়ে দিয়েছে। আলো আঁধারির মধ্যে দেখলাম চোখ কালো কাপড়ে বাঁধা একজনকে নামাল ট্রাক থেকে। পাট কাটার মেশিন, যেটা দেখতে অনেকটা গিলোটিনের মতো, ওটার তলায় ফেলে দেহ থেকে মাথা আলাদা করল। একটা, দুইটা, তিনটা— এভাবে চারটা দেখার পর আর পারলাম না। মাথা নামিয়ে নিলাম। ভয়ে সে রাতে আর ঘুম হল না। চোখ বন্ধ করলেই ভেসে উঠছে রক্ত হিম করা সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য। ট্রাক, স্বল্প আলো, কালো কাপড়, দুখণ্ড মানুষ, কানে ভেসে আসছে অস্ফুট করুণ আর্তনাদ— 'বাঁচাও বাঁচাও!'

ওই রাতের পর আর কোনদিন ও ঘরে শুইনি। ওই বীভৎস নারকীয় হত্যার কাহিনী

আমার বোনকে বলিনি, পাছে সে ভয়ে চলে যায়।

হঠাৎ এক রাতে আমার বোন বলল, 'আপা আমাদের বাসা আর্মিরা ঘিরে রেখেছে। দেখ, কি অবস্থা!' তাকিয়ে দেখি সত্যিই তাই। ওকে বললাম, ঘরের ভেতর লুকিয়ে থাকতে। একজন আর্মি এসে আমাকে বলল, 'মেজর আলতাফ করিম আপনাকে নিচে ডাকে।'

আমি বললাম, 'আলতাফ করিম কে?'

কথা ঘুরিয়ে সে আবার জিজ্ঞেস করল 'এখানে ফেরদৌসী কে?'

বললাম, 'সে তো নেই, যশোর গেছে। আমি তার আয়া।'

সে বলল, 'তুমিই ফেরদৌসী। আমরা একটু পরে আসব তোমাকে নিয়ে যাব।'

আমি বললাম, 'কোন ভদ্রলোক এত রাতে কারও বাড়িতে আসে না। তুমি এক্ষুণি নিচে যাও।' ওই দলে যারা ছিল তাদের মধ্যে লেঃ কোরবান, ক্যাপ্টেন খালেক আর ক্যাপ্টেন সুলতানকে আমি চিনেছিলাম।

ওরা জি এম ফিদাইর বাসায় ডিনারে এসেছিল। ফিদাই ডিনার শেষে আমার বাসা ওদের দেখিয়ে দিয়েছে— এজন্য সবাই এখানে এসেছে। এসময় ওরা এও বলেছে তৎকালীন মিনিস্টার আমজাদ হোসেনের ভাগ্নী, মমতাজও নিচে গাড়িতে আছে। ঠিক তখনই আমার ছোট বোন বলল, 'তোমাকে নিলে— আমি আত্মহত্যা করব।'

আমি ওর মুখে কাপড় ঢুকিয়ে দিলাম। কারণ ওরা যদি টের পায় দুজনকেই নিয়ে যাবে। ওদের বললাম, 'তোমরা আমাকে আজকে নিও না। আমার ছোট বোন আছে। ওকে মায়ের কাছে রেখে আসি, পরে নিও।' পরে আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমরা আমাকে কি জন্যে নেবে?'

বলল, 'তোমার বিরুদ্ধে মার্ডার চার্জ আছে।'

বললাম, 'যতই মার্ডার চার্জ থাক আমি এখন যাব না, কাল সকালে যাব।'

এই করতে করতে প্রায় সকাল হয়ে গেল। ওরা চলে গেল।

বোনকে বললাম 'এখানে তো আর থাকা যাবে না। অন্য কোথাও যেতে হবে।'

ওকে মার কাছে পাঠিয়ে দিলাম।

অফিসে গিয়ে জি এমকে ফোন করলাম। রাতের ঘটনা বিস্তারিত বললাম। শয়তানটা বলল, 'হ্যাঁ, আমি সব জানি। তুমি কি তাদের এন্টারটেইন করোনি? তোমাকে তো এ জন্যই রেখেছি।' আরো বলল, 'তুমি এখান থেকে যাওয়ার কোন রকম চেষ্টা করবে না। যদি যাওয়ার চেষ্টা কর তবে তোমাকে হত্যা করা হবে।'

আমি বললাম, 'এ অবস্থায় আমি থাকব কি করে? এটা তো আমাকে হত্যা করারই সামিল।'

সে বিরক্ত হয়ে বলল, 'কর্ণেল খটক তোমার সঙ্গে কথা বলবেন। তোমাকে যশোর যেতে হবে। তার লোক এসে তোমাকে নিয়ে যাবে। তুমি আপত্তি করলে তোমাকে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়া হবে, যেখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না।'

রাতে ফিদাইর চিঠি নিয়ে ক্যাপ্টেন সুলতান, লেঃ কোরবান আর বেঙ্গল ট্রেডার্স-এর অবাঙালি মালিক ইউসুফ এল আমাকে যশোর নিয়ে যেতে। পাষণ্ডরা যশোর যাওয়ার

পথে গাড়ির ভেতর আমাকে ধর্ষণ করেছে।

কর্ণেল খটকের হাতে তুলে দেয়ার আগে ওরা যশোর ক্যান্টনমেন্টের বিলিয়ার্ড রুমে গিয়ে আবার ধর্ষণ করেছে। সেই সময় আমার মনের অবস্থা কী ছিল কোনও দিন ভাষায় প্রকাশ করা তা সম্ভব হবে না। আমাদের বাড়ির কাছে কবরস্থানে বাঙালিদের হত্যা করে লাশ ফেলে রাখতে দেখেছিলাম আমি। সেই লাশ পচে গলে যাওয়ার পরও সৎকার হয়নি। নিজের দেহকে নিজের মনে হত না। গলিত কোনও লাশের মতো মনে হত। নির্মম নৃশংস নির্যাতনের এক পর্যায়ে আমার বোধশক্তি লোপ পেয়েছিল। কর্ণেল খটকের দেখা পাওয়ার আগে আটাশ ঘন্টা একটানা সংজ্ঞাহীন ছিলাম আমি। কখন ডাক্তার এসেছে, শুশ্রুষা করেছে কিছুই বুঝতে পারিনি।

কর্ণেল খটক আর কর্ণেল আবেদ আমাকে জেরা করেছে প্রফেসর ভূইয়ার হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে। ওরা বার বার বলেছে, 'তোমার ভাইরা মুক্তিবাহিনীতে গেছে। ওদের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ আছে।'

আমার উপর নির্যাতন চালানোর জন্য তাদের অজুহাতের অন্ত ছিল না। যদিও জানি কোন কারণ না দেখিয়েই ওরা লক্ষ লক্ষ নারী পুরুষের উপর নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করেছে। আমি জানতাম ওদের জেরার জবাব দিয়ে কখনও ওদের সন্তুষ্ট করতে পারব না। ওরা আমাকে রেহাই দেবে না। শেষের দিকে জেরার কোনও জবাব দিতাম না। বলতাম, 'আমাকে তোমরা মেরে ফেল। এভাবে নির্যাতন করো না।'

পাকিস্তানি বর্বরদের হাতে মৃত্যু আমার ভাগ্যে ছিল না। যশোর ক্যান্টনমেন্টে কর্ণেল খটক আর কর্ণেল আবেদও আমাকে নির্যাতন করেছে। শুধু এরা নয়, যশোর ক্যান্টনমেন্টে কর্ণেল আবদুল্লাহ ও কর্ণেল জাফরও জেরার নামে আমার উপর বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন চালিয়েছে। আমার কাকুতি, আমার কান্না, আমার প্রতিরোধ, আমার ঘৃণা— কিছুই নিবৃত্ত করতে পারেনি উচ্চপদস্থ আর্মি অফিসারের ব্যাজধারী পাষণ্ডদের। আমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসি সৈন্যদের অত্যাচারের বহু বিবরণ পড়েছি, বহু ছবি দেখেছি। একাত্তরে পাকিস্তানি সৈন্যদের যে নৃশংসতা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করেছি বর্বরতার সকল ইতিহাসকে তা ম্লান করে দিয়েছে।

আমার ন' মাসের অভিজ্ঞতায় একজন মাত্র পাকিস্তানি আর্মি অফিসারের দেখা আমি পেয়েছিলাম যাকে তুলনামূলকভাবে ভদ্র মনে হয়েছে। যশোর ক্যান্টনমেন্টে এক রাতে সে এসেছিল। আমাকে দেখে সে অবাক হয়ে বলল, 'এ কী অবস্থা হয়েছে আপনার? আমার কথা কী মনে আছে? আপনার সাথে ক্রিসেন্ট জুট মিলে দেখা হয়েছিল। আমার নাম মেজর আলতাফ করিম। আপনাকে আমার ভাল লেগেছিল। মনে হয়েছে অত্যন্ত আত্মমর্যাদা সম্পন্ন একজন। এখনও আমি আপনাকে পছন্দ করি। যাহোক, আপনাকে একটা কথা বলি। আমার বাবা একজন এডুকেশনিস্ট, কলেজের প্রিন্সিপাল। এখানে আমার আসার কোন ইচ্ছে ছিল না। বাধ্য হয়ে আমাকে আসতে হয়েছে। আপনাকে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে যেতে বলা হয়েছে। আপনি কি একটু দেখে আসবেন?'

আজ আমি যেভাবে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প বুঝতে পারি তখন অতটা বুঝতাম না। বললাম, 'কোথায় সেটা? ওখানে গেলে কি বাসায় ফেরা যাবে?'

আলতাফ বলল, 'আমার উপর শুধু অর্ডার আছে ক্যাম্পটা ঘুরিয়ে দেখানোর। আপনি সব কিছু অস্বীকার করছেন বলেই দেখানো হবে। বাসায় ফেরার ব্যাপারে আমার কোন হাত নেই।' তারপর জিজ্ঞেস করল, 'রিক্সায় যেতে চান না জিপে?'

বললাম, 'আমার হাঁটার ক্ষমতা নেই। জীপেই সুবিধা।'

কনসেনট্রেশন ক্যাম্প ছিল একটা ছোট ব্যারাকের মত। অনেকগুলো ছোট ছোট রুম। বন্দিদের পেটানোর শব্দ ও প্রচণ্ড চিৎকার শুনতে পাচ্ছিলাম।

আলতাফ জানাল 'ওটা নির্যাতনের শব্দ।' সে জানতে চাইল বেশি কিছু দেখতে চাই কিনা।

আমার মাথা ঘুরছিল। দাঁড়াতে পারছিলাম না। কোনও রকমে বললাম, 'আর দেখতে চাই না। আমাকে মুক্তি দাও।'

আলতাফ বলল, 'তুমি তো গুলজারিনের সাথে লিখিত চুক্তি করেছ। ওখানে আমার কোন হাত নেই। তবে আমি রিপোর্ট দেব তোমাকে এখানে দু'দিন রাখা হয়েছে। তারপর তোমার সম্পর্কে ফেবার রিপোর্ট দিয়ে ছেড়ে দেব।'

পরে দেখেছি আলতাফ আমাকে অন্যদের সামনে গালাগালি করত। অন্যদের দেখিয়ে ছড়ি ঘুরাত, কিন্তু একান্তে ভদ্র ব্যবহার করত।

এর পরদিন ও আমাকে জিপে করে নিয়ে গেল ব্রিগেডিয়ার হায়াৎ-এর কাছে। সে আমাকে একটা চিঠি দিল এবং বলল, 'তুমি এখন যেখানে আছ, ওখানেই থাকবে। যাতে করে ডাকা মাত্রই পাওয়া যায়। তোমার ব্যাপারে আমাদের ইন্টারোগেশন শেষ হয়নি।'

সেদিনই মেজর একরাম আমাকে জুট মিলে পৌঁছে দিল। মেজর আলতাফের অনুরোধে তার বন্ধু একরাম আমাকে সেদিন খালিশপুর পৌঁছে দিয়েছিল। একরামকে পরে জেনেছি এক গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভেতর দিয়ে।

একদিন খুলনার আর্মি হেড কোয়ার্টার থেকে একজন অফিসার আমাকে ফোন করে বলল, 'আপনি কি ফরিদ বলে কাউকে চেনেন? পাবলাতে বাড়ি?'

বললাম, 'হ্যাঁ চিনি।' ফরিদ সেই দারোগাবাড়ির ছেলে যাদের আশ্রয়ে আমি ছিলাম।

অফিসার বলল, 'সে ধরা পড়েছে। আপনার নাম বলেছে। আপনাকে যোগাযোগ করতে বলেছে।'

প্রথমে মনে হল এটা কোনও ফাঁদ হতে পারে। পরে মনে হল ফরিদ যদি সত্যি সত্যি আর্মির হাতে পড়ে ওকে ওরা মেরে ফেলবে, ওর জন্য কিছু করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে হল ওর জন্য কিছু করতে চাইলে তার মাশুলও আমাকে দিতে হবে। প্রচণ্ড মনোকষ্ট আর হতাশা ঘিরে ধরল। টেলিফোনকারী অফিসারকে শুধু বললাম, 'আজ তো সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কাল খোঁজ করে দেখব কী করা যায়।'

অফিসার জানাল, 'ফরিদকে গতকাল যশোরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।'

মেজর আলতাফ তখন যশোরে। আমি আলতাফকে ফোন করলাম। চেহারার বর্ণনা দিয়ে বললাম, 'আলতাফ এই রকম চেহারার নিরীহ ছেলেকে আর্মিরা ধরে নিয়ে গেছে।'

সে বলল, 'দ্যাখ তোমার ব্যাপারটা ছিল অন্যরকম— আমি দেখেছি। ওই ছেলেকে মেজর কোরবান পেটাচ্ছে। আমি এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারব না।' পরে খোঁজ নিয়ে বলল, 'ওকে ছেড়ে দেয়া সম্ভব হবে না। ওর কাছে মুক্তিবাহিনীর চিঠি পাওয়া গেছে। তুমি যশোর এসে মেজর একরামের সঙ্গে যোগাযোগ কর।'

আমি যশোর এসে আলতাফকে ফোন করলাম। আলতাফের মাধ্যমে জানলাম ফরিদ মেজর একরামের আন্ডারে। মেজর একরামের সাথে দেখা করলাম। আলতাফ আমাকে দেখা করার ব্যবস্থা করল।

আমাকে একরাম জিজ্ঞেস করল, 'তোমার সাথে ওর যোগাযোগ কি করে? ওর কাছে তো মুক্তিযোদ্ধাদের চিঠি পাওয়া গেছে।'

বললাম, 'ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। আসলে ওর এক সৎ ভাই ওর পকেটে চিঠি রেখে ধরিয়ে দিয়েছে।'

একরাম বলল, 'তিনদিন পর আমার কাছে এসে ফরিদকে বুঝে নিয়ে যেও।'

পরে সে আমাকে ফরিদের সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করল। আমাকে দেখে ফরিদ পা জড়িয়ে ধরল। বলল, 'আপা, আমাকে বাঁচান।'

ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'ভয় পেয়ো না। তোমার কিছু হবে না।'

তিন দিন পর ফরিদকে আনার জন্য আবার যশোর গেলাম। মেজর একরাম খুবই ভদ্র ব্যবহার করল। সম্ভবত আলতাফ ওকে আমার ব্যাপারে কিছু বলেছিল।

এ সময় আমার মেজভাই শিবলী এসে দেখা করল। বলল, 'আপা, তুই তো মেজর একরামকে চিনিস। ওর কাছে যশোরের গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো জায়গার ম্যাপ আছে। তাছাড়া ওদের কনফারেন্স রুমটাও একটু দেখা দরকার। তুই কি আমাকে একবার ওর কাছে নিয়ে যেতে পারবি?'

প্রথমে ভয় হল। শিবলী মুক্তিযুদ্ধে গেছে এটা আর্মির অজানা থাকার কথা নয়। পরে মনে হল নাম গোপন করে ছোট ভাই হিসেবে ওর পরিচয় দেয়া যায়। শিবলীর বয়স তখন উনিশ হলেও দেখে পনের যোলর বেশি মনে হত না। খুবই নিষ্পাপ চেহারা ছিল ওর। শিবলীর কথা মতো মেজর একরামকে ফোন করলাম। বললাম, 'তুমি আমার এত উপকার করেছ তোমাকে ধন্যবাদ জানাবার জন্য একবার দেখা করতে চাই।'

একরাম বলল, 'কালই চলে এস।'

পরদিন ছিল ছুটির দিন। শিবলীকে নিয়ে একরামের সঙ্গে দেখা করলাম। শিবলীর পরিচয় দিলাম এই বলে— 'আমার ছোট ভাই, সৈয়দ হাসান।'

শিবলী খুব অল্প সময়ে মানুষের সঙ্গে ভাব জমাতে পারত। একরামের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলা শুরু করল। একরামের ব্যবহারও আন্তরিক ছিল। ও বোঝাতে চাইছিল, বাংলাদেশ আলাদা হলে অর্থনৈতিক অবস্থা আরও খারাপ হবে, জিনিসপত্রের দাম বাড়বে—এইসব। শিবলীও ওর সঙ্গে তাল দিচ্ছিল।

দুপুরে খাওয়ার সময় একরাম আমাদের বলল খেয়ে যেতে। আমি বললাম, 'আজ আমাকে অফিসে ওভারটাইম ডিউটি করতে হবে। অন্য একদিন আসব।'

শিবলী একরামকে বলল, 'আপনি তাস খেলতে পারেন?'

একরাম হেসে বলল, 'কেন পারব না? তোমার আপা খেলবেন?'

শিবলী বলল, 'ও খেলতে পারে না। চলুন, আপনাকে কিছু ট্রিকস দেখিয়ে দিই।'

একরাম আমাদের নিয়ে গেল পাশের ঘরে ওর রেস্ট রুমে। একরাম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকলেও ওর জিনিসপত্র খুব গোছানো থাকত না। ওর বিশ্রামের ঘরে টেবিলে অনেক দরকারী কাগজ এলোমেলো ছড়িয়ে ছিল। তাস নামিয়ে খেলা শুরুর আগে একরাম বলল, 'আমি একটু বাথরুম থেকে আসছি।'

ও বেরিয়ে যেতেই শিবলী ওর কাঙ্খিত কাগজ খুঁজতে আরম্ভ করল। টেবিলে, ড্রয়ারে কোথাও না পেয়ে বিছানার তোষক উল্টাতেই ওটা পেয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ওটা ভাঁজ করে পিঠের কাছে প্যান্টের ভেতর গুঁজে ফেলল।

একরাম এল। কিছুক্ষণ তাস খেলার পর আমি বললাম, 'আমাকে যেতে হবে। নইলে পরে বাস পেতে অসুবিধে হবে।' শিবলীকে খুব নার্ভাস দেখাচ্ছিল।

একরাম বলল, 'তোমাদের কোন অসুবিধে হলে আমাকে জানাবে।'

একরামের অফিস থেকে পাওয়া নকশার কারণেই শিবলীরা যশোরের টেলিফোন টাওয়ার সহ কয়েকটা জায়গায় সফল অপারেশন করতে পেরেছিল।

সেদিন যশোর থেকে খুলনা ফিরতে বাসে আরেক বিপদ। আমরা বাসে ওঠার পর আমাদের পেছন পেছন বাবড়ি চুল, লম্বা জামা পরা স্থানীয় রাজাকার কমান্ডার সাবদার আলীও উঠল। বন্দুকের বাট দিয়ে আমাকে গুঁতো দিয়ে সে বলল, 'নাম কি?'

আমি কড়া গলায় বললাম, 'কেন? নাম দিয়ে কী হবে?'

সে বলল, 'আপনাকে আমি ধরিয়ে দেব। আপনি নকশাল করেন।'

আরও কড়া ভাষায় বললাম, 'আপনি আমাকে কী করবেন?'

রাজাকারটা বলল, 'আমি আপনাকে এ্যারেষ্ট করিয়ে দেব।'

আমাকে আবার বন্দুকের বাট দিয়ে গুঁতো দিল। বলল, 'এখানে নাম। দেখাচ্ছি কি ক্ষমতা আছে।' এই বলে আমার দিকে বন্দুক তুলল। গুলি করতে চাইল। কিন্তু বাস যাত্রীদের হইচই ও বাধার কারণে রাজাকারটা দমে গেল।

একটু পরে সে অভয়নগর থানায় এসে নেমে গেল। বলল, 'শহীদ মিনারে দুটো মুণ্ডু ঝুলিয়েছি, আরও ঝোলাব।'

তাকিয়ে দেখি শহীদ মিনারে সত্যি সত্যি দুটো মুণ্ডু ঝুলছে।

খুলনায় ফেরার কিছুদিন পরের ঘটনা। একদিন অফিসে কাজ করছি। এমন সময় টেলিফোন বাজল। রিসিভার তুলতেই অপর প্রান্ত থেকে বলল, 'আমি ক্যাপ্টেন জাফর বলছি। কয়েকদিন হল নেভী হেড কোয়ার্টার-এ এসেছি। এ ক'দিনে তোমার অনেক প্রশংসা শুনেছি। আমি তোমার সাথে দেখা করতে চাই।'

ওই দিন আমি প্রত্যাখ্যান করলেও পরে সে মাঝে মাঝে দেখা করত। জাফর-এর সাথে ক্যাপ্টেন জলিলও এসেছিল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। সেও আমাকে বিরক্ত করত।

জুনিয়র অফিসারদের কারও হাত থেকেই আমি রেহাই পাইনি।

সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে আমি অনুভব করলাম আমার গর্ভে পাকিস্তানি পশুদের বিষাক্ত বীজের স্পন্দন। আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়লাম। রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেল।

প্রতি মুহূর্তে অনুভব করছিলাম পাকিস্তানি পশুদের কুৎসিৎ স্পর্শ। তখন আমার পাশে এমন কেউ ছিল না যাকে আমার এ মানসিক নির্যাতনের অংশীদার করতে পারি। একাই সিদ্ধান্ত নিলাম গর্ভপাতের।

খুলনার ডাঃ কাদেরকে আমি চিনতাম। তাঁর কাছে গিয়ে যখন আমার সিদ্ধান্তের কথা জানালাম, তিনি বললেন, 'টাকা জোগাড় করে আনুন, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।'

তখন তিনি আড়াইশ টাকা চেয়েছিলেন। সাতদিন ঘুরে দুশ টাকার বেশি জোগাড় করতে পারিনি। ডাক্তার কাদেরের কাছে যাওয়ার পর তিনি বললেন, আমি আড়াইশ টাকার কমে নিই না।'

তাকে অনুরোধ করে বললাম, 'এর বেশি আমার পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব নয়।'

তখন তিনি বললেন, 'আপনার স্বামীর সম্মতি লাগবে।'

সেই সময় গর্ভপাতের ব্যবস্থা এখনকার মত তত সহজ ও আধুনিক ছিল না। স্বামীর বণ্ড ছাড়া ডাক্তাররা গর্ভপাত করাতেন না। ডাঃ কাদেরকে অনুনয় করে বললাম, 'আমার স্বামী এখানে নেই। আমিই আমার অভিভাবক।'

শেষ পর্যন্ত ডাঃ কাদের রাজী হলেন। আমি ক্লেদমুক্ত হলাম।

এভাবে চলে এল ডিসেম্বর মাস। বিভিন্ন জায়গায় পাকিস্তানি আর্মিদের বিদায় ঘন্টা বাজতে শুরু করেছে। কিন্তু মিলের ভিতর বা খালিশপুর তখন অন্য চিত্র।

নভেম্বরের শেষ দিকে খালিশপুরে বিহারী ও মিলিটারিরা মিলে ব্যাপক হারে বাঙালি নিধনযজ্ঞ শুরু করেছে। ক্রিসেন্ট জুট মিলের ভিতরে বাইরেও এটা চলছিল। প্রতিদিন শত শত বাঙালি হারিয়ে যাচ্ছে। এ সময় মিলের জেনারেল ম্যানেজার ফিদাইও প্রায়ই পাকিস্তান যাওয়া আসা করত।

২রা ডিসেম্বরের ঘটল আরেক অপ্রীতিকর ঘটনা। আমাকে বিহারী ড্রাইভার রশিদ প্রতিদিন বাসায় পৌছে দিত। কিন্তু এইদিন মদ্যপ অবস্থায় আমাকে বাসার দিকে না নিয়ে, পাগলের মত মিল গেট দিয়ে বের হয়ে গেল। গাড়ি হাঁকাল নিউজপ্রিন্ট মিলের দিকে, এক অন্ধকার গলিতে। আমি প্রতিবাদ করায় রশিদ উর্দুতে গালাগালি দিচ্ছিল আর অশ্লীল ইঙ্গিত করছিল। রাগে ভয়ে আমার সমস্ত শরীর কাঁপছিল। পিছন দিক থেকে তার জামার কলার টেনে ধরলাম। নিউজপ্রিন্ট মিল ছাড়িয়ে একটু সামনে যেতেই আমি বাম হাত দিয়ে সজোরে দরজা ধাক্কা দিলাম। তখনও ডান হাতে ওর জামার কলার সিটের সাথে আটকে ধরা। দরজা খুলে আমি ছিটকে পড়লাম মাটিতে। তখনও বুঝতে পারিনি দরজার লকে বাম হাতের অনেক খানি কেটে গেছে। সে কাটা দাগ এখনও আছে আমার হাতে।

পরদিন মিলের সিনিয়র অফিসার ঢাকার নবাববাড়ির খাজা মোহাম্মদ আলী জিজ্ঞেস করলেন রশিদের ঘটনা সম্পর্কে। বললেন, 'আমাকে কেন জানাও নি?'

বললাম, 'স্যার, কাকে কোন কথা বলা যায়, কাকে বিশ্বাস করা যায়— এটা আমি বুঝতে পারিনি।'

৪ ডিসেম্বর অফিসে গিয়ে আহসানউল্লাহর টেলিফোন পেলাম। উনি জানালেন,

'তোমাকে হত্যার ষড়যন্ত্র চলছে। প্রতি মুহূর্তে আমি সংবাদ পাচ্ছি। দেরি না করে তুমি যেভাবে পার এক্ষুণি জে জে আই জুট মিলে চলে এস।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি জান না যে মিলের চারটি গেট ইতিমধ্যে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে?'

আহসানউল্লাহর ফোন শেষ হতেই যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে ফোন করল মেজর আলতাফ করিম। বলল, 'যশোরের অবস্থা খুবই খারাপ। মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি লড়তে হচ্ছে। আমি জানি না বাঁচতে পারব কিনা।'

সে আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিল এবং বলল, 'তুমি যদি জানতে পার আমি মারা গেছি তবে আমার বাবা ভাইকে খবরটা পৌঁছে দিও। ওদের বলো তোমার সাথে আমার আজ শেষ কথা হয়েছে।' সে ঠিকানা দিল। সব শেষে বলল, 'জানি, আমি অন্যায়ভাবে পাকিস্তানের পক্ষে লড়াই করছি কিন্তু আমি একজন সৈনিক, আমার করার কিছু নেই।'

আলতাফ একসময় আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। আমার সন্তানদের ভারও নিতে চেয়েছিল। বলেছিল, 'এখানকার অবাঙালিরা জানে আমি তোমাকে পছন্দ করি। আমি না থাকলে ওরা তোমাকে নির্ঘাত হত্যা করবে। তুমি পাকিস্তানে আমার স্ত্রী হিসেবে মর্যাদার সঙ্গে থাকবে। তোমার স্বামী ফিরে এলেও সে তোমাকে গ্রহণ করবে না।' কিন্তু আমি ওর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। বলেছিলাম, 'স্বামী গ্রহণ করবে কি করবে না এ নিয়ে আমি ভাবি না। তুমি একজন ভাল মানুষ। কিন্তু কোনও পাকিস্তানিকে আমি স্বামী হিসেবে ভাবতেও পারি না। কেন, তার কারণও তুমি জান। যতদিন বেঁচে থাকব পাকিস্তানিদের জন্য ঘৃণা আমার এতটুকু কমবে না।'

আলতাফ আর কথা বাড়ায়নি। ওর সাথে আমার শেষ দেখা হয় ডিসেম্বরের চার তারিখে। চেহারা পুড়ে কালো হয়ে গেছে। চেনা যায় না। আমার সাথে কথা হয়নি। গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল। আমাকে সেল্যুট দিয়ে চলে যায়। একাত্তরে আলতাফ ছিল একমাত্র পাকিস্তানি যার ভেতর বিবেকের দংশন আমি লক্ষ্য করেছি। সে জানত পাকিস্তানিরা যা করছে তা ঠিক নয়। এ ছাড়া পাকিস্তানি আর্মি— সাধারণ সৈন্য থেকে অফিসার পর্যন্ত সবাই ছিল ধর্ষকামী। নিরীহ মানুষ হত্যা করে, নির্যাতন করে তারা পৈশাচিক আনন্দ পেত।

টেলিফোন শেষ করেই আমি বাসায় গেলাম। একটা কাঠের বাক্সে কাপড় ভরে বেরুনোর চেষ্টা করলাম; পারলাম না। মিল গেটে বিহারীরা আটকাল।

ছোট বোন ও কাজের মেয়ে আলেয়াকে অবশ্য আগেই পাঠিয়ে দিয়েছি। সমস্যা আমার নিজেকে নিয়ে।

পরদিন দুপুরে খাজা মোহাম্মদ আলীর টেলিফোন পেলাম। বললেন, 'মেজর বেলায়েত শাহ আজ আমার অফিসে আসবে। ইচ্ছে করলে তুমি তার সাথে বাইরে যেতে পার।'

আগেই উনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন বাইরে যেতে চাই কিনা। আমি আমার ইচ্ছার কথা তাকে বলেছিলাম।

প্রথমে রাজী না হলেও পরে নিরুপায় হয়ে মেজরের গাড়িতে চড়লাম। মেজর শাহ ছিল সাংঘাতিক নারীলোলুপ। ওই দিনই সে আমাকে অশালীন প্রস্তাব দিয়েছিল।

খুলনার পথে গাড়ি নির্জন অন্ধকারে নিতে চাইল। আমি ভয় দেখালাম, 'ওদিকে মুক্তিবাহিনীর লোক থাকে, তোমাকে মেরে ফেলবে।'

ভয়ে হোক বা যে কারণেই হোক, সে আর বেশি দূর এগুলো না। আমি নেমে গেলাম জে জে আই জুট মিল গেটে, আহসানউল্লাহর সাথে দেখা করার জন্য।

কিন্তু ওঁকে দেখে আমার বহু দিনের চেপে থাকা ক্ষোভ ফেটে পড়ল। কেন তিনি আমাকে এভাবে ফেলে চলে গিয়েছিলেন? পাগলের মতো চিৎকার করছিলাম আর হাউমাউ করে কাঁদছিলাম। হঠাৎ কী হল, দুঃখে, রাগে অন্ধ হয়ে আমি সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম। সন্ধ্যায় আবার ফিরে গেলাম ক্রিসেন্ট জুট মিলে।

৬ ডিসেম্বর আমি মাত্র তিন মিনিটের ব্যবধানে প্রাণে রক্ষা পেয়েছি। ওই দিন সোয়া দুইটার দিকে বিহারী অফিস ক্লার্ক আক্তার টেলিফোন করল। জানাল, 'আমি তোমাকে অনেক দিন ধরে পছন্দ করি কিন্তু বলতে পারিনি। আজ বলছি। এই মাত্র সংবাদ পেলাম তোমাকে একটু পরেই মেরে ফেলবে। যে অবস্থায় আছ পালাও।'

বেরিয়ে পড়লাম ব্যাগটা হাতে নিয়ে। মিলের মেইন গেট কোয়ার্টার মাইল দূরে। এর মধ্যে ওখানে পৌঁছতে পৌঁছতেই তো মেরে ফেলতে পারে। সাংঘাতিক ভয় পেলাম। এমন ভয় আমি কখনও পাইনি। কাছে রিক্সা পেলাম। চড়ে বসলাম। বললাম, 'তাড়াতাড়ি চালাও।'

মাঝপথে দেখা হল ক্লার্ক আনোয়ারের সাথে। আনোয়ার আমার বিল্ডিং-এ ঠিক উপরে চার তলায় থাকত। সে যাচ্ছিল ডিউটিতে।

গেটে পৌঁছুতেই দারোয়ান বলল, 'এই মাত্র আনোয়ারকে অফিসের সামনে মেরে ফেলেছে। এক্ষুণি ভেগে যাও।'

সামনে পেলাম একটা বেবী ট্যাক্সী। তিন গুণ ভাড়া চাইল। চড়ে বসলাম। জে জে আই জুট মিলে পৌঁছুতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। আহসানউল্লাহ আমাকে পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

আহসানউল্লাহ আমার সব কথা শুনেছেন। বলেছেন, 'আমাদের চেয়ে অনেক বড় মুক্তিযোদ্ধা তুমি। পাকিস্তানিরা কী করেছে এ নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাববে না। আমার কাছে তুমি যেমন ছিলে তেমনই আছ।'

আহসানউল্লাহদের জে জে আই জুট মিলের জি এম ইদ্রিস সাহেবও ছিলেন অবাঙালি কিন্তু আমাদের জি এম-এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁর জন্যই জে জে আই জুট মিলে বাঙালি স্টাফদের কোনও ক্ষতি করতে পারেনি পাকিস্তানিরা। নবেম্বরের দিকে তাঁরই ভরসায় আহসানউল্লাহ কাজে যোগ দিয়েছিলেন।

৬ ডিসেম্বর যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে ইদ্রিস সাহেবকে জানান হল, যশোরের পতন হতে চলেছে। তিনি যেন সব অবাঙালি স্টাফ নিয়ে খুলনা চলে যান। বাঙালিদের ব্যবস্থা আর্মি এসে করবে।

ইদ্রিস সাহেব বলেছেন, তিনি বেঁচে থাকতে তাঁর একজন বাঙালি স্টাফের গায়ে কেউ আঁচড় কাটতে পারবে না। তিনি আমাদের সবাইকে নিয়ে খুলনা এলেন। আমরা সবাই সেলিম হোটেলে গিয়ে উঠলাম। হোটেলের খরচ মিলের পক্ষ থেকে বহন করা

হয়েছে। এসব ব্যবস্থা ইদ্রিস সাহেবই করেছিলেন। যে কারণে স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি একমাত্র অবাঙালি অফিসার যাকে তাঁর বাঙালি স্টাফরা মাথায় তুলে রেখেছিল।

১৬ ডিসেম্বর দেশ হানাদার মুক্ত হল। পরদিন আহসানউল্লাহ্ আমাকে বললেন, 'চল তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাব।'

গাড়িতে করে তিনি আমাকে আনলেন, খুলনার গল্লামারি বধ্যভূমিতে। বিশাল প্রান্তর জুড়ে ছড়িয়ে আছে হাজার হাজার মানুষের লাশ। শুধু প্রান্তরে নয়, আশেপাশে ধান ক্ষেত ও পাটক্ষেতেও ছড়িয়ে ছিল লাশ। বাতাসে পাট গাছ যখন এলোমেলো হচ্ছে ফাঁক দিয়ে দেখি লাশের স্তূপ। কোনও লাশই তিন চারদিনের বেশি পুরনো নয়।

চোখের সামনে অসংখ্য লাশ দেখেও সেই মুহূর্তে আমার কোনও অনুভূতি ছিল না। মনে হচ্ছিল যে দেহটা আমি বইছি সেটা ওরকমই একটা লাশ।

একাত্তরের সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলোর কথা যখন ভাবি, মনে হয় আটাশ বছর ধরে সেই গলিত বিকৃত লাশ আমি কাঁধে নিয়ে ঘুরছি।

সাক্ষাৎকার ঃ শাহরিয়ার কবির
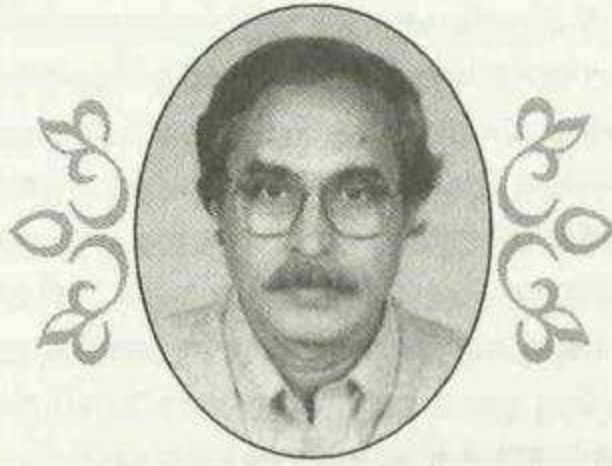
কথা বের করার জন্য পাকিস্তানি আর্মি সুঁই ফুটিয়েছে আঙুলের ডগায়

সৈয়দ আবুল বারক আলভী

বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী সৈয়দ আবুল বারক আলভী। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ৩০ আগস্ট অন্যান্য সহযোদ্ধার সঙ্গে তিনিও গ্রেফতার হন। তার ওপর অমানবিক নির্যাতন চালিয়েছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। ১২ আগস্ট '৯৯ তারিখে গৃহীত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তাঁর এ জবানবন্দি লিখিত হয়েছে।

১৯৭১ সালে আমি ডিপার্টমেন্ট অব ফিল্ম এণ্ড পাবলিকেশন্স-এ কাজ করতাম। এর আগে সরাসরি রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম না। তবে ছাত্রজীবন থেকে বাম চিন্তা ধারায় প্রভাবান্বিত ছিলাম। বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন সংগ্রামের পোষ্টার ও ফেষ্টুন তৈরির কাজ করেছি একজন সচেতন শিল্পী হিসেবে। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণের বেশ আগে থেকেই সাইক্লোস্টাইল করে পত্রিকা বের করতাম খুব গোপনে। সেখানে থাকত পাকিস্তানি সরকারের নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগঠিত হওয়ার বিভিন্ন সংবাদ। নিকটতম বন্ধুদের ও সমমনাদের মাঝে চুপি চুপি বিতরণ করতাম ওগুলো।

যা হোক, মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে মে মাসে আমি কুমিল্লা সীমান্ত পার হয়ে চলে যাই ভারতীয় শরণার্থী ক্যাম্পে। এর পর মুক্তি ক্যাম্প তৈরি হলে সেখানে চলে যাই। মাঝে মাঝে বাংলাদেশে আসতে হত বিভিন্ন তথ্য নিতে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা— যেমন বিমানবন্দর ও ক্যান্টনমেন্ট-এর ম্যাপ সংগ্রহ ও শরণার্থীদের জন্য উঠানো চাঁদা নেয়ার জন্য। যখন ফিরে যেতাম সাথে নিতাম ভারতে আশ্রয় নিতে চান এমন কাউকে। আমি পঞ্চম বার যখন বাংলাদেশে আসি সঙ্গে প্রচুর আর্মস

এনেছিলাম। আমাদের চারজনের এ দলটিতে অন্যরা ছিল বাকের, ফতেহ্ আলী ও কমল। অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এ কাজে আগস্টের তৃতীয় সপ্তাহে প্রচুর বিস্ফোরক, এলএমজি ৪টা, স্টেনগান, মর্টার ও রকেট লাঞ্চার ভরা চারটি বাক্স নিয়ে বাংলাদেশ সীমান্তে প্রবেশ করি। নদীপথে পাকিস্তানি সেনাদের হাতে ধরা পড়তে পড়তেও বেঁচে যাই। অস্ত্র এনে জমা করি বাড্ডায় বাকেরের এক আত্মীয়ের বাসায়। পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক তিনদিন পর তোপখানায় ইউসিস লাইব্রেরিতে মিলিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বাকের না আসায় পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। এরপর ২৮ তারিখ সন্ধ্যায় সঙ্গীত পরিচালক আলতাফ মাহমুদের বাসায় যাই। আলতাফ মাহমুদ তাঁর এক ব্যবসায়ী বন্ধুকে আমার সাথে ইণ্ডিয়া পাঠাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাত বেড়ে যাওয়ায় আলতাফ মাহমুদ আমাকে জোর করে আটকে রাখেন। কার্ফুর ভিতর আমাকে আর বের হতে দেননি।

সেদিন ছিল ৩০শে আগস্ট, ১৯৭১। মাত্র ভোর হয়েছে। বাইরে তখনও লোকজনের চলাচল ঠিকমত শুরু হয়নি। রাজারবাগে সঙ্গীত শিল্পী আলতাফ মাহমুদের ড্রইং রুমে শুয়ে আছি। হঠাৎ বাইরে পিকআপ থামার আওয়াজ হল। তারপর বুটের খট্ খট্ শব্দ। হতভম্ব হয়ে উঠে বসলাম। পাঁচ/ছ'জন উর্দি পরা পাক আর্মি এসে সজোরে লাথি মারল ড্রইং রুমের দরজায়। খুলব কি খুলব না বুঝে উঠতে পারছিলাম না। বাসার অন্য সবাই জেগে গেছে। ভয়ার্ত চোখে বাইরে তাকিয়ে আছি জানালা দিয়ে। আলতাফ ভাই ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন। বললেন, 'আমি খুলছি।'

দরজা খোলার সাথে সাথে পাক আর্মি বুকে রাইফেল ঠেকিয়ে জিজ্ঞেস করল— 'মিউজিক ডিরেক্টর সাব কাহা?'

'আমি।' বললেন আলতাফ ভাই।

'আর্মস কাহা?' আবারও কড়াসুরে প্রশ্ন।

উত্তর না পেয়ে আলতাফ ভাইকে নিয়ে গেল বাড়ির পিছন দিকটায়, ঠিক তার বেড রুমের কাছে। অন্যরা রুমের মধ্যে ঢুকে পড়ল। উল্টে পাল্টে দেখল সবকিছু। কিছুই পাওয়া গেল না। আমাকে ও আলতাফ ভাই-এর দুই শালাকে, যারা ঐ বাসায় বেড়াতে এসেছিল, কিল ঘুষি লাথি ও রাইফেলের বাট দিয়ে আঘাত করে পিক আপে তুলল। সাথে নিল আশে পাশের বাসার অন্যান্য ছেলেদের।

পিক আপ ভ্যান সোজা আমাদের নিয়ে গেল মার্শাল ল কোর্ট-এ। মার্শাল ল কোর্ট ছিল তৎকালীন এমপি হোস্টেলে অর্থাৎ বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের কর্মচারী কর্মকর্তাদের আবাসিক এলাকায়। পর পর তিনটি বিল্ডিং ব্যবহার করা হত মার্শাল ল কোর্ট হিসাবে। পিক আপ থেকে নামানোর পর আমাদের লাইনে দাঁড় করানো হল। সবাইকে ঢোকানো হল শেষ মাথার বিল্ডিংয়ের রান্না ঘরে। নোংরা স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে বসানো হল সবাইকে। দরজা থেকে দু'এক জনের পিছনে আমি বসলাম। একজন সিপাহী দরজার পাশে বসা প্রথম লোকটিকে ডাকল। পাশের নির্যাতন রুমে নিল তাকে। দরজা আধো ভিড়ানো ছিল। ফাঁক দিয়ে অল্প দেখা যাচ্ছিল ভিতরে কি হচ্ছে। বেতের শপাৎ শপাৎ শব্দ ভেসে এল। উর্দুতে প্রশ্ন করায় পরিষ্কার বোঝা গেল না। তবে একটা শব্দ জোরে শোরেই ভেসে এল, যার অর্থ এমন— তোর সাথে আর কে ছিল।

পেটানোর শব্দ, চিৎকার আর গোঙানি আমাদের আতংকিত করে তুলল। প্রায় ১৫/২০ মিনিট নির্যাতনের পর তাকে অন্য রুমে নেয়া হল। দেখলাম তার সমস্ত শরীর দিয়ে রক্ত ঝরছে। লাগামহীন কিল ঘুষির কারণে নাক, মুখ ফুলে গেছে। তার চেহারা দেখে রক্ত হিম হয়ে গেল। ডাক পড়ল আলতাফ ভাই-এর শালার। ছেলেটি বেড়াতে এসে এ্যারেষ্ট হয়েছে। ইন্টারোগেশন সেলে নিয়ে একইভাবে নির্যাতন করা হল তাকে। কোনও উত্তর বের করতে পারল না। সে আসলে জানত না অস্ত্র কোথায়, আর মুক্তিযোদ্ধারা কে কোথায়। কথা বের করার জন্য পাকিস্তানি আর্মি তার পায়ে জলন্ত সিগারেটের আগুন চেপে ধরেছে গায়ে, সুই ফুটিয়েছে আঙ্গুলের ডগায়। এরপর সিপাইটি এসে ডাকল, 'মিউজিক ডিরেক্টর সাহাব আইয়ে।'

সবার দিকে একবার তাকালেন আলতাফ ভাই। চলে গেলেন পাশের রুমে। সাথে সাথে উর্দুতে প্রশ্ন করতে শুনলাম— 'বল, আরও অস্ত্র কোথায়?'

'আমি জানি না।'

'কারা রেখেছিল ওগুলো?'

'কিছু লোক রেখে দিয়েছিল, আমি তাদের নাম জানি না।'

বেত আর রড দিয়ে নির্মমভাবে পেটানোর শব্দ পেলাম। জানালার ফাঁক দিয়ে অল্প দেখা যাচ্ছিল। মার সহ্য করতে না পেরে দুমড়ে পড়ছেন তবু নাম বলছেন না কারো। যত অস্বীকার করছেন ততই বেড়ে চলেছে নির্যাতনের মাত্রা। রাইফেলের বাট দিয়ে পেটে, পিঠে যত্রতত্র আঘাত করছে সিপাহিটি। কখনও জলন্ত সিগারেট চেপে ধরছে গায়ে। আলতাফ ভাইকে অন্যদের মত চিৎকার করতে শুনলাম না। বুঝেই ফেলেছিলেন তাঁকে ছেড়ে দেয়া হবে না। এটাই তাঁর শেষ দিন। তিনি তাঁর ব্যাপারে সব কথা স্বীকার করলেন। তবে অন্য কারো নাম বললেন না। নির্যাতনের মাত্রা সহ্য করতে না পেরে মাটিতে পড়ে গেছেন বার বার, আবারও দাঁড় করিয়ে একইভাবে প্রশ্ন করেছে, চালানো হয়েছে নির্মম নির্যাতন। প্রায় ১ ঘন্টা পর অন্য রুমে নেয়া হল তাঁকে। এরপর আরেক জনকে নিয়ে গেল। একইভাবে অত্যাচার চলল। এবার আমার পালা। আমি ঠিক করে নিয়েছি কি বলব।

"আলভী কৌন?" ডাক পড়ল।

নিজের নাম শুনে অবাক হলাম। নাম জানল কি করে? তবে কি আলতাফ ভাই টর্চারের সময় বলেছেন? না, এটা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তবে কি তার পরের জন, নাকি আগের কেউ বলেছে? কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলাম। উর্দি পরা সিপাহিটি আর একটু জোরে ডাকল— 'আলভী কৌন?' উঠে দাঁড়লাম।

আশেপাশের অন্যরা আমার দিকে তাকাল। নাম অস্বীকার করেও আমার বাঁচার পথ নেই। কারণ আগেই তারা আমার নাম জেনেছে। টর্চার রুমে ঢোকার সাথে সাথে একজন অফিসার বলল— 'তোমরা এত তারিখে বাংলাদেশে ঢুকেছ, তোমাদের সাথে এই এই অস্ত্র ছিল। তোমার দলে এই এই লোক ছিল।'

সবই মিলে যাচ্ছিল। ওরা জানল কি করে? নিশ্চিত হলাম দলের কেউ ধরা পড়েছে, সেই বলেছে। ঘাবড়ে গেলাম।

তারপরও সরাসরি সমস্ত কিছু অস্বীকার করলাম। আমি কখনও ওপারে যাইনি, আমি কাউকে চিনি না। কাগজ দেখে একজন বলল, 'ফতেহ আলী চৌধুরী, কমল, বাকের এদেরকে চেন?'

'আমি তাদের কাউকেই চিনি না।' দৃঢ়তার সাথে বললাম। সেনাটি জানতে চাইল, 'তুমি আলভী?'

হ্যাঁ। কিন্তু আমি ওদের কাউকে চিনি না।'

একজন বলল, 'তুমি যদি সব স্বীকার কর তবে তোমাকে ছেড়ে দেয়া হবে।'

আবার বললাম, 'আমি কিছু জানি না।'

৩/৪ জনের মধ্যে একজন আর্মি বর্বরভাবে পেটানো শুরু করল। যত্রতত্র আঘাত করল। পেটে রাইফেলের বাটের গুতো দিল প্রচণ্ড জোরে। বেত দিয়ে পেটানো শুরু করল নির্মমভাবে, এলোপাথাড়িভাবে। একই সাথে চলছে প্রশ্ন। অন্য একজন সৈনিক দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলল— 'তুমি ভেবেছ সব কিছু অস্বীকার করে পার পাবে? কিভাবে ছাড়া পাও দেখবো।'

প্রথম দিকে যেভাবে ব্যথা লাগছিল পরে তা স্বাভাবিক হতে শুরু করল। শরীর ধীরে ধীরে তার অনুভূতি হারাল। দু'হাত দিয়ে মার ঠেকাতে গিয়ে হাতের পাতায় বেতের বাড়ি লাগল। ফেটে গিয়ে রক্ত ঝরল। অবশ হয়ে যাওয়ায় এতক্ষণ বুঝতে পারিনি আমার শরীরে কি হচ্ছে। পরে দেখলাম পিঠ ও পায়ের বিভিন্ন অংশ দিয়ে রক্ত ঝরে মাটিতে পড়ছে।

বেশ কিছুক্ষণ মারার পর থামল। আবার আগের প্রশ্নগুলোই করল। আমি অস্বীকার করলাম। এ সময় তারা আরো অনেকের নাম বলল, যারা আমার পরিচিত, প্রথম দিকে ইণ্ডিয়া গেছে আমার সাথে।

৩৫-৪০ বছর বয়সী আর্মি অফিসারটি এত নির্যাতনের পর কিছু বের করতে না পেরে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত উত্তেজিত হয়ে উঠল। রাইফেলের বাট দিয়ে সজোরে আঘাত করল পেটে। যন্ত্রণায় দুমড়ে গেলে পিঠে ঘুষি মারল, পিছন দিকে লাথি দিল। আমি পড়ে গেলাম। আবার তুলে পেটানো শুরু করল। ধীরে ধীরে নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে চলল। আমার আর তখন দাঁড়ানোর শক্তি নেই। পড়ে যাচ্ছি বার বার। আবারও উঠিয়ে মারছে। তখন আমার শরীর আর শরীর নেই।

এক পর্যায়ে বাকেরকে আনা হল। বাকের ছিল আমাদের দল নেতা। ওরই নেতৃত্বে সপ্তাহ খানেক আগে আমরা ইণ্ডিয়া থেকে প্রচুর অস্ত্র এনে তারই এক আত্মীয়দের বাড়ি রাখি। ২৯ তারিখ বাকেরের আসার কথা ছিল। কিন্তু বাকের আসেনি। সন্দেহ হয়েছিল বাকেরের কিছু হয়েছে কিনা। চোখের সামনে বাকেরকে দেখে বুঝতে বাকি থাকল না কিভাবে ঘটনা গড়িয়েছে।

আর্মিটি বাকেরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ইয়ে হ্যায় আলভী?'

ধীরে ধীরে মাথা উঁচু করে তাকাল আমার দিকে। মাথা নেড়ে স্বীকার করল। তারপর অন্য রুমে নিয়ে গেল তাকে। তার সমস্ত শরীরে, মুখে শুকনো রক্ত বিভৎস লাগছিল। ওই ছিল বাকেরের সাথে আমার শেষ দেখা। বললাম, 'আমি ওকে চিনি না।

ও ভুল বলেছে, বাঁচার জন্য মিথ্যা বলছে, আমাকে ফাঁসাতে চাইছে। আমি ওকে কোন দিন দেখিনি।'

আসলে আমি নিজেই আগেই ঠিক করে নিয়েছি কি বলব ওদেরকে। জানতাম স্বীকার করলে আমার বাঁচার কোন পথ নেই। আর্মি অফিসারটি আবার বলল, 'তুমি 'ফতেহ্ আলীকে চেন?' অস্বীকার করলাম। 'এ নামে আমার কোন বন্ধু নেই। তবে যদি সামনে আনেন তাহলে চেনার চেষ্টা করতে পারি।'

অফিসারটি লোভ দেখাল— 'সত্যি কথা বল ছাড়া পাবে, অন্যথায় মরবে।' কিন্তু কোন কিছু আদায় করতে না পেরে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত হয়ে গেল। চোখ দুটো থেকে যেন রক্ত বেরিয়ে আসবে। নিজের মাথার চুল ছেঁড়ার মত করে বিশ্রি ভাষায় গালাগালি করল। আমি শুনেছিলাম আমাদেরকে যাদের জিজ্ঞাসাবাদ করার কথা ছিল, বিশেষ কোন কারণে তারা আসেনি। অফিসারটি একজন সিপাইকে অর্ডার দিল— 'সুয়ারকা বাচ্চাকো উধার লে যাও। আওর মারো উসকো।' উত্তেজনায় তার হাতের কাগজটা দুমড়ে ছুঁড়ে মারল আমার মুখে। আমার মনে হয় ওটা ছিল টর্চার রিপোর্ট, কাকে কাকে ধরা হয়েছে বা ধরা হবে তার লিষ্ট।

সিপাহিটি আমাকে অন্য রুমে এনে থেমে থেমে সন্ধ্যা পর্যন্ত পেটালো। সারা দিনে আমাদের পানি পর্যন্ত জোটেনি। শুধুমাত্র দুপুর ৩টার দিকে সুবেদার মেজর র‍্যাঙ্কের একজন বয়স্ক লোক লুকিয়ে ২টা রুটি দিল আমাদের সবাইকে। মনে হল ওগুলো মেসের বেঁচে যাওয়া রুটি। সাথে একটু চিনিও ছিল। লোকটি ছিল সম্ভবত বেলুচ। তাকে একমাত্র সদয় মনে হয়েছিল।

আমার দিকে তাকিয়ে সিপাহিকে বলল 'ইতনা মার না মারো। ইয়ে বাচ্চা হ্যায়। ইতনা মার মারনে সে ইয়ে মর জায়েগা।' নিজের গায়ের রক্ত দেখে আমার জেদ বেড়ে গিয়েছিল। কখনও স্বীকার করব না কিছু। যাহোক সন্ধ্যার পর আমাদের সবাইকে বাসে করে নিয়ে গেল রমনা থানায়। সিপাইরা আমাদেরকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করল। পুলিশ বলল, 'নাম লিখে বুঝে নিয়ে যান।' এ সময় আমার মনে হল নামটা পাল্টাই, তাহলে নির্দোষ প্রমাণে সুবিধা হবে। আসল নামটা বড় থাকায় ঘনিষ্ঠ জনরা ছাড়া কেউ পুরো নাম জানত না। বললাম, 'আমার নাম সৈয়দ আবুল বারক।' ইচ্ছে করেই 'আলভী' শব্দটা চেপে গেলাম।

আমাদেরকে রাখা হল থানা হাজতে। ওখানে আমাদের মত আরো অনেকেই রয়েছে। সেলে আলতাফ ভাইকে বললাম নাম পাল্টানোর বিষয়টি। তিনি বললেন, 'এটা করে আসলে কোন লাভ হবে না। কারণ কাল আবার হয়ত বাকেরকে আনা হবে। একইভাবে সনাক্ত করবে। জিজ্ঞাসাবাদ করবে, নির্যাতন করবে।'

থানা হাজতে আমাদের রাখা হল চোর, পকেটমারদের সঙ্গে। দেখলাম কয়েদীদের অদ্ভুত সহানুভূতি। থানার নিযুক্ত বাঙালি পুলিশেরা সহানুভূতিশীল ছিল আমাদের প্রতি। পকেটমারটি গামছা দিয়ে মুখ পিঠ, মুছিয়ে দিল। বলতে হয়নি তাদের কিছু। অন্যরা মলম লাগিয়ে দিল। ঐ সময় কয়েদীদের কাছে প্যারাসিটামল, পেইন কিলিং আইওডেক্স পাওয়া যেত। ওদের আত্মীয়রাই বাইরে থেকে দিত। রাতে হাত পা ফুলে ঢোল হয়ে গিয়েছিল।

ব্যাথায় নড়তে পারলাম না, ঘুমুতে পারলাম না সারা রাত। পরদিন ভোর বেলা তালিকা অনুযায়ী সবাইকে নিয়ে গেল মার্শাল কোর্ট-এ। এবার নেয়া হল অন্য বিল্ডিংয়ে। অর্থাৎ ২নং বিল্ডিংয়ে। গতকালের আর্মিদের কেউ নেই। মনে কিছুটা সাহস পেলাম। আমাদেরকে একটা ঘরের মধ্যে রাখা হল। রুমের সাথে প্রশস্ত বারান্দা। লিষ্ট দেখে নাম ধরে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল বারান্দাতে। তবে গতকালের মত সঙ্গে নির্যাতন করতে দেখলাম না। শুধু জিজ্ঞাসাবাদ করছে। সবার পর ডাকল আলতাফ ভাইকে। আমাকে ডাকল না। মনে হল লিষ্টে আমার নাম কোন কারণে বাদ পড়েছে। হয়ত গতকালের ছুঁড়ে মারা কাগজটাই ছিল লিষ্টের। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম 'আমাকে তো ডাকলেন না?'

আর্মি অফিসারটি তাকাল আমার দিকে। জিজ্ঞেস করল, 'কি নাম তোমার?'

বললাম, 'সৈয়দ আবুল বারক।' অফিসার হাতের লিষ্টটা তুলে ধরল চোখের সামনে। উপর থেকে নিচে পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পড়ল কয়েকবার। পেল না ঐ নামের কাউকে। বলল, 'কি কারণে ধরা হয়েছিল তোমাকে?'

'তাতো জানি না! গত সন্ধ্যায় আলতাফ মাহমুদের বাসায় এসেছিলাম। সেখান থেকে ভোরে আমাকে ধরে এনেছে।'

'এ বাসায় কেন এসেছিলে?'

আলতাফ ভাই-এর সব আত্মীয় আমাকে চিনতেন না। পাছে ধরা পড়ে যাই এজন্য এভাবে বললাম 'ওনার বাবা-মা আমার আত্মীয়।'

আর্মি অফিসারটি আবার প্রশ্ন করল, 'তুমি কি জানতে না সে মুক্তিবাহিনীর লোক?'

'না'।

'তুমি কি কর?'

'ডিএফপিতে চাকরি করি।'

'তুমি কি অফিস করেছ?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার অফিসের নম্বর কত?'

আমি ২৫ মার্চের পর কয়েকদিন বেতনের টাকার জন্য ছাড়া অফিসে যাইনি। পুরো সময়টা বলতে গেলে ইণ্ডিয়াতে কাটিয়েছি। তাই প্রথম ভেবেছিলাম অন্য নম্বর বলি। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলাম তারপর আবার যদি বিপদে পড়ি। তাই সঠিক নম্বরই বললাম। নম্বর বলে আবার ভাবলাম টেলিফোন করে যদি জানতে চায় আমি অফিস করেছি কিনা, আর কেউ যদি 'না' উত্তর দেয় তাহলে তো আবার সমস্যায় পড়ব। তবে আমার আত্মবিশ্বাস ছিল। অফিসের সবাই আমাকে ভালবাসে, সুতরাং এটুকু সবাই করবে। অন্তত আমার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বারী সাহেব ধরলে তো কথাই নেই। আর্মি অফিসারটি টেলিফোন সেট হাতে নিল। আমার দিকে তাকিয়ে এক, দুই, তিন বার নাম্বার ঘুরাল। লক্ষ্য করল চেহারায় কোন পরিবর্তন ঘটছে কিনা। আমার মনে হচ্ছিল আবারও বোধ হয় আটকে গেলাম। তিনবার ঘুরানোর পর বলল, 'ঠিক আছে।'

পাশে দাঁড়াতে বলল। এর মধ্যে একজন কোরআন শরীফ আনল। অফিসার হুকুম দিল— 'ছুঁয়ে বল আমি কোন দিন ওপার (ভারত) যাইনি, আমি কাউকে চিনি না।'

অবলীলায় বললাম। আর মনে মনে বললাম, 'আল্লাহ মাফ করে দিও। জান বাঁচানো ফরজ।' একের পর এক ঘটনা আমার সাহস বাড়িয়ে দিচ্ছিল। কারণ ওদের নিজেদের ভেতর আমি বলাবলি করতে শুনেছি, 'ওতো ছোট বাচ্চা। এতো টর্চার করেছে।' আমার আগেই মনে হয়েছিল শুধু মুখে অস্বীকার করে হবে না। সিমপ্যাথিও ক্রিয়েট করতে হবে। এ জন্য আমি হাতের রক্ত মুছিনি। ওগুলো বিভৎস দেখাচ্ছিল।

যখন প্রায় নিশ্চিত হলাম আমি মুক্তি পেতে যাচ্ছি তখন সামনে দেখা দিল আরেক সমস্যা। শেষ সময়ে দেখি গত দিনের সেই মেজর, যে রুটি দিয়েছিল সে এসেছে। আমার কথাবার্তা তখন আর আগের মত স্বাভাবিক থাকল না—এলোমেলো হতে লাগল। কারণ সে গতকাল আমার সব কথা শুনেছিল। যা হোক, সে কোন কথা বলল না। শুনে গেল সবকিছু।

আজ আলতাফ ভাই ছাড়া সবাইকে রিলিজ করা হল। কিন্তু আমার মনে হল সমস্যা এখনো সামনে রয়ে গেছে। গেটে ঢোকার সময় যে সেন্ট্রিকে দেখেছি, সে'ই গতকাল আমাকে বলেছিল, তুমি কি ভেবেছ অস্বীকার করে পার পাবে? দেখি কেমনে তুমি পার পাও!

তাকে এড়ানোর জন্য বললাম, 'আমি তো দাঁড়াতে পারছি না, কিভাবে যাব? আপনাদের যদি গাড়ি থাকে— আমাকে রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দিলে আমি নিজেই একটা ব্যবস্থা করে নেবো।' অফিসার খোঁজ নিয়ে জানল গাড়ি নেই। বলল, 'তুমি যথেষ্ট ইয়ং, আমি বিশ্বাস করি তুমি যেতে পারবে।'

এটাতে কাজ হল না ভেবে আবার বললাম, 'রক্তাক্ত দেহ দেখে তো আমাকে গেট পার হতে দেবে না।' তখন গতকালের ঐ মেজর (রুটি দেয়া) আমার হাত ধরে পার করে দেয়ার অভয় দিল।

আমরা হেঁটে হেঁটে মেইন রোডে চলে এলাম। আসার সময় গতকালের ঐ সিপাহিটা কটমট করে তাকাচ্ছিল— শিকারহারা বাঘের মত। কিন্তু যেহেতু মেজরই আমাকে পার করে দিচ্ছে, কিছু বলতে পারল না। রাস্তার কাছে এসে বেলুচ ঐ আর্মি পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, 'বাসায় ফিরে ডাক্তার দেখাবে, রেষ্ট নেবে।'

মেইন রোডে দাঁড়িয়ে আছি। কোন যানবাহন পাই না। এমন সময় একটি প্রাইভেট কার আমাকে ক্রস করে আবার ব্যাক করল। চমকে গেলাম। গাড়ি থেকে একজন বললেন 'উঠে বসুন।' দেখলাম আলতাফ ভাই-এর পাশের বাসার ভদ্রলোক, নিমা রহমানের বাবা।

আলতাফ ভাই-এর বাসায় থাকলাম। একটু সুস্থ হলে ১৫/২০ দিন পর একটা গ্রুপের সঙ্গে আবার ইণ্ডিয়া গেলাম। মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প হাসপাতালে বেশ কিছুদিন চিকিৎসার পর আমার হাতের আঙুলগুলো স্বাভাবিক হতে শুরু করল। তখন শুধু কাজ করতাম যুদ্ধ ক্ষেত্রের ছবি তোলার।

এখনও একটানা ছবি আঁকলে, কাজ করলে, হাতের সেই ব্যাথা চাঙ্গা হয়ে ওঠে। মনে পড়ে পাকিস্তানি আর্মির নির্মম অত্যাচারের সেই দুঃসহ মুহূর্তগুলো।

সাক্ষাৎকার ঃ রুহুল মতিন

ভেতরে ঢুকে দেখি মেঝেতে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে অনেকগুলো মৃতদেহ

আবুল ফজল

'৭১-এর ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ট্যাঙ্ক ও মর্টারসহ আক্রমণ করেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। নির্বিচারে গোলাবর্ষণ করে, ঘরের ভিতর ঢুকে গুলি করে হত্যা করেছে বরেণ্য অধ্যাপকদের। লাইনে সারিবেঁধে দাঁড় করিয়ে হত্যা করেছে ছাত্র ও কর্মচারীদের। এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী আবুল ফজলের জবানবন্দি ক্যাসেটে ধারণ করা হয় ৭ অক্টোবর '৯৯।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে আমি ছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে। আমার স্কুল জীবনের বন্ধু, জেনারেল সি আর দত্তের ভাগ্নে শিশুতোষ দত্তের ৮/এ রুমে। ওর রুমটা ছিল পূর্বদিকে এক্সটেনশন বিল্ডিং-এ, এখন যার নাম অক্টোবর ভবন। পহেলা মার্চ অফিসের ট্রেনিং-এর কাজে ঢাকা এসে আমি এই রুমেই উঠেছিলাম। তখন আমি চাকুরি করি পোস্টাল সার্ভিসে।

এক তারিখে ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের মিটিং মুলতবি ঘোষণা করায় ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকার মত সমগ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। মূলতঃ এ সময় থেকেই বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বাড়ছিল ধীরে ধীরে।

২৫শে মার্চ রাত আনুমানিক ১২টার দিকে প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দে আমাদের ঘুম ভাঙে। বাইরে বেরিয়ে দেখি পূর্বদিকে গেটের কাছে, যেখানে রাস্তার উপর গাছের গুড়ি দিয়ে ব্যারিকেড দেয়া হয়েছিল, সেখানে বেশ কয়েকটা মিলিটারি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গুড়ি সরিয়ে না যেতে পেরে তারা বিশ্রী ভাষায় গালাগালি করছিল। তারা কয়টা গাড়ি নিয়ে এসেছিল সঠিক মনে নেই। কারণ গাড়ির সংখ্যা গোনার মত মানসিক অবস্থা তখন ছিল না। তাছাড়া আমাদের রুমটা থেকে দেয়ালের কারণে সব কিছু পরিষ্কার

দেখাও যাচ্ছিল না। তবে মনে হল সংখ্যায় ৮/১০টা হবে।

পূর্ব দিকের গেটের ঠিক রাস্তার ওপারে জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা স্যারের বাসা। ওখান থেকেই গুলির শব্দটা পাচ্ছিলাম, হঠাৎ মেয়েলি কণ্ঠের প্রচণ্ড চিৎকার। নিশ্চিত হলাম কিলিং শুরু হয়েছে। শিশুতোষ-এর বিছানায় আমি ও আমার আরেক সিলেটি বন্ধু মোস্তাক ছিলাম। অন্য আরেকটি বেডে ছিল শিবু নামে আরেকটি সিলেটি ছেলে। মোস্তাক ইংরেজীতে অনার্স পড়ত আর শিবু সম্ভবত উদ্ভিদ বিদ্যায় অনার্স। ৭ই মার্চের পর সে ঢাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কিন্তু ওইদিন সন্ধ্যায় নীরেন নামে তার এক অতিথি নিয়ে বাড়ি থেকে ফিরে আসে। সন্ধ্যা বেলায় পুরানা পল্টনের একটা রেষ্টুরেন্টে মোস্তাক, আমি ও শিশুতোষ খাবার দাবার সেরে যখন রুমে আসি তখন ওদের দু'জনকে দেখি। শিবু কল্যাণপুরে টিউশনি করত। সম্ভবতঃ ওই কারণেই সে চলে আসে।

যা হোক, প্রথমে আমি রুম থেকে বেরিয়ে পাশের একটা রুমে গেলাম। আর্মিরা তখন জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা স্যারের বিল্ডিং-এর পাঁচ তলার ছাদে বাংলাদেশের যে পতাকা উড়ছিল ওটাকে মেশিনগান দিয়ে গুলি করে নামানোর চেষ্টা করছিল, কিন্তু পারছিল না।

জীবনে কখনও মেশিনগান দেখিনি, এ রকম অবস্থার মধ্যেও পড়িনি, যদিও ছাত্র রাজনীতি করেছি দীর্ঘদিন ধরে এবং তখনও পর্যন্ত আমার রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ছিল। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। ঠিক বুঝে ওঠতে পারছিলাম না কি করব।

পাশের রুমে কাচের জানালা দিয়ে দেখি আর্মিরা গেটের তালা ভাঙছে ভিতরে ঢোকার জন্যে। আমাদের রুমে তখন ছিল পেট্রোল ডিনামাইট পাউডার। ওগুলো সংগ্রহ করে রেখেছিলাম, ককটেল বোমা বানাব বলে। ওগুলো একটা টিনের মধ্যে ছিল। প্রথমে আমরা ওই প্রমাণগুলো সামনে মাঠের মধ্যে ফেলে দিলাম। ফেলে দিয়ে ভেবেছি তারা আমাদের কিছু করবে না।

আর্মিরা ভিতরে ঢুকেই হল লক্ষ্য করে প্রচণ্ড গুলি শুরু করল। আমরা ওই রুমটা ছেড়ে ক্রলিং করে টয়লেটে এসে আশ্রয় নিলাম। একটু পরেই নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। খেয়াল করে দেখলাম সামনের সুধীরদার ক্যান্টিনের টিনের চালে আগুন দিয়েছে। দাউ দাউ করে জ্বলছে।

টয়লেটের খুবই সংকীর্ণ জানালা দিয়ে শরীর গলিয়ে নিচে নেমে যাই। আমার সাথে টয়লেটে শিবুও ছিল। অর্থাৎ প্রত্যেক টয়লেটেই আমরা দু'জন করে আশ্রয় নিয়েছিলাম। নিচে নেমেই আমরা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের রুমটাতে ঢুকে পড়ি। সাথে সাথে আমি আমার গায়ের গেঞ্জি কিছুটা ছিঁড়ে ফেলি। পরনে লুঙ্গিটা থাকল। আমার গায়ের রং অতন্ত সাধারণ। ওরা যাতে বুঝতে না পারে আমি ছাত্র, তাই এ কাজ করলাম। এরপর দেয়াল টপকে আমি ড্রেনে পড়ি। মাথা উঁচু করে দেখি সামনে মিলিটারি। আবার দেয়াল টপকে ভিতরে আসি এবং সামনে টিন শেডে গিয়ে মালি, সুইপার ও অন্যান্য চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সাথে মিশে যাই। আমার সাথে সুভাষ, শিবু ও নীরেন ছিল। সামনে মাঠের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি কয়েকটা মৃতদেহ পড়ে আছে। হয়ত ওরা পালানোর চেষ্টা করেছিল। আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে আরো কয়েকটা মৃতদেহ। সামনে

মেইন হলে ওরা গুলি করছে। জি সি দেব-এর বাসার দিকেও গুলি হচ্ছিল। আমরা যখন দেয়াল টপকেছি তখন মোস্তাকও টপকেছিল। তারপর পাগলের মত জোরে দৌড় দিয়েছিল, সোজা চলে গিয়েছিল কালীবাড়ির দিকে। দৌড়ানোর সময় আর্মিরা গুলি ছুঁড়েছিল পিছে পিছে। কিন্তু মারতে পারেনি ওকে।

মিলিটারিরা আমাদের দেখতে পাচ্ছিল। আমরা ভাবলাম ওরা আমাদের ছাত্র ভাববে না। মালি বা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের কেউ ভাববে; কিছু বলবে না। আমাদের সাথে মালি সুইপারদের কিছু মেয়ে সদস্যও ছিল।

এ সময় দু'টি আর্মি সেপাই এল। উর্দুতে বলল, 'সমস্ত পুরুষ মানুষ আলাদা হয়ে যাও।'

আমি ভাবছি, আল্লাহ জানেন আমাদেরকে এবার আলাদা করে কি করবে।

এ সময় তারা চেলা কাঠ দিয়ে দু'একজনকে পিটান শুরু করল। আমাকেও মারল। এরপর আমাদেরকে নিল মাঠের মধ্যে লন্ড্রির কাছে। সম্ভবঃ ওটা বর্তমান পূজামন্ডপটার কাছে ছিল। লন্ড্রির সামনে সামান্য পাকা জায়গায় আমাদের বসিয়ে বলল, বিহারী কারা আলাদা হয়ে যাও।

এ সময় যারা একটু উর্দু জানে নিজেদের বিহারী বলল এবং আলাদা হয়ে গেল। আমি তখন ভাবছি। বিহারীদের ছেড়ে দেবে, আমাদের মেরে ফেলবে।

আমাদের যাদের বাঙালি ভেবেছে তাদেরকে পূর্বপাশের রাস্তা পার করে গুহঠাকুরতার কোয়ার্টারে আনল। ততক্ষণে শিক্ষকদের এ ভবনের অপারেশন শেষ করে ফেলেছে। ঢুকে পড়েছে মেইন ক্যাম্পাসে। আমাদেরকে দিয়ে ওখন থেকে লাশগুলো টেনে আনাল জগন্নাথ হল ক্যাম্পাসে। আমার মনে আছে, আমি ডঃ মনিরুজ্জামান স্যারের মৃতদেহটা বয়ে এনেছিলাম। উনি গুহঠাকুরতা স্যারের উপরে থাকতেন। মনিরুজ্জামান স্যারের বাসা থেকেও আরও দুটো যুবক ছেলের লাশও আনি। আমরা শুধু রাস্তা পার করে কিছুটা ভিতরে রাখি। এখান থেকে অন্য একটা গ্রুপ বয়ে নিয়ে যায় মেইন বিল্ডিং-এর দিকে (বর্তমান জি সি দেব ভবন)। আমাদেরকে ওদিকে নিয়ে যায়। ওখানে পৌছে দেখি মেইন বিল্ডিং-এর সামনে অনেকগুলো মৃতদেহ পড়ে আছে। বিল্ডিং-এর ভিতরে ঢুকে দেখি মেঝেতে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে অনেকগুলো মৃতদেহ।

নিচ তলার ডানদিকে একটা দেহ, সম্ভবত ছাত্রই হবে, প্রায় অর্ধেক পুড়ে গেছে। এখানে বেশ কয়েকটা লাশ পড়েছিল। কয়েকজন লোক ওগুলোকে বয়ে আনছিল। ওই লাশগুলোর একটা দেখলাম আমার বন্ধু শিশুতোষ দত্তের। আমরা ছিলাম তিন সিলেটী বন্ধু— শিশুতোষ, মোস্তাক ও আমি। মোস্তাক ও আমার কারণে শিশুতোষ নিজের সিট ছেড়ে দিয়ে মেইন বিল্ডিং-এর ৮৪নং রুমে চলে এসেছিল। আমি এগিয়ে গিয়ে ওর মৃতদেহটা ধরে এনে লাশের স্তূপে রাখলাম। ওর গায়ের জামাটা রক্তে লাল হয়েছিল। এ সময় পাশেই দেখলাম আমাদের সাথে ধরা পড়ার সময় যারা বিহারী দাবি করেছিল, তাদের লাশগুলো। বুঝতে পারলাম ওদেরকে দিয়ে মৃতদেহ বহন করিয়ে তারপর মারা হয়েছে।

আমাদের ৬/৭ জনের গ্রুপটাকে মারার জন্য আর্মির লোকরা জগন্নাথ হলের শহীদ

মিনারের কাছে দাঁড় করাল। তখন প্রায় ভোর হয়। ওদের সমস্ত অপারেশন শেষ হয়ে গেছে। আমরাই ছিলাম সর্বশেষ ব্যাচ। আমার সাথে এ ব্যাচে ছিল সুভাষ ও শিবু।

আমাদের ঠিক পূর্বদিকে মেইন রোডের কাছে দেয়ালটা ভাঙা ছিল। ওখান দিয়ে ছাত্ররা যাতায়াত করত। এখানে দেখলাম কিছু আর্মি চা খাচ্ছে খোশমেজাজে। ফাঁকা দিয়ে দু'একটা আর্মি কনভয় চলতে দেখা যাচ্ছে। হয়ত তারা ঢাকা শহরের অপারেশন শেষ করে ক্যান্টনমেন্টের দিকে যাচ্ছে।

আমাদেরকে দাঁড় করাল উত্তর দিকে মুখ করিয়ে। উত্তর-দক্ষিণ লাইনটার পিছন দিকটা বেঁকে ছিল পুকুরের দিকে। ১০/১২ হাত সামনে একজন সৈন্য তার মেশিন গানটা উঁচিয়ে ধরল গুলি করার জন্য। তার পিছনে বসা অফিসারটির নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছিল।

হঠাৎ অফিসারটি নির্দেশ দিল মেশিন গান নামিয়ে ফেলার। কারণ তখন লাইনের ঠিক পিছনে পুকুর থেকে একজন অফিসার হাত মুছতে মুছতে এদিকে আসছিল। আমাদের উপর গুলি চালালে হয়ত সেও মারা পড়ত।

আমি ছিলাম লাইনের ঠিক মাঝখানে। নিজেকে লুকানোর সুযোগ খুঁজছিলাম। সুভাষ তখন আমাকে বলল, 'বেঁচে থেকে আর কি হবে, ওরা ডঃ জি সি দেবকেও মেরে ফেলেছে।'

যা হোক, অফিসারটি থামার নির্দেশ দেয়ার পর সিপাহিটা হাতের মেশিন গানটাকে পিছন দিকে ঠেকিয়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। পকেট থেকে দুটো সিগারেটের প্যাকেট বের করল। আমার পরিষ্কার মনে আছে একটা গোল্ড লিফ, আর একটা কিং স্টর্ক-এর। অপারেশনের সময় ওরা স্যারদের বাড়ি লুটপাটও করেছিল। সম্ভবতঃ ওই সিগারেট ওখান থেকে নিয়ে এসেছিল। সিপাহিটা পিছন দিক থেকে আসা অফিসারটির দিকে কিং স্টর্ক-এর প্যাকেটটা ছুঁড়ে দিল। আর হাতের গোল্ড লিফ এর প্যাকেট থেকে একটা স্টিক বের করে আরামসে টানছিল অন্যমনস্কভাবে। আমি তখন ক্লান্তিতে বসেছিলাম। হঠাৎ দেখলাম কমান্ডিং অফিসারটি পিছন ফিরেছে অর্থাৎ পূর্বদিকে কি যেন দেখছিল। একটু এগিয়ে গেল চলে যাওয়া সৈন্যদের দিকে। অমনি আমি বসা থেকে স্লিপ করে শুয়ে গেলাম লাশের মধ্যে। আমি যে লাশটার উপর শুলাম ওটা ছিল জগন্নাথ হলের এক গার্ডের। তার দেহ থেকে সাংঘাতিক ভাবে রক্ত বেরুচ্ছিল। আমার পুরো মুখে ও শরীরে বিভিন্ন অংশে রক্ত ভরে গেল। এ কারণে বোঝা যাচ্ছিল না আমি জীবিত না মৃত। হঠাৎ ব্রাশ ফায়ারের শব্দ। আমার উপর কয়েকটা মৃত দেহ ছিটকে পড়ল। এর পরেও তারা বেছে বেছে কয়েকটা দেহের উপর গুলি করল। তখনও আমি বেঁচে গেলাম।

বেশ কিছুক্ষণ শুয়েছিলাম মৃতের স্তূপের ভিতর। শুনতে পাচ্ছিলাম আর্মিরা তাদের হত্যাযজ্ঞ শেষ করে দিনের আলো ফোটার আগেই ব্যারাকে রওনা দিয়েছে। ওরা চলে যাওয়ার ৫/৭ মিনিট পর পর্যন্ত শুয়ে ছিলাম।

মাথা উঁচু করে দেখে নিলাম সবাই চলে গেছে কিনা। কোন আর্মি দেখলাম না। হঠাৎ টিন শেড বিল্ডিংটাতে প্রচণ্ড জোরে অনেকের এক সঙ্গে কান্নার শব্দ শুনলাম। মহিলা বাচ্চা সবাই দৌড় দিয়েছে এদিকে কাঁদতে কাঁদতে। কারো হাতে জগ, কারো

হাতে গ্লাস, ঘড়া বা অন্যকিছু। ওদের অনেকেরই প্রিয়জনের লাশ পড়েছিল এ লাশের ভীড়ে। হয়ত আশাও ছিল— কেউ না কেউ বেঁচে আছে। ওদের আসা দেখে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত হলাম যে, আর্মি চলে গেছে। ওরা এসে কারো কারো মুখে পানির ঝাপটা দিচ্ছে। হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে দৌড়ছিলাম উত্তরের গেটের দিকে। ঠিক এ সময় মৃতের স্তূপ থেকে উঠে দৌড় দিল আর একটা ছেলে। ছেলেরাটার বাড়ি পরে শুনেছি, বাজিতপুরে। সে ছাত্র নয়, এমনিতেই হলে থাকত।

আমি জগন্নাথ হলের সীমানা পেরিয়ে ওপারে একটা কোয়ার্টারে উঠলাম, সঙ্গে বাজিতপুরের ঐ ছেলেটি। বেশ কয়েকটা দরজা নক করলাম। কেউ খুলল না। আমি ছাদে উঠে পড়লাম। দেখলাম মাথার উপর একটা হেলিকপ্টার চক্কর দিচ্ছে। কিছুক্ষণ পর একটা ছেলে এক জগ পানি নিয়ে দৌড়ে এল। বলল, 'আমি আপনার কথা শুনতে পাচ্ছিলাম কিন্তু দরজা খুলতে পারছিলাম না। আমাকে খুলতে দিচ্ছিল না। আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল আপনাদের দেখতে।'

ছেলেটা আমাদের পানি খাওয়াল এবং বলল, আমি কী করব আপনাদের জন্য? আমি তো বেশি কিছু পারব না। এখানেই থাকেন দেখি কি করা যায়।'

ঘন্টা খানেক থাকার পর আমি নিচে নেমে এলাম। দোতলা, কি তিন তলার একটা রুমে ঢুকলাম। এক ভদ্রলোক ছিলেন, ওনার পরিবার ছিল। সবাইকে দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ৭ই মার্চের পর এরকম বেশির ভাগ লোকই তাদের পরিবারকে গ্রামে পাঠিয়েছিল। ঢাকা শহর প্রায় খালিই হয়ে গিয়েছিল।

যা হোক উনি আমাকে বসতে দিলেন। আমার লুঙ্গি গেঞ্জি তখন রক্তে রঞ্জিত।

উনি আমাকে বললেন, 'আপনার লুঙ্গি গেঞ্জি রক্তমাখা। ওগুলো বড় প্রমাণ। তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকুন।'

বাথরুমে ঢুকে আমি বাংলা সাবান দিয়ে ভাল করে কাপড় চোপড় ধুলাম। নিজেকে পরিষ্কার করলাম। এরপর ধুয়ে ওই ভেজা কাপড়ই পরে নিলাম।

ভদ্রলোক বললেন, 'আপনাদের তো এখানে থাকা নিরাপদ নয়, অন্য জায়গায় যেতে হবে।'

তিন/চার ঘন্টা পর উনি ভিতর দিকে আর একটা বিল্ডিং-এ নিয়ে গেলেন, আমাকে এবং বাজিতপুরের ওই ছেলেটাকে। ওই বিল্ডিং-এ ওঠার সময় দেখলাম সিড়িতে রক্তের দাগ। হয়ত এখানে অপারেশন করা হয়েছে অথবা কোন আহত ব্যক্তি আশ্রয় নিয়েছে।

ভদ্রলোক আমাদের জন্য ওখানটা নিরাপদ মনে না করে আবার নেমে এলেন, অন্য একটা বিল্ডিং-এ নিয়ে গেলেন। ওই বাসা থেকে হলের মাঠটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। দুপুর বেলার দিকে আর্মিরা একটা টুপিওয়ালা মোল্লাকে নিয়ে এল। দেখে গেল লাশগুলো। একটা মৃতদেহও কেউ সরায়নি। ২৬ তারিখ বিকালের দিকে আর্মিরা বুলডোজার নিয়ে এল। লাশের স্তুপের ওপর দিয়ে বুলডোজার চালাল যেভাবে জমি চাষ করে— ঠিক সেভাবে। মনে হচ্ছিল যেন লাশের চাষ করছে, বর্বর অমানুষগুলো। কিছুক্ষণ চালিয়ে লাশগুলো মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে চলে গেল। কী অমানবিক দৃশ্য— চিন্তাই করা যায় না!

" পরদিন সকালে কারফিউ তুলে নিলে মাঠে নামলাম। দেখলাম কারো হাত কারো পা বেরিয়ে আছে মাটির উপরে। অনেক খানি জায়গা জুড়ে ৫০/৬০টা মানব সন্তানের দেহ যেন চাষ করেছে নরপশুগুলো। সেই বীভৎস নারকীয় দৃশ্যের কথা ভাবলে এখনও গা শিউরে ওঠে। মানুষের এই নৃশংসতার কথা তো কোন দিন শুনিনি। মানুষকে পাখির মত গুলি করে মারতেও তো কোন দিন দেখিনি। ইতিহাসে পড়েছি হালাকু খান, চেঙ্গিস খানের কথা, কিন্তু বাস্তবে তা ঘটতে পারে এই সভ্য পৃথিবীতে এবং আমাকে তা দেখতে হতে পারে কোন দিন এমন কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। "

ঠিক এ সময় দেখলাম আমার বন্ধু মোস্তাক কালীবাড়ির দিক থেকে এদিকে আসছে। আমাকে খুঁজছে। এতক্ষণ পর্যন্ত আমি জানতে পারিনি সে বেঁচে আছে কিনা। মোস্তাক আমি আর শিশুতোষ ছিলাম খুব ছোট বেলার বন্ধু।

মোস্তাক আর আমি যখন ওই বধ্যভূমি দেখছি এমন সময় পুকুরের দিক থেকে সুরেশকে আসতে দেখলাম। ওর কাঁধে কাপড় দিয়ে বাঁধা।

সুরেশ বলল, আর্মিরা ছাদের উপর লাইনে দাঁড় করিয়ে তাকেও গুলি করেছিল কিন্তু বেঁটে হওয়ায় তার কাঁধে গুলি লেগেছিল এবং মৃতের ভান করে লাশের মধ্যে শুয়েছিল।

আমি, সুরেশ ও মোস্তাক টিন শেডের কাছের এক ছোট্ট দোকান থেকে মুড়ি কিনলাম। তিন জন হেঁটে হেঁটে ঢাকা মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত গেলাম। সুরেশের চিকিৎসার দরকার ছিল, ওকে ওখানে ভর্তি করে মোস্তাক আর আমি সিলেটের পথে রওনা হলাম। যাওয়ার পথে কার্জন হলের কাছে দেখি আনোয়ার জাহিদ উঁকি দিয়ে কয়েকটা লাশ দেখছে। বায়তুল মোকাররম পার হওয়ার সময়ও দেখেছি লাশ। অনেক জায়গায় নিরীহ মানুষের লাশ আর ঘর মুখো মানুষের স্রোত দেখতে দেখতে মাতুয়াইল এলাম হেঁটে। ওখানে আমার এক কলিগ বজলুর বাসায়। ওখানে দুইদিন পর ভাত খাওয়াল। বিকালে কিছু টাকা দিয়ে ও ডেমরা পার করে দিল।

তারপর সিলেট ফেরার রাস্তায় দেখেছি মানুষের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধের জোয়ার। তখনও বাংলাদেশের মানচিত্রওয়ালা পতাকা উড়ছে।

সাক্ষাৎকার ঃ রুহুল মতিন

‘যে দিকে তাকাই সে দিকেই বিভীষিকার চিহ্ন’

প্রতীতি দেবী

’৪৮-এ পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য কুমিল্লার ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত, পরিষদের অধিবেশনে প্রথম দাবি জানিয়েছিলেন বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য। উপমহাদেশের বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনেও যার ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জল। কুমিল্লায় প্রথম সুযোগে পাকিস্তানিরা তাকে গ্রেফতার করে এবং নির্মমভাবে নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করে। তাঁর পুত্রবধূ প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁর গ্রেফতার এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নিষ্ঠুরতার। তাঁর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত এ জবান বন্দি ধারণ করা হয়েছে ২৭ সেপ্টেম্বর ’৯৯ তারিখে।

---

২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বর হত্যাযজ্ঞ আরম্ভ হওয়ার পাশাপাশি কুমিল্লা শহরেও প্রচণ্ড গোলাগুলি শুরু হয়েছিল পুলিশ লাইনের দিক থেকে। ক্রমে তা ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত শহরে। আমার শ্বশুর ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত পূর্ববঙ্গের বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা হওয়ায় সমস্ত আশঙ্কা আমাদের পেয়ে বসল। আমরা অপেক্ষা করছিলাম ভয়াবহ পরিণতির জন্য। কয়েক দিন আগে থেকেই পারিবারিক অনেক বন্ধুই শ্বশুর মশাইকে সরে যেতে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি রাজী হননি। বলেছিলেন, আমি গেলে এখানকার সহজ-সরল মানুষগুলোকে ওরা নির্বিচারে হত্যা করবে।

রাত ভর গুলি চলল। ২৬শে মার্চ পাকিস্তানিরা কুমিল্লার ডিসি ও এসপিকে হত্যা করল। সারা শহরে কারফিউ। লোকজনের চলাচল চোখে পড়ছে না। বাইরে কি ঘটছে তাও বোঝা যাচ্ছে না। বলা প্রয়োজন, আমাদের বাড়িটা ছিল শহরের পশ্চিম দিকে ধর্মসাগর এলাকায়। জেলখানা, বড় অফিস আদালত, কাছারি, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাড়ি সব এ এলাকাতে। এসব কারণে এলাকাটির মর্যাদাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ২৭শে মার্চ বিকেলের দিকে ঘন্টা খানেকের জন্যে কারফিউ তোলা হল।

আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে চলে গেছে সোনামুড়া সীমান্তের রাস্তা। অসংখ্য ভীত সন্ত্রস্ত আবালবৃদ্ধবণিতার ঢল দেখলাম সীমান্তের দিকে। আমার বাসার ছয় জন কাজের লোকের ভেতর তিন জনকে গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি। শুধু দশ বছরের সাদেক সহ আরও দু'জন কাজের লোককে রেখে দিয়েছিলাম।

আমার শ্বশুর কিছুতেই ঘর ছাড়েননি। বাসায় উনি, আমার দেবর দিলীপ দত্ত, কন্যা অ্যারোমা, শিশু পুত্র রাহুল আর আমি। বাইরে দোকানপাট বন্ধ থাকায়, কারফিউ ভাঙার পর আশে পাশের মানুষ এসে আমাদের বাড়ি থেকে চাল ডাল নিয়ে গেল।

২৮ তারিখে ঘটল এক ভয়াবহ ঘটনা। দেখলাম সকাল বেলা কয়েকটা ট্রাকে লাশ বোঝাই করে এনে ফেলল ফয়জুন্নেসা গার্লস হাই স্কুল মাঠে। এর মধ্যে কিছু ছিল অর্ধমৃত। বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যরা পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে ফেলল সমস্ত লাশ। সম্ভবতঃ ওগুলো শহরতলি অথবা গ্রাম থেকে এনেছিল। ২৯ তারিখ রাত দশটার দিকে বাইরে প্রচণ্ড শব্দ হল। আমাদের বাড়িটা কেঁপে উঠল। শব্দের তীব্রতায় বোঝা যাচ্ছিল কাছাকাছি কোথাও ঘটনাটি ঘটেছে। পরে শুনেছি বাচ্চু কাকার (আওয়ামী লীগ নেতা জহিরুল কাইয়ুম) বাড়িতে আক্রমণ হয়েছে।

কারফিউর মধ্যে সমস্ত শহরে গোলাগুলি ও বিস্ফোরণের শব্দ। খুবই অস্থির লাগছিল। একবার বাবার ঘরে যাচ্ছি, আবার এসে নিজের ঘরে বসছি। বাবাকেও বেশ উদ্ভ্রান্ত দেখাচ্ছিল। ওঁর ব্লাড প্রেসার বেড়ে গেছে। মেপে দেখলাম ২৬৬। মাথা ধুয়ে দিয়ে ওষুধ খাইয়ে দিলাম। বললাম আবার পরে এসে দেখে যাব। কারো চোখে ঘুম নেই।

রাত দেড়টার সময় বাড়ির বাইরে প্রচণ্ড গুলির শব্দ। এত গুলির শব্দ যে কান পাতা দায়। বাবার রুম থেকে আমার নিজের ঘরে এসে বিছানায় বসেছি। অমনি বাইরে কলিং বেল বেজে উঠল। আমার সমবয়সী দেবর দিলীপ ছুটে এসে বলল, 'এখন কি করব?'

আমি বললাম, 'খুলতে তো হবেই।'

আমি উঠতে চাইলাম। কিন্তু তার আগে ও দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল। সাথে সাথে কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা তার বুকে বেয়োনেট চেপে ধরল। অতর্কিত সবাই ঘরে ঢুকে পড়ল। দিলীপকে নিয়ে গেল বাবার চেম্বার রুমটাতে। শ্বশুর মশাইকে তাঁর বেড রুম থেকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল ওখানে। পাশের ঘরে অ্যারোমা ও রাহুল। ছোট রাহুলকেও ধরে নিয়ে গেল চেম্বারে। আমি বেরুতে চাইলাম। তরুণ বয়সী এক বেলুচ ক্যাপ্টেন লম্বা টর্চ হাতে পথ আগলে দাঁড়াল। এ্যারোমার রুম থেকেও চিৎকার। পুরো বাড়িটা যেন এক বিভীষিকা ক্ষেত্র।

দরজা খোলার পর থেকে গুলির আওয়াজ ছাড়া আমি আর কিছু শুনছি না। মনে হচ্ছিল কয়েক হাজার আর্মি পুরো বাড়িটায়। রুমগুলোতে তিল ধারণের ঠাঁই নেই। একটানা গুলির শব্দ। সাথে কাঁচ ভাঙার ঝনঝন শব্দ। বোঝা যাচ্ছে বাবার রুমের ছবিগুলো গুলি করে ভাঙা হচ্ছে। বাবার চেম্বার থেকে রক্ত ভেসে আসছে। আমি অস্ফুট কণ্ঠ শুনছি 'আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও।' বুঝতে পারছি বেয়োনেট চার্জ করা হচ্ছে। জোর করে বেরুতে চাইলাম। বেলুচ ক্যাপ্টেনটি কোনভাবে বের হতে দিল না।

এ্যারোমার ঘরে সৈন্যরা খোঁজ করছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের। জিজ্ঞেস করলে এ্যারোমা উত্তর দিল সে ম্যাট্রিক দিয়েছে। বলা প্রয়োজন ক'দিন আগে এ্যারোমার সাথে গাড়িতে করে এলাকায় কিছু ছাত্রীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হল থেকে কুমিল্লা এনেছিলাম। এছাড়া ওদের টার্গেটও ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী এ্যারোমাকে ধরে নিয়ে যাওয়া। ওরা যখন এ্যারোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে আমার ঘরে জাঠ জাতীয় এক সৈন্য গলায় বন্দুক ঠেকিয়ে অদ্ভুত ভাষায় অনবরত কথা বলে যাচ্ছিল। আমি জোরে চিৎকার করছি। বেলুচ ছেলেটি নির্বিকার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। কাউকে এদিকে আসতেও দিচ্ছিল না, এদিক থেকে কাউকে যেতেও দিচ্ছিল না। ফলে কোন মেয়ে ভিতরে আছে কিনা দেখার জন্য কুমিল্লার জল্লাদ হিসাবে পরিচিত মেজর বোখারী গং তখন আসতে পারেনি। ঐ সৈন্যদের মধ্যে একজন কিছু উর্দু জানে। সে অনবরত প্রশ্ন করছিল, 'ঢাকা মে কৌন হ্যায়, জরুর হ্যায়' ইত্যাদি। অনভ্যাসে বিদ্যা নষ্ট হলেও আমি চিৎকার করে বলছি, 'ঢাকা মে কোই নেহী হ্যায় ...' ইত্যাদি। তখন যত জোরে চিৎকার করেছিলাম তেমন আর কখনো করতে পারব না। ওরা আসলে খুঁজছিল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী এ্যারোমাকে। অথচ তার আগেই পাশের ঘর থেকে আরেকজন এ্যারোমাকে—'আম্মিকা পাস যাও' বলে পাঠিয়ে দিল।

গুলির আওয়াজে ঝনঝন করে ভেঙে পড়ছিল ছবি ও জানালার কাঁচ। রক্ত ভেসে আসছিল ভেতরের ঘরগুলোতে। আমি বুঝে নিলাম কেউ আর বেঁচে নেই। রাহুলও বুঝি চলে গেল।

মোট এগার মিনিটের অপারেশন, এগার মিনিটের বিভীষিকা। ব্রিগেডিয়ার থেকে শুরু করে কর্ণেল পর্যন্ত সব শ্রেণীর আর্মি অফিসার এসেছিল। বাড়ির দু'দিকে স্টেনগান সেট করা। বাড়ির বাইরে রাস্তাটা পুরোটা ভরা আর্মির গাড়িতে। একটা এ্যাম্বুলেন্স এল সাইরেন বাজাতে বাজাতে। আমার শ্বশুর ও দিলীপকে নিয়ে গেল। রাহুলকে আমার কাছে ফেরৎ পাঠাল। রাহুল তখন কেবলই বলছে, 'কাকার মাথা ব্যাণ্ডেজ করে দাও।' সাংঘাতিকভাবে ভড়কে গিয়েছিল ও। ওই বর্বর অত্যাচার ও সহ্য করতে পারেনি। থেকে থেকে বেহুশ হয়ে যাচ্ছিল।

এ্যাম্বুলেন্স চলে যাওয়ার সাথে সাথে অফিসাররা বিভিন্ন দলে চলে গেল। সমস্ত বাসা আর্মি শূন্য হতে প্রায় ভোর হয়ে গেল। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আমার বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম। বুঝতে পারছিলাম না কি করব, কিভাবে করব। শেষ সৈন্যটি না যাওয়া পর্যন্ত বেলুচ ছেলেটি দাঁড়িয়ে থাকল দরজার সামনে। পরে বুঝেছি এই ছেলেটির জন্যই সেদিন এ্যারোমা আর আমি প্রাণে বেঁচেছি।

রক্তে ভাসছে গোটা বাড়ি। দু'দিন আগেও যে বাড়ি ছিল কোলাহলমুখর, এখন সেখানে সত্যিকার অর্থে মৃত্যুর নিরবতা। শুধু থেকে থেকে ভেসে আসছে এ্যারোমার গোঙানির আওয়াজ। আমি হতবুদ্ধি হয়ে বসে আছি, কোথায় যাব, কি করব কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।

বাবার ঘরে গেলাম। যে দিকে তাকাই সে দিকেই ফেলে যাওয়া বিভীষিকার চিহ্ন। মেঝেতে রক্ত। ছবিগুলো পড়ে আছে এলোমেলো। ছবি আর জানালার ভাঙা কাঁচের

টুকরো শক্ত হয়ে গেছে রক্তে। দেয়ালের যত্রতত্র গুলির চিহ্ন। অপারেশনের সময় সাদিক আমার ঘরে ছিল। ওই ছোট ছেলেটি দুধ গরম করে এ্যারোমা ও রাহুলকে খাইয়েছে। আমি ভাবছি, শ্বশুর দেবর দু'জনকে হারিয়েছি, এখন কিভাবে মেয়ে ও ছেলেটাকে বাঁচানো যায়, কিভাবে এখান থেকে পালানো যায়। কোন বুদ্ধিই কাজে আসছিল না। বাইরে কারফিউ। বাড়ির সামনে আর্মি গার্ড দিচ্ছে, রাস্তা দিয়ে টহল দিচ্ছে। আমি বাসার বাইরে না গিয়ে চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে ভেন্টিলেটার দিয়ে বাইরে দেখছি। হঠাৎ পেছনে স্নান ঘরের দরজায় টোকা দেয়ার শব্দ শুনলাম। ভাবলাম সৈন্যরা বোধহয় ফিরে এসেছে।

দরজা খুলে দেখি পাশের বাসার সিএন্ডবি'র সহৃদয় ভদ্রলোক রহমান সাহেব। চুপি চুপি এসেছেন আমাদের খোঁজ নিতে। আমি অবাক হলাম রহমান সাহেবের সাহস দেখে। বাড়ির চারপাশে আর্মি টহল দিচ্ছে, তার মাঝে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেয়াল টপকে এসেছেন আমাদের খোঁজ নিতে। জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কি করবেন বৌদি?'

আমি বললাম, 'আমাকে দু'টো বোরখা জোগাড় করে দিন, দেখি বের হতে পারি কি না।'

রহমান সাহেব বললেন, 'বাইরে তো কারফিউ চলছে। রাস্তা আর গেটের সামনে সৈন্যরা টহল দিচ্ছে। বোরখা পরে আপনি বের হতে পারবেন না।'

আমি বললাম, 'তাহলে আপনি কি বলেন?'

তিনি বললেন, '১১টার দিকে একবার কারফিউ তুলে নেবে, ঘন্টা খানেকের জন্যে। তখন আমি আর একবার আসব।' কারফিউ ভাঙা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলে রহমান সাহেব চলে গেলেন।

আমি নিজেও কিন্তু কয়েকবার পিছনের দেয়াল টপকে পালানোর কথা ভেবেছি। কিন্তু ঘর থেকে বের হব কি করে? সামনের দিক দিয়ে বেরুলে সৈন্যদের চোখে পড়ার ভয়। আর পিছনের দরজা? ওগুলো যে কত বছর খোলা হয় না কে জানে। স্বাভাবিকভাবে খুলতে গেলে জোরে শব্দ হবে। আর তখনই এসে পড়তে পারে গেটের সামনের সৈন্যরা।

যা হোক, এগারোটার দিকে আবারও স্নান ঘরের দরজায় টোকা দেয়ার শব্দ শুনতে পেলাম। ভয়ে ভয়ে খুলে দেখলাম রহমান সাহেব। অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে দরজা খুললাম। আমাকে বের হতে বলে উনি এ্যারোমা ও রাহুলকে নিয়ে এলেন পিছনের দেয়ালের কাছে। আমি দেয়াল টপকে কোন রকমে পার হলাম। রহমান সাহেব কিভাবে বাচ্চাদের পার করলেন বলতে পারব না।

রহমান সাহেবের বাড়িতে আসার পর তিনি বললেন, 'দিদি এখন কোথায় যাবেন? কারফিউ উঠলে তো ওরা এক্ষুণি চলে আসবে।'

বললাম, 'আগে দারোগা বাড়ি যাবো।'

এ্যারোমা আর আমি বোরখা পরে নিলাম। রহমান সাহেব নিলেন অসুস্থ রাহুলকে। বেরুনোর আগে বলে দিলেন, 'রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় পিছনে ফিরে তাকাবেন না, তাহলে সৈন্যরা সন্দেহ করবে।'

দারোগা বাড়ি যাওয়ার পথে আমাদের বাড়ির গেট। গেটের সামনে পৌঁছতেই মনটা কেঁদে উঠল। দেখলাম আমার শ্বশুরের একটা স্যাণ্ডেল পড়ে আছে গেটের সামনে। রক্তমাখা। পাশে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত জমে আছে। বাড়ির পোষা বিড়াল আর কুকুরটা স্যাণ্ডেল আর রক্ত সামনে নিয়ে কাঁদছে। এ্যারোমা আর আমার পা খালি। বাড়ি থেকে বেরুনোর সময় জুতো নেবার কথা মনে ছিল না, কোন রকমে প্রাণটা নিয়ে বেরিয়েছি।

রাস্তা দিয়ে খালি পায়ে হাঁটতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। ওভাবে কখনও হাঁটিনি তো। ক্ষত বিক্ষত পা দেখে রাস্তায় কিছু বয়স্ক লোককে বলতে শুনলাম, 'আহারে। কোন বড় বাড়ির মেয়েরা না জানি বিপদে পড়েছে।'

রাস্তাতে এ্যারোমা কাঁদছিল। ওর কান্না কিছুতেই থামাতে পারি না। বললাম, 'সারা জীবনই তো কাঁদতে হবে। এখন আর কাঁদিস নে। সৈন্যরা এসে ধরে নিয়ে যাবে।'

বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর দারোগা বাড়ি পৌঁছুলাম। বাড়িটা এত বড় যে, বাড়ি না বলে ছোট একটা পাড়া বলাই ভাল। দারোগা বাড়ির কামাল সাহেব বললেন, 'দিদি, আপনাদের এখানে থাকা একেবারেই নিরাপদ নয়। অন্য জায়গায় থাকতে হবে।' ওরাই সব ব্যবস্থা করল। রাহুলকে রাখল ওদের কাছেই। রহমান সাহেব ওর নাম দিলেন 'বাচ্চু মিয়া,' যাতে সহজে ওকে সনাক্ত করা না যায়।

আমি তখনও জানি না কোথায় নিয়ে যাবে, কার কাছে রাখবে আমাদের। তবে এটুকু শুনলাম তাদেরই এক নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে যেতে হবে। কিছুক্ষণ পর একজন লোক এসে এ্যারোমা আর আমাকে নিয়ে গেল। পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ। যে বাড়িতে পৌঁছলাম সেটা কামাল সাহেবের ভাগ্নে, আর্মি ডাক্তার ক্যাপ্টেন এসকান্দার আলী সাহেবের ভাড়া বাড়ি। তিনি চিটাগাং থেকে এসে আটকা পড়েছিলেন। পরিবারের সদস্যদের কোন খোঁজ খবর পাচ্ছিলেন না। মা, ভাই, বোন, বউ, দশ মাসের ছেলে ফেলে এসেছেন সেখানে। এসকান্দার রাহুলের শুশ্রূষার ব্যবস্থা নিলেন। এ্যারোমা তখনও স্বাভাবিক হয়নি। অঝোরে, ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে। এর মধ্যে এসকান্দার খবর পেলেন তার পরিবারের লোকজনকে চিটাগাং-এ আর্মিরা গুলি করে মেরেছে। এ্যারোমার কান্না দেখে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, 'তোমার তো অন্তত মা আছে; তুমি কেন কাঁদছ? আমি তো আমার সব হারিয়েছি।'

এ্যারোমা কিছুটা শান্ত হল। এই আর্মি ডাক্তারটি আমাদের জন্য কি যে করেছেন বলে বোঝানো যাবে না। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন। বাবুর্চিকে বাদ দিয়ে নিজের হাতে রান্না করে মেয়েকে খাইয়েছেন। আদর যত্ন করেছেন নিজের মেয়ের মত। প্রায় প্রতিদিন ক্যান্টনমেন্ট থেকে লোক আসত ওঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। আমাদেরকে লুকিয়ে রেখে ওদের সাথে কথা বলতেন। কখনও আমাদের সামনের ঘরে আসতে দিতেন না। তার কাজের জন্য এক পাঠান বাবুর্চীকে নিয়োগ করেছিলেন। এ পাঠান বাবুর্চিটিও এসকান্দারকে ও আমাদের বাঁচাতে অনেক সাহায্য করেছে। সেই আর্মিদের বোঝাতো— 'একে মেরে কোন লাভ নেই। তোমাদের চিকিৎসার জন্য তো ডাক্তার দরকার।'

যখন আর্মিরা আসত আমরা লুকিয়ে থাকতাম বাথরুমে, গোয়ালঘরে, রান্নাঘরে

অথবা বাগানের মধ্যে। কোন কারণে যদি জানতে পারে এসকান্দার আমাদের আশ্রয় দিয়েছে, তাহলে তো সবার মৃত্যু অবধারিত। এ বাসায় থাকার সময় আমার কাজের ছেলে সাদেক মাঝে মাঝে আসত কাপড় চোপড়, চাল ডাল নিয়ে। প্রতিদিন কি ঘটছে, কারা যাচ্ছে বাড়িতে, কোন এলাকায় কি ঘটছে আমাদের জানাত। বলত, আজ আর্মিরা এখানে এতজনকে মেরেছে, স্কুল মাঠে নিয়ে এতগুলো লাশ পুড়িয়েছে, ওমুক লোকের বাড়িতে আগুন দিয়েছে, ওমুক লোককে ধরে নিয়ে গেছে, সীমান্তের দিকে প্রতিদিন কেমনভাবে মানুষ চলে যাচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি। ভিতরে ভিতরে আমি সাংঘাতিক অস্থির হয়ে উঠছিলাম। শ্বশুর-দেবরকে হারিয়েছি, ছেলেটাও সাংঘাতিক অসুস্থ। খবর পাচ্ছি এখনও মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। এ্যারোমাও অস্বাভাবিক। এ সময় প্রতিদিন লুকিয়ে লুকিয়ে রেডিও অষ্ট্রেলিয়া আর অল ইণ্ডিয়া রেডিওর নিউজ শুনতাম।

এপ্রিল মাসের শেষ দিকে খবর পেলাম আর্মিরা আমাদের হন্যে হয়ে খুঁজছে। অনেক টাকার পুরস্কারও ঘোষণা করেছে। আমি এ অবস্থায় এসকান্দারকে আর বিপদে ফেলতে চাইলাম না। বললাম, 'আমার জন্য একটি ঘর ভাড়া করে দিন।' ৩০শে এপ্রিল পাঠান বাবুর্চি বলল, 'কাল এ বাড়ি অপারেশান হতে পারে।' এসকান্দারকে বললাম, 'আমাদের অন্য কোথাও পৌছে দিন।'

রাতের অন্ধকারে এ্যারোমা আর আমাকে নিয়ে যাওয়া হল অন্য একটা বাড়িতে। কোথায় কোন বাড়ি কিছু জানি না। বাগানের ভিতর দিয়ে, আনাচ কানাচ ঘুরে এ বাড়িতে পৌছুতে প্রায় ১০/১৫ মিনিট লেগেছিল— এটুকু মনে আছে। বাড়িটি একতলা। এখানে এসে আরেক বিপদে পড়লাম। বাড়ির সবাই সন্দেহের চোখে তাকাল। নানা রকম প্রশ্ন করতে শুরু করল— আমরা কারা? কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যাব ইত্যাদি। এ যেন বিপদের মধ্যে মহা বিপদ। কোন প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললাম, 'রাতটুকু থাকতে দিন। ভোর হলেই চলে যাব।'

২ এপ্রিল সকাল বেলা কামাল সাহেবের বাড়িতে গেলাম। রেডিও খুলে আকাশবাণীর সংবাদে শুনি দিল্লীর পার্লামেন্টে ধীরেন দত্তের স্মরণে শোক প্রস্তাব উত্থাপিত হবে। বুঝে নিলাম আর এক মুহূর্ত এখানে থাকা নিরাপদ নয়। অবশ্য এরই ভেতর ধীরেন বাবুর পরিবারে সন্ধানে বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত মুসলিম বাড়িতে হানা দেয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। সম্ভবতঃ ওরা আমাদের খুঁজছিল স্বীকারোক্তি নেয়ার জন্য যে— আমরা সবাই ভাল আছি। কারণ তারা বহির্বিশ্বকে জানাতে চায় নি এখানে কী ধরনের বর্বরতা চলছে। বলা প্রয়োজন, ইতিপূর্বে পাকিস্তান রেডিও থেকেও প্রচার করা হয়েছিল ধীরেন বাবুর মৃত্যুর সংবাদ। সেখানে বলা হয়েছিল তিনি হার্ট এ্যাটাকে মারা গেছেন। আমার মনে হয় অপারেশনের পর যখন ওদের নিয়ে যাওয়া হয় তখনই দীলিপ মারা গেছে। ধীরেনবাবু তখন মারা না গেলেও এই অমানুষিক নির্যাতনের পর তাঁর বেশীক্ষণ বেঁচে থাকার কথা নয়। আমাদের এখানকার এক নাপিত রমণীমোহন শীল, তাকেও ক্যান্টনমেন্ট-এ ধরে নিয়ে গিয়েছিল। সে ধীরেন বাবু সম্পর্কে বলেছে যে, সে নাকি ধীরেন বাবু ও তাঁর ছেলেকে ক্যান্টনমেন্ট-এ সাংঘাতিকভাবে নির্যাতিত হতে দেখেছে।

৫/৬ দিন নির্যাতন চালানোর পর তাদের মেরে ফেলা হয়। সে নাকি তাদের কবর পর্যন্ত দিতে দেখেছে।

যা হোক, ২ মে ওই সংবাদ শোনার পর দারোগা বাড়ির অন্য সবাই মুহূর্ত দেরি না করে আমাদের সীমান্তের ওপারে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল এ বিপদসংকুল পথে, এত বড় ঝুঁকি নিয়ে কে নিয়ে যাবে। অবশেষে কামাল সাহেব রাজী করালেন তারই আপন চাচাত ভাই সৈয়দ মিয়াকে।

বেলা সাড়ে বারোটার দিকে সৈয়দ মিয়া দারোগা বাড়ির রিক্সাওয়ালাকে নিয়ে আমাদের নিয়ে রওনা হলেন সোনামুড়া সীমান্তের দিকে। বিদায়ের সময় এসকান্দার ও দারোগা বাড়ির পরম আত্মীয়র মতো মানুষের কান্না এখন আমার দৃশ্যপটে ভেসে রয়েছে। রিক্সা এগিয়ে চলেছে থানার পাশ দিয়ে গোমতী নদীর দিকে। সামনে সম্পূর্ণ অজানা পথ। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর নিরব হাতছানি। মুহুর্মুহু গুলি ছুটে আসছে দূরের ক্যান্টনমেন্ট থেকে। আমাদের মত অনেক রিক্সাই গোমতিমুখী— সবাই সীমান্তের দিকে এগুচ্ছে। যাওয়ার সময় রাস্তার দু'পাশে দেখেছি অসংখ্য নারী পুরুষ ও শিশুর লাশ। আশে পাশের বাড়ি ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আমাদের পিছনের অনেক রিক্সা উড়ে গেছে গোলার আঘাতে। বুঝতে পারছিলাম না গোমতি পার হবার ভাগ্য আমাদের হবে কিনা। সাথে জ্ঞানহীন রাহুল। সামনে নিরবিচ্ছিন্ন শূন্যতা। এমন পথে চলেছি যার কোন কিছুই আমি জানি না।

গোমতী পার হয়ে যখন বাঁধের উপর উঠলাম তখন সৈয়দ মিয়া বলল, 'মা-জী আমরা এখন মুক্ত। আর কোন ভয় নেই। এখানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গুলি আসবে না।'

বাঁধের উপর দিয়ে যাওয়ার সময়ও দেখলাম পাকিস্তানি সৈন্যদের বর্বরতার চিহ্ন— বাড়ি ঘর পোড়া। তখনও দূর থেকে ভেসে আসছে গুলির আওয়াজ। সন্ধ্যার আগে আমরা পৌঁছে গেলাম সোনামুড়া সীমান্তে। সীমান্ত অতিক্রম করতে যাব এমন সময় দেখলাম ওপাশে কনভয় থেকে একদল সৈন্য লাফিয়ে পড়ল। দেখে বোঝা গেল গুর্খা সৈন্য। তখন আমার মনে হল আমার কাছে তো পাসপোর্ট নেই। অবৈধভাবে অতিক্রম করছি। আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। নিজের পরিচয় দিলাম এবং বললাম, 'আমি কিভাবে যাব? আমার কাছে তো বৈধ কাগজ নেই।'

তারা বলল, 'এসবের দরকার নেই। আমাদের সাথে চলুন।' তারা নিয়ে গেল সোনামুড়া থানায়।

তারপর শুরু হল নতুন অধ্যায়। পিছনে পড়ে রইল আমার চিরদিনের শান্তির আশ্রয়।

সাক্ষাৎকার ঃ রুহুল মতিন

কথা বের করার জন্য আঙুলের মাথায় ছুরি ঢুকিয়ে নখ উপড়ে ফেলছিল

সঙ্গীতশিল্পী লিনু বিল্লাহ

'৭১-এ ঢাকায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সবচেয়ে বড় নির্যাতন কেন্দ্র ছিল নাখালপাড়া এমপি হোস্টেল, যেখানে নৃশংসতম অত্যাচার চালিয়ে হত্যা করা হয়েছিল প্রখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক আলতাফ মাহমুদসহ আরো অনেককে। আলতাফ মাহমুদের আত্মীয় সঙ্গীতশিল্পী লিনু বিল্লাহকেও তার সঙ্গে গ্রেফতার করে আনা হয়েছিল এ নির্যাতন কেন্দ্রে। এ নির্যাতনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন লিনু বিল্লাহ তার জবানবন্দিতে। যা ধারণ করা হয়েছে ২৩ সেপ্টেম্বর '৯৯ তারিখে।

৩০শে আগস্ট, ভোর সাড়ে পাঁচটা কি ছ'টা। ছোটবোন শিমুলের চিৎকারে বাসার সবাই জেগে উঠলাম। দৌড়ে গেলাম ওর রুমে। দেখি কালো পোষাকধারী পাকিস্তানি আর্মি ওর গলায় রাইফেল তাক করে আছে। বাসার পিছন দিকে রান্না ঘরের খোলা দরজা দিয়ে ঢুকেছে আর্মিরা। তখন শিমুল গানের রেওয়াজ করছিল।

একজন ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস করল, 'আলতাফ মাহমুদ কৌন হ্যায়?'

আলতাফ ভাই এগিয়ে এসে বললেন। 'আমিই আলতাফ মাহমুদ।'

'মাল কাহা?' জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্টেন।

'জানি না' — আলতাফ ভাইয়ের দৃঢ় জবাব। অমনি রাইফেলের বাট দিয়ে সজোরে আঘাত করল তার পেটে। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেলেন। নাক দিয়ে রক্ত ঝরল। এর পর আলতাফ ভাইকে দিয়ে পাশের বাড়ির পিছনে টিউবওয়েলের কাছ থেকে অস্ত্রের বাক্স তুলল।

ওখান থেকে শুরু হয় মূলতঃ অনানুষ্ঠানিক অত্যাচার। আমাদেরকে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের সামনের বাসা থেকে এমপি হোস্টেলে নেওয়ার আগে শুরু হয় এক দফা

অত্যাচার। কিভাবে এমপি হোস্টেলে পৌঁছুলাম ঠিক বলতে পারব না। হোস্টেলের সামনে গাড়ি থামতেই পাকিস্তানি সৈন্যরা আমাদের দেখে উল্লাস করা শুরু করল। যেন তাদের জন্য আহার এসেছে। রাস্তার উপর থেকেই শুরু হয় আলতাফ ভাই-এর উপর অত্যাচার। কিছুদূর হাঁটিয়ে নিয়ে আমাদের এক সারিতে দাঁড় করানো হল। পরে নেয়া হল ছোট এক রান্না ঘরে। আরো অনেকে ছিল এখানে। সকাল আটটার দিকে এ ঘর থেকে বের করে নাম লিখে নিল। শুরু হয় আনুষ্ঠানিকভাবে অত্যাচার। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পাকিস্তান আর্মির একটি দল পাশের রুমে নিয়ে অত্যাচার শুরু করল। টর্চারিং রুমে নেয়ার আগেই আমি শুনতে পাচ্ছিলাম অন্যদের অত্যাচারের শব্দ, চিৎকার ও গোঙানি। বিশ মিনিট থেকে আধাঘন্টা অত্যাচারের পর ফেরৎ পাঠানো হচ্ছে রান্নাঘরে।

প্রথম দিন টর্চার গ্রুপের দলনেতা ছিল সুবেদার মেজর সফিন গুল। তার নেতৃত্বেই পরিচালিত হত নানা প্রক্রিয়ায় অত্যাচার। আলতাফ ভাইকে প্রথমে একটা রুমে নিয়ে নির্মমভাবে অত্যাচার করতে থাকে। কিছুক্ষণ পর পর তাঁর তীব্র চিৎকার শুনতে পাচ্ছিলাম। আরো কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার তীব্র আর্তনাদ ভেসে আসছিল অন্য রুম থেকে। আমাদের যে রান্নাঘরে বন্দী করে রেখেছিল, তার দরজাটা একটু ফাঁক হতেই দেখি বিকৃত অবস্থায় একজনকে। ডান চোখ প্রায় বেরিয়ে এসেছে। বাঁ চোখ ফেটে রক্ত বেরুচ্ছে। মুখটা ফুলে, ঝুলে গেছে অস্বাভাবিক ভাবে। চিৎকার করছে। বার বার বলছে 'মুঝে গুলি মার দো, লেকিন মাত মারো।' গলার আওয়াজ কেমন যেন পরিচিত মনে হল। অনেকক্ষণ পর চিনতে পারলাম, হাফিজ ভাই। পুরো নাম হাফিজুর রহমান। আলতাফ ভাই-এর একজন সহকারী সঙ্গীত পরিচালক। অনেকগুলো যন্ত্র সঙ্গীত বাজাতে পারতেন তিনি।

একসময় আমার ডাক পড়ল। ভিতরে ঢুকে দেখলাম ৫/৬ জনের একটি দল। সফিন গুল আমাকে জিজ্ঞেস করল 'কৌন হ্যায় তোমারা সাথ? আওর মাল কাঁহা?'

আমি বললাম, 'আমি কিছু জানি না।' তখন নর পিশাচগুলো আমাকে উপুড় করে শোয়াল। দু'হাত প্রসারিত করে দু'জনে উঠে দাঁড়াল। আরো দু'জন দু'পায়ের উপর দাঁড়াল। সামনের দিকে ঘাড়ের উপর পা দিয়ে চেপে ধরল অন্যজন। শুরু হল পৈশাচিক নির্যাতন। কাঁধ থেকে শুরু করে হাঁটুর নিচের মাংশপেশী পর্যন্ত কসাই-এর মাংস কোপানোর স্টাইলে পেটাল। এটা ছিল ওদের রুটিন অত্যাচার। সবার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে যারা শুরু থেকেই নিজেদের নির্দোষ দাবী করছিল, তাদের জন্য এটা ছিল কমন শাস্তি।

যা হোক, প্রায় পনের মিনিট চলল এভাবে। আমার পিঠ ও পায়ের পেশী ফেটে রক্ত বেরুচ্ছে। পরনের কাপড় ভিজে গেছে। আমাকে নির্যাতনের সময় বারান্দায় ও অন্য রুমে অন্যদের নির্যাতন করা হচ্ছিল। চিৎকার শুনে বুঝতে পারছিলাম অত্যাচারের মাত্রা। ওদের তুলনায় আমার শাস্তি কমই হল মনে হল। ২০ থেকে ২৫ মিনিট পর তারা আমাকে রান্না ঘরে ফেরৎ পাঠাল। নিয়ে গেল অন্যজনকে। এভাবে পালাক্রমে চলতে থাকল অত্যাচার। টর্চার সেল থেকে পাঠানোর পর অন্য বন্দীরা শুশ্রুষা করছে। ট্যাপের পানি দিয়ে মুখ, ঘাড়, রক্ত মুছিয়ে দিচ্ছে। যারা জ্ঞান হারাচ্ছে তাদেরকে মুখে পানির ছিটা দিয়ে, গায়ের রক্তমাখা জামা দিয়ে বাতাস করে হুঁশ ফিরাচ্ছে। নরপিশাচগুলো আমার বড় ভাইকে অত্যাচার করে নির্মমভাবে। সকাল ১০টার পর আলতাফ ভাইকে কোথায় নিয়ে অত্যাচার করল ঠিক

বুঝতে পারলাম না। শুধু চারদিকে আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছিলাম।

এরই মধ্যে আমাদের কক্ষে দু'জন সুদর্শন পুরুষের দেখা পেলাম। তাদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার হয়েছে বোঝা যায়। নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে। ঠোঁট, মুখ ফুলে গেছে। কোথাও ফেটে রক্ত বের হচ্ছে। পরনের কাপড় রক্তে রঞ্জিত। এদের মধ্যে বয়স্ক জন দেয়ালে মাথা রেখে আমাদের চার ভাই ও আলভীর দিকে তাকাচ্ছিলেন বারবার। এত অত্যাচারের পরও তাঁর ঠোঁটের কোণায় মৃদু হাসি। তিনি ছিলেন জাহানারা ইমামের স্বামী শরীফ ইমাম ও অন্য অল্প বয়সীটি ছোট ছেলে জামী। শরীফ ইমাম সাহেব ইশারায় আমাদের শব্দ না করার জন্য বলছিলেন। কারণ যারা শব্দ বা কান্নাকাটি করে, তাদের উপর অত্যাচারের মাত্রা বহুগুণ বেড়ে যায়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে শরীফ ইমামের পরিবারের সাথে আমাদের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে যায়, যদিও পিতৃতুল্য এই ভদ্রলোক স্বাধীনতার সূর্য দেখার আগেই মারা যান।

সেদিন সন্ধ্যা ৭টা কি ৮টা হবে। হঠাৎ দরজায় ভীষণ জোরে লাথি মারার আওয়াজে আমরা চমকে গেলাম। বাইরের থেকে তালা খোলার শব্দ পেলাম। আমাদেরকে রাখা হয়েছিল এমপি হোস্টেলের তিন কামরার একটা ফ্ল্যাট-এ। ওখানেই অত্যাচার হত। তালা খোলার পর লাথি মেরে একজন আধমরা যুবককে (বয়স ২৭ কি ২৮ হবে) ভিতরে ফেলে দিল আর্মিরা।

এক জন বলল ঃ 'শ্যালা, ভাগনে চাহা থা,' তুমকো গোলী নেহী মারে গা ...। ছেলেটি কাতরাচ্ছিল, বলছিল, 'আমাকে গুলি করে মেরে ফেলো, আর মেরো না আমাকে।' যুবকটি আমাদের গায়ের উপর পড়েছিল অনেকক্ষণ। কিছুই করতে পারছিলাম না। দরজা বন্ধ হতেই আমরা ধরাধরি করে ওকে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু তখন আর তার বসার শক্তি নেই। মাথা নুয়ে পড়ছিল। কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছিল বার বার। কিছুটা অচেতন অবস্থার মধ্যেও ব্যর্থ চেষ্টা করছিল হেলান দিয়ে বসার। ওর নাক, মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছিল। চেহারাটা কিছুটা বিকৃত হয়ে যাওয়ায় চিনতে পারছিলাম না। পরে আলভী আমাকে বলল ওর নাম বদিউল আলম, মুক্তিযোদ্ধা। বদি নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবাই ওকে চেনে। কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পাকিস্তানিদের অত্যাচার সইতে না পেরে বদি দৌড় দিয়েছিল। ভেবেছিল গুলি করলে সহজেই মরতে পারবে। কিন্তু তার সে উদ্দেশ্য সফল হয়নি। আর্মি জোয়ানরা ধরে এনে তার ওপর বর্বর অত্যাচার করে। আধামরা করে ফেলে রেখে যায় আমাদের রুমে। এ যুবকের পরনে ছিল অফ হোয়াইট প্যান্ট ও দামী একটা শার্ট। পুরোটাই রক্ত শুকিয়ে চটের মত পুরু ও কালো হয়ে গেছে। রাত ৮টার দিকে পাকিস্তানি আর্মি এসে ওকে নিয়ে গেল। এরপর আর দেখিনি বদিকে।

যাহোক রাত ৮টা পর্যন্ত কয়েক দফা জিজ্ঞাসাবাদ ও অত্যাচারের পর রাত প্রায় সাড়ে ৯টার সময় বড় দুটো পিক আপ ভ্যান এসে আমাদের তুলে নিল। পরপর তিনটি সাদা বিল্ডিং-এর ২নং বিল্ডিং থেকেও পিক আপ-এ উঠানো হল আরো কয়েকজনকে। ওখানে ঘেরাও দিয়ে কয়েকজন আর্মি একজন সুদর্শন যুবককে তুলল আলাদা একটি জিপ-এ। তার দিকে তাকিয়ে বোঝা গেল ভীষণ অত্যাচার করা হয়েছে। কিন্তু বলিষ্ঠ দেহ হওয়ার কারণে হেলে পড়েনি তখনও। ও নিজেই উঠে গাড়িতে বসল। ওর নাম

পরে জেনেছি— রুমি, জাহানারা ইমামের বড় ছেলে, মুক্তিযোদ্ধা। রুমির সাথে ওইদিন আমার প্রথম এবং শেষ দেখা।

রাত দশটার দিকে আমাদের এনে ফেলল রমনা থানায়। সকলকে দাঁড় করাল থানার বারান্দায়। ওই লাইনে একজনকে দেখে চমকে গেলাম। চুল্লু ভাই। চেহারা দেখে বোঝা যায় কি নির্মম অত্যাচার চলেছে তার উপর। চুল্লু ভাই আমাদের ইশারায় কিছু বলতে নিষেধ করলেন। আগে ভাগেই পাকিস্তানিরা গাড়ি থেকে নামিয়ে আলতাফ ভাইকে রমনা থানার সেলে ঢুকিয়ে রেখেছিল।

সাড়ে দশটার দিকে আমাদেরকে রমনা থানার ১নং সেলে ঢোকাল। ঢুকেই দেখলাম ৫০/৬০ জন বন্দী রয়েছে আমাদের মত। অধিকাংশই বয়সে তরুণ। পাকিস্তানিদের দেখে ঘুমের ভান করছিল। সেলে ঢোকার পর পরই আমি মেঝেতে শুয়ে পড়লাম। আমার ভাইদের ও আলভীর অবস্থাও একই। কারো বসে থাকার শক্তি নেই। পনের/বিশ মিনিট পর পাকিস্তানিরা চলে গেলে এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটল। যারা ঘুমের ভান করে এতক্ষণ শুয়েছিল, উঠে বসল। আমাদের কাছে এসেই সেবা শুশ্রুষা করা আরম্ভ করল। আগামী কালের নির্যাতন থেকে কিভাবে বাঁচা যাবে সে বিষয়ে কিছু কথা কানে কানে সবাইকে বলে দিল। ধরাপড়া এসব তরুণরা সবাই মুক্তিযোদ্ধা। ঢাকার বিভিন্ন জায়গা থেকে তারা ধরা পড়েছে। আমাদেরকে তারা সাহস দিল।

একত্রিশে আগস্ট মঙ্গলবার। সকাল ঠিক ১০টায় পাকিস্তানি সৈন্যরা বেশ বড় সাইজের একটা বাস নিয়ে হাজির হল রমনা থানায়। নাম ডেকে ডেকে একে একে সবাইকে বাসে উঠাল। এনে ফেলল আবার সেই এমপি হোস্টেলে, ড্রাম ফ্যাক্টরিতে।

গতকালের অত্যাচারে সবার গায়ের ব্যথা টনটন করছে। আজ শুরু হল একই নিয়মে, একই ধরনের প্রশ্ন করার মধ্য দিয়ে। অত্যাচারের প্রকৃতি গতকালের মত হলেও তীব্রতা ছিল আরো ভয়ংকর। দুপুর পর্যন্ত বেড়েই চলল নির্যাতনের মাত্রা। গত রাতে অন্য বন্দীদের শিখিয়ে দেয়া টিপস্ অনুসরণ করলাম। কাজ হল এতে। কমে আসল নির্যাতনের মাত্রা। আলভীসহ অন্য ভাইদের শিখিয়ে দিলাম বিষয়টি রান্নাঘরে বসেই। কিন্তু ইতোমধ্যে আলভীর একটা আঙুল ভেঙে গেছে। উপুড় করে যখন মারছিল তখন পাকিস্তানি বর্বরদের পায়ের নিচ থেকে হাত টেনে নিয়ে পিঠে দিয়েছিল ঠেকানোর জন্য। এরপর শপাৎ শপাৎ বাড়িতে ভেঙে গেল হাতের আঙুল। সেখান দিয়ে রক্ত ঝরছিল অনবরত। ঠিকমত উত্তর না পেয়ে আর্মিরা আমার ছোট ভাই দিলুর কানে সজোরে থাপ্পড় মারে। এরপর সেখান থেকে অবিরাম রক্ত ঝরছিল। কানে কিছু শুনতে পাচ্ছিল না। আজ অব্দি সে কারণেই দিলু কানে কম শোনে। যাহোক সারা দিন কাটল পালাক্রমে নির্মম অত্যাচার সহ্য করে। রাত দশটায় আধামরা করে ফেলে রেখে গেল রমনা থানার সেলে। আবারো পুরানো মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা শুশ্রুষা।

পরদিন পহেলা সেপ্টেম্বর। সকাল ৯টায় বাস এসে দাঁড়াল থানার গেটে। সকলকে উঠিয়ে নিল বাসে। এই প্রথমবারের মত ক্রিকেটার জুয়েলকে দেখলাম। আমার পাশে বসা। হাতের আঙুলে ব্যাণ্ডেজ। শুনেছিলাম ধরা পড়ার কিছুদিন আগে ধানমণ্ডি ১৮ নম্বর সড়কে পাক বাহিনীর প্রতিরোধ আক্রমণে ওর হাতে গুলি লেগেছিল। জুয়েল বিড় বিড়

করে সুরা কালাম পড়ছিল। হয়ত বুঝতে পেরেছিল আর বাঁচবে না। কারণ ওর হাতের আঙুল স্বাক্ষী বহন করছিল সক্রিয় মুক্তিফৌজ এর। জুয়েল ছিল ঢাকায় বিভিন্ন অপারেশনের সক্রিয় যোদ্ধা। আমাদের সাথে যখন তাকে ধরে আনা হচ্ছিল ৩০ তারিখে, সামাদ সাহেবের দিকে তাকিয়ে তীব্র ভাষায় বলেছিল, আপনি মুক্তিযোদ্ধাদের ধরিয়ে দিয়েছেন। আমি ফিরে আসলে আপনাকে বাঁচতে দেব না। জুয়েল আর ফিরে আসেনি। শহীদ হন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বর্বর অত্যাচারে।

যাহোক, এমপি হোস্টেলে আমাদের নামানোর পর সকলকে আবার আগের রুমে বন্দী করে রাখা হল। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ করে তিনটি বিল্ডিং-এর সমস্ত টর্চার সেল থেকে বন্দীদের বের করে আনা হল। লাইনে দাঁড় করিয়ে হাঁটতে বলল সবাইকে। বড় বিল্ডিংটির নিচের তলায় নিয়ে মেঝেতে বসতে নির্দেশ দিল। রুমের ভেতরটা ছিল অনেকটা কোর্টের এজলাসের মত। একটু দূরেই দেখলাম একজন কর্ণেল বসা। কর্ণেল হেজাজী, তার পাশে দু'জন ক্যাপ্টেন। একজন ক্যাপ্টেন কাইয়ূম। অন্যজনের নাম মনে নেই। অন্যদের মধ্যে ছিল বদমাশ সফিন গুল। তার সহযোগী বিহারী মোক্তার। বুঝতে পারলাম আজই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে কাকে মেরে ফেলবে আর কাকে ছেড়ে দেবে। আমি কর্ণেলের পাশে বসা নাম না জানা ক্যাপ্টেনটিকে লক্ষ্য করছিলাম। ঠিক চিনতে পারলাম তাকে। প্রায়ই ডিআইটি টেলিভিশনে যাতায়াত করত। আমি ঠিক করলাম ওর সাথে কথা বলব। ওই ক্যাপ্টেন এমন হিংস্র যে কথা বের করার জন্য আঙুলের মাথায় মধ্যে ছুরির ডগা ঢুকিয়ে দিয়ে নখ উপড়ে ফেলছিল। আর কর্ণেল এজলাসের রায় দিচ্ছে আঙুল ঘুরিয়ে। আঙুল ডান দিকে ঘুরালে মুক্তি আর বাম দিকে ঘুরালে ফের টর্চার অথবা মৃত্যু।

যাহোক, দুপুর সাড়ে বারোটায় আমায় ডাকল। কর্ণেল বলল, 'ক্যায়া নাম হ্যায়? নাম বলার পর অন্য সবার নাম জিজ্ঞেস করল। ক্যাপ্টেন এসময় তার হাতের ছুরিটা অনেকটা পিস্তলের মত ঘুরাচ্ছে। মনে হচ্ছিল এই বুঝি নখের ভিতর ঢুকিয়ে দেবে। আমি হঠাৎ ক্যাপ্টেনকে বললাম, 'ম্যায় আপকো দেখা হ্যায়।' ভুরু কুচকে ক্যাপ্টেন বললো 'কাঁহা?' 'টেলিভিশন প্যার'! সে বললো, 'হ্যাঁ ওধার তো ম্যায় যাতা হু। তো তুম ওঁয়াহা কেয়া ক্যারতা?' বললাম, 'ম্যায় ফানকার হু।' বলতেই ক্যাপ্টেন মুচকি হেসে বললো, 'ক্যায়া ফানকারী করতে হো?'

আমি বললাম, 'ম্যায় গানা গ্যাতা হু, অর তবলা ভি বাজাতা হু।'

এ কথা বলার সাথে সাথে ক্যাপ্টেন পায়ের কাছে ছোট টেবিল লাথি মেরে আমার দিকে দিয়ে বলল, 'ইধার বাজাও, অর গানাভি গাও।' আমার প্রাণে পানি আসল। সাথে সাথে টেবিল নিয়ে বসে পড়লাম। কাঠের উপর তাল ঠুকতে লাগলাম। কি একটা উর্দু গান গেয়েছিলাম মনে নেই। যাহোক, আলতাফ ভাই বাদে আমাদের সবার মুক্তি মিলল। তবে ক্যাপ্টেন বলে দিল এখানে যা ঘটেছে বাইরে কিছু বলবে না। আর মুক্তিযোদ্ধাদের নাম ঠিকানা ও কি করছে সবই আমাদের সরবরাহ করবে।

ফিরে আসার সময় আলতাফ ভাই বললেন, 'আমার কথা ভেবো না। তোমরা সবাই মিলে আমার শাওনকে দেখে রেখো।'

সাক্ষাৎকার ঃ রুহুল মতিন

লোহার রড দিয়ে বাড়ি মেরে বুকের পাঁজর ভেঙে দিয়েছে

অধ্যাপক আ ম ম শহীদুল্লা

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অন্যতম লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ। ২৫ মার্চ থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত শিক্ষখদের তারা নির্বিচারে হত্যা করেছে, গ্রেফতার করে অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের অধ্যাপক আ ম ম শহীদুল্লাও তাদের হাতে গ্রেফতার হন। তাঁর উপর নির্মম নির্যাতন চালান হয়েছিল। অধ্যাপক শহীদুল্লার এ জবানবন্দি ধারণ করা হয় ২৮শে সেপ্টেম্বর '৯৯ তারিখে।

১৯৭১-এর ১৩ আগস্ট। তখন রাত বারটা পাঁচ মিনিট। অজানা আশঙ্কায় ঘুম আসছিল না। শরীরটা দু'দিন আগে থেকে একটু খারাপ। জানালার পাশে বসে বাইরে তাকিয়ে আছি। হঠাৎ দেখি একদল পাকিস্তানি সৈন্য ফুলার রোড দিয়ে আমার বাসার দিকে আসছে। তাদের অনুসরণ করছে আরও ৫০/৫৫ জন। ওরা সরাসরি এল ১২ নং বিল্ডিং-এ। আশেপাশে সবাই অবস্থান নিল। আমি থাকতাম ১২ সি বাসাতে। গত কয়েক দিনের ধারাবাহিক ঘটনায় আমার বুঝতে বাকি থাকল না আমাকে ধরতে এসেছে। কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার আগেই দরজা খুলে দাঁড়ালাম। সিটি এসপি'র নেতৃত্বে দলটি দোতলায় উঠে এসে আমার দিকে তাকাল। পকেট থেকে একটি লিস্ট বের করল। পাঁচজনের নাম লেখা। উপরের নামটি আমার। তারপর অধ্যাপক সা'দ উদ্দীন, আহমদ শরীফ, আবুল খায়ের ও বাংলার রফিকুল ইসলাম সাহেবের। উপরের নামটিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'আর ইউ দিস?'

'ইয়েস, আই এ্যাম।' বলার সাথে সাথে আমার ঘাড়ে সজোরে থাপ্পড় মেরে বলল, 'ফলো আস্।'

আমি লুঙ্গি গেঞ্জি পরিহিত ছিলাম। বললাম, 'ওগুলো পাল্টে আসি। আর আমার ওষুধগুলো নিয়ে আসি।'

কর্নেল র‍্যাঙ্কের অফিসারটি বলল, 'ওখানে গেলে সবই পাবে।'

ধরার সময় আমাকে আইডেন্টিফাই করল তৎকালীন রমনা থানার ওসি কাজী মহিউদ্দীন। আমাকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে ১৬ নং বিল্ডিং-এর গ্যারেজের সামনে দাঁড় করাল। সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সা'দ উদ্দীন থাকতেন ওই বিল্ডিং-এ। কর্নেল জিজ্ঞেস করল, তার বাসা নম্বর কত। বললাম, 'এ বিল্ডিং-এ থাকেন, কিন্তু বাসার নম্বর জানি না। আমি কোন দিন যাইনি তার বাসায়।'

তখন সিটি এসপি আমাকে থাপ্পড় মেরে বিশ্রী ভাষায় গালি দিয়ে বলল, 'তুমি তোমার বন্ধুর বাসা চেনো না?'

সে সময় ওই পাঞ্জাবী বংশোদ্ভূত অফিসারটি দাবি করেছিল সে ইংরেজীতে এম এ। এরপর তারা ডঃ আহমদ শরীফের বাসায় গেল। তাঁকে না পেয়ে ফুলার রোডের ওপারে ডঃ আবুল খায়েরকে ৩৫ নং বিল্ডিং থেকে বের করল। এরপর আমাদেরকে দু'ভাগে ভাগ করে। একটা গাড়িতে উঠাল ডাঃ আবুল খায়ের ও সা'দ উদ্দীনকে, অন্য গাড়িতে আমাকে। আমাকে নিল নীলক্ষেতে রফিকুল ইসলাম যেখানে থাকতেন, ওখানটাতে। বাইরে থেকে গেট বন্ধ ছিল। ক্রলিং করে আমাকে ভিতরে ঢোকার নির্দেশ দিল।

বললাম, 'আমি ক্রলিং পারি না।' অমনি হাঁটু দিয়ে আমার পিছন দিকে ধাক্কা দিল। প্রচণ্ড ব্যথা পেলাম। ওই ব্যথাটা আমাকে দীর্ঘদিন ভুগিয়েছে। আমি ক্রল করে ভিতরে ঢুকলাম। আমাকে দিয়ে ডঃ রফিকুল ইসলামকে নামাল।

আমার ধরার কারণ হিসেবে যেটা বুঝেছি, কিছুদিন আগে রেজিষ্ট্রার তদানিন্তন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর সাজ্জাদ হোসেনের বরাত দিয়ে একটি সার্কুলার দেয়। সেখানে সমস্ত শিক্ষককে, তাদের বাসার বর্তমান ঠিকানা লিপিবদ্ধ করে রেজিষ্ট্রার অফিসে জমা দিতে বলা হয়। আমি ঠিকানা দিয়েছিলাম সেখানকার— যেখানে আমি থাকি না। এরকম বোধহয় আরো অনেকেই দিয়েছিল। এরপর আমার যদ্দুর মনে হয় ওরা যাচাই করে দেখেছে ওটা সঠিক নয়। কয়েকদিনের মধ্যে আবার একটা সার্কুলার এল। বলা হল বর্তমানে যেখানে আছি সেখানকার ঠিকানা দিতে। এটা থেকে বোঝা যায় আমাদেরকে কেউ পিন পয়েন্ট করেছিল।

একটা ব্যাপার উল্লেখ করা যেতে পারে, আমরা জুন মাসের দিকে নিয়মিত বেশ কিছু লোক চিঠি পাওয়া শুরু করেছিলাম, 'যমদূত বাহিনী' নাম দিয়ে। আমাদের কিছু চিহ্নিত লোককে ঐ চিঠিতে ট্রেইটর, দেশদ্রোহী বলা হচ্ছিল। সেখানে হুমকি দেয়া থাকত তোমাদের বাঘ, শিয়াল, কুকুর দিয়ে খাওয়ানো হবে ইত্যাদি। আমরা যারা গ্রেফতার হয়েছি তাদের বাইরেও বেশ কিছু শিক্ষক এ ধরনের চিঠি পেতেন। পরবর্তী সময়ে আমরা যখন বিষয়টি আলোচনা করেছি, তখন কিছু শিক্ষকের আচরণে মনে হয়েছে এ কাজ তারাই করেছেন। তারাই লিষ্ট থেকে আমাদের নাম টিক দিয়েছেন এবং বলেছেন এদেরকে গ্রেফতার করলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঠিকঠাক মত চলবে। পাকিস্তান দিবসের আগে আমরা কোন অঘটন ঘটাতে পারি, তাদের এমন কিছু মনে হয়েছে, যেটা

আমি পরে ইন্টারোগেশনের সময় বুঝেছি। তারা সে সময় আমাদেরকে গেরিলা হিসাবে ট্রিট করেছে।

রাত আড়াইটার দিকে আমাদেরকে রমনা থানায় নেয়া হল। সেখানে এক অদ্ভূত ব্যাপার ঘটল। ওসি কাজী মহীউদ্দীনকে হুমকি দিয়ে সিটি এসপি বলল, 'তোমাকে গত এক সপ্তাহ ধরে বলা হচ্ছে রিপোর্ট করতে, আর তুমি বলছ ওদের পাওয়া যাচ্ছে না। তোমার ব্যবস্থা করবো কাল সকালে এসে।'

পরদিন সকালে তো আমি অবাক! আমার স্ত্রী, আমার দুই কলিগ ও কেয়ারটেকার সৈয়দ দলিলউদ্দিন সহ রমনা থানায় হাজির। পরে শুনেছি ওই দারোগা কাজী মহীউদ্দীন ধরে আনার সময় এক ফাঁকে আমার স্ত্রীকে বলেছিল কাল সকালে এলে আমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবে।

দলিলউদ্দিনকে দেখে ওসি ভয়ানক ক্রোধান্বিত হয়ে বলল, 'তোমাকে গুলি করে মারবো। তোমাকে বলে দিয়েছিলাম এসব শিক্ষককে সরে থাকতে বলতে। কেন তুমি তাদের সতর্ক করোনি।' আমরা তাকে থামাই।

মহীউদ্দীনের কথায় বুঝলাম সে আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। সে গতরাতে আমাদের লক আপে না ঢুকিয়ে বেঞ্চে শুইয়ে বসিয়ে রেখেছে। ও সময় দেখেছি লক আপের ভিতর রেডিও ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তাদের দুর্বিসহ অবস্থা। চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছিল আর্মিরা নির্যাতন করে তাদের ওখানে ফেলে রেখেছে।

সকাল সাড়ে এগারটার দিকে আমাদের সবাইকে এমপি হোস্টেলে আনা হল। সেখানে দেড় ঘন্টা বন্দি রেখে আমাদেরকে নিয়ে গেল ওই হোস্টেলেরই কাঁটা তার ঘেরা একটা অংশে। দোতলায় তোলার পর দেখলাম ছোট ছোট অনেক রুম। ওখানে দেখা হল মাদারীপুরের এসপি, আমার প্রাক্তন ছাত্র ফরিদউদ্দীন, খান আতাউর রহমান সহ অনেক সুপরিচিত ব্যক্তিদের সাথে।

বিকাল সাড়ে তিনটা পর্যন্ত আমাদের কোন খাবার দেয়নি। খাওয়ানোর মধ্যে আগের রাতে রমনা থানার ওসি অল্প একটু খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছিল। আসলে তখন খাওয়ার অবস্থাও ছিল না।

এমপি হোস্টেলের ওই ছোট রুমগুলোতে আমরা ৪/৫ জন করে থাকতাম। মাঝে মাঝে রুম বদলানো হত, সঙ্গী বদলানো হত, যাতে করে কেউ কারো সাথে বেশি দিন থেকে সংগঠিত হতে না পারে। এ বদলানো প্রক্রিয়ায় আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে এ এন এম ইউসুফ, কেবিনেট সেক্রেটারী আজিজুর রহমান ও সাজেদুর রহমান সহ টিএণ্ডটি'র অসংখ্য অফিসার। পেট্রোল সার্ভিসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা পরবর্তী সময়ে সেক্রেটারী আহসানুল্লাহ সাহেব, আলমগীর কবির ও মুলকুতুর রহমান সহ আরো অনেককেও দেখেছি। শুনেছি আমার কলেজ বন্ধু মুলকুতুর রহমানকে আর্মিরা অস্ত্রসহ গ্রেফতার করে কুড়িগ্রাম এলাকা থেকে। পলিটিক্যাল সায়েন্স-এর শিক্ষক মুলকুতুর গেরিলা বাহিনীর সাথে যুক্ত ছিল। ভারত থেকে অস্ত্র আনা নেওয়া করত। এরই এক পর্যায়ে ধরা পড়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে। তাকে নির্মমভাবে পেটানোর পর হেলিকপ্টার দিয়ে

ঢাকা পাঠায়। মেজর জেনারেল মজিদ সহ আরো অনেক আর্মি আসেন। বরিশালের তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা মহিউদ্দীন সাহেবও ছিলেন ওই নির্যাতন সেলে। এমপি হোস্টেলের তৃতীয় দিনে আমাদেরকে ইন্টারোগেশন সেলে নিল। সাদা কাগজ দেওয়া হল। বলল সব বন্ধুদের নাম লিখতে।

আমরা এমন বন্ধুদের নাম লিখতাম যাদের তারা খুঁজে পাবে না, অর্থাৎ সরে গেছে অন্য কোথাও। ঠিকানাও সঠিক দিতাম না। আমাদের ছোট একটা অন্ধকার ঘরে আটকে রাখা হত। মেঝেতে বসতে হত, ফ্লোরে শুতে হত। আমাদের জন্য জেলখানা থেকে অল্প কিছু খাবার পাঠানো হত। রুমের সামনে দাঁড়ান সেন্ট্রিটি মাঝে মাঝে তালা খুলে দেখত আমরা কি করছি। আর্মি অফিসাররা এসে দেখে যেত আর তাচ্ছিল্যের স্বরে কথা বলত। এক দিন এল খাটো করে দেখতে ব্রিগেডিয়ার ফকির মাহমুদ। তার সাথে একজন ফ্লাইট সার্জেন্ট। এ সার্জেন্ট মুখের থুথু চোখে লাগিয়ে বিদ্রুপ ও অভিনয় করে বলল, 'আহারে, আমার বাঙালি ভাইদের কি কষ্ট। আর পঁচিশ বছর পরেই তোমাদের স্বাধীন করে দেব।' ফকির মাহমুদ বলল, 'তুমিতো সাবসিডিয়ারী ক্লাসে ত্রিকোণোমিতি পড়ানোর সময় বাঙালি জাতীয়তাবাদের কথা বলতে।'

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে আমার কোন ছাত্র বা কলিগ এটা তাকে ইনফর্ম করেছে। ব্রিগেডিয়ার ফকির মাহমুদ থাকে ক্যান্টনমেন্টে; ক্লাসে আমি ত্রিকোণোমিতি পড়াই, না অন্য কিছু পড়াই সে জানল কিভাবে? বোঝা যায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এগুলো পাচার হত। আরো মজার ব্যাপার, ইন্টারোগেট করার সময় একদিন এক লোক এল। আমাকে বলল, 'তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।'

চিনতে পারলাম। সে এক সময় আমাদের ক্লাবে এক্সটারনাল মেম্বার হতে এসেছিল। তবে তাকে আর মেম্বার করা হয়নি; তার নামটাও আজ মনে নেই।

ইন্টারোগেশনের সময় জিজ্ঞেস করেছে— তুমি তো ইকবাল হলের হাউস টিউটর ও ট্রেজারার ছিলে। রাজ্জাক, তোফায়েল, শাজাহান সিরাজ এদের সাথে তো যোগাযোগ ছিল? বলেছে— বাঙালি জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তোমার মত কি?

মনঃপূত উত্তর না পেয়ে থাপ্পড় মেরেছে, গলা চেপে ধরেছে, কাপড় খুলে উলঙ্গ করে সবার সামনে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড় করিয়ে রেখেছে। কখনো সিগারেটের আগুন চেপে ধরেছে পিঠে। অন্যদেরও আমার সামনে নির্মমভাবে নির্যাতন করেছে। লোহা দিয়ে বুকের উপর চাপ দিয়েছে। লোহার রড দিয়ে বাড়ি মেরে বুকের পাঁজর ভেঙে দিয়েছে। জুতা সেলাই এর মত মোটা সূচ দিয়ে নখের মধ্যে, মাথার মধ্যে বিঁধিয়ে দিয়েছে। ওসব নির্যাতিতদের আমি চিনতাম না। পরে শুনেছি ওরা ছিল বাঙালি আর্মি অফিসার।. ও সময় আমি সরাসরি কাউকে হত্যা করতে দেখেনি, তবে অনেককে মৃতপ্রায় বেহুশ অবস্থায় ষ্ট্রেচারে করে নামিয়ে নিয়ে যেতে দেখেছি। সিপাহীদের কারো কারো কাছে শুনেছি দু'এক জনকে পিটিয়ে মেরে ফেলতে।

আমাদের চার্জে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আর্মি অফিসার থাকতো। একদিন এল মেজর বশির। সে আমাকে বলল, 'দেখ আল্লা মিয়ার কি কেরামতি! আমি ক্লাস ফোর পর্যন্ত

পড়েছি, অথচ আমি এখন পাকিস্তান আর্মির মেজর।' অন্য একদিন এল আরেকজন পাকিস্তানি আর্মি অফিসার ব্রিগেডিয়ার বশির। সে আমার বাড়ি কোথায় জিজ্ঞেস করলে বললাম, 'কুমিল্লা।' তখন সে বললো, 'কুমিল্লার সব লোক তো হিন্দু। খামোখা তোমার নাম শহীদুল্লাহ।'

আমার সাংঘাতিক রাগ হয়েছিল। আমি প্রতিবাদ করেছিলাম।

সে আবার প্রশ্ন করেছিল, 'তুমি নামাজ পড়?' উত্তর দিয়েছিলাম, 'আই এ্যাম এ মুসলিম।' আবারও একই প্রশ্ন করল। ওরা আমাকে মোট নয়দিন ইন্টারোগেট করেছে। প্রত্যেক দিন নতুন নতুন কেউ। একদিন, সম্ভবত শেষ দিন, উঁচু লম্বা করে একজন ইন্টারোগেট করেছিল। পরে শুনেছি সে লোকই নাকি কুখ্যাত কর্ণেল হেজাজী।

ওরা জিজ্ঞাসাবাদের সময় সবাইকে বাঙালি হিসাবে ট্রিট করেছে, মুসলিম মনে করেনি। টুপি, দাড়িওয়ালা বয়স্ক লোকদেরকেও আমি নির্মমভাবে টর্চার হতে দেখেছি। আমাদের বুকের উপর নেম প্লেট দিয়ে ক্রিমিনালদের মত করে ছবি তুলেছে।

আমরা প্রায়ই আশেপাশে গুলি হবার শব্দ শুনতাম। সেন্ট্রিকে জিজ্ঞেস করলে বলত গুলি করে মারা হচ্ছে। আমাদের রুমের যে সেন্ট্রি ছিল সা'দ উদ্দীন আর আমি ওর নাম দিয়েছিলাম জানোয়ার। সে বুক ফুলিয়ে বলত, আমি এ পর্যন্ত তেরটা খুন করেছি। নির্যাতন সেলে থাকার সময় নিচ তলা কিম্বা আশেপাশের এলাকা থেকে নারী কণ্ঠের তীব্র চিৎকার শুনতাম। বুঝতে পারতাম নিরীহ মা বোনদের ধরে এনে রেপ করা হচ্ছে। প্রতি রাতেই এই শব্দ শুনতাম।

সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি একদিনের ঘটনা। হঠাৎ করে আমাদের রুমের জানালা দরজা সব বন্ধ করে দেয়া হল। সবাই ভয় পেয়ে গেলাম। মনে হল মৃত্যুঘন্টা বোধহয় বেজে গেছে। এক ঘন্টা এ অবস্থা থাকল। তার পর খুলে দিল। শুনলাম টিক্কা খান পাকিস্তান উড়ে যাওয়ার কারণে সম্ভাব্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। সে নাকি এ্যামনেস্ট্রি ডিক্লেয়ার করে গেছে। আমরা যাতে এ্যামনেস্টি না পাই সে জন্য রাত দেড়টায় তালা খুলে চার্জশিট দিল। আমার বিরুদ্ধে ৭টি অভিযোগ হাজির করা হল। সবগুলো উদ্ভট ও বানোয়াট। এর মধ্যে দেশদ্রোহিতার পাশাপাশি আর্মি অফিসারের বৌকে আশ্রয় দেয়ার বিষয়টিও ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আটক শিক্ষকদের তারা বিপজ্জনক এলিমেন্ট হিসেবে বিবেচনা করত। এ জন্য বাথরুমে পর্যন্ত আমরা কি করছি না করছি তা মনিটর করা হত।

নির্যাতন সেলে একজন বিহারী ডাক্তার আসত, আমাদের নামমাত্র চিকিৎসা করার জন্য। তার এক সহকারী ছিল। সেই সুদর্শন যুবকটি আমাদের কাছে সুযোগ বুঝে তথ্য পাচার করত। আমার বাড়িতে পর্যন্ত খবর পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিল। হঠাৎ একদিন থেকে তাকে আর দেখলাম না। পরে শুনেছি পাকিস্তানি আর্মিরা তাকে মেরে ফেলেছে।

অক্টোবরের ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় গেরিলা তৎপরতা সাংঘাতিক বেড়ে গেল। আমাদের তখন জেলখানায় নেয়া হল। সে সময় অবশ্য মুক্তির প্রক্রিয়া চলছিল— শিক্ষকদের কেউ বন্ড দিয়ে বেরুতে চাইলে পারত। একদিন দেখলাম আহসানুল হক সাহেব, উনি সহজ সরল দুর্বল চিত্তের মানুষ ছিলেন, হাসতে হাসতে নিচে নেমে

গেলেন। কিছুক্ষণ পর কাঁদতে কাঁদতে, চোখ মুছতে মুছতে ফিরে এলেন। জিজ্ঞেস করলাম কি ব্যাপার? শুনলাম উনি বন্ড দিয়ে বেরুতে চেয়েছিলেন কিন্তু ওনার বৃদ্ধ মা বলেছেন, 'দেশ স্বাধীন হবে। বন্ড দিয়ে বেরুবি না। আর যদি মরে যাস তো এর মধ্যে মরে যাবি।' এটা আমি কখনও ভুলতে পারব না। আমি গর্বিত এমন মায়ের জন্য। এমন কঠিন আদর্শবান মা বাংলাদেশে আছে। এ ঘটনা আমাদের সাংঘাতিক অনুপ্রাণিত করেছিল।

জেলখানার মধ্যে আমাদের সাথে দেখা করল কুখ্যাত রাজাকার মৌলভি ফরিদ আহমেদ। সে এমনভাব করল যেন সেই আমাদের ছাড়িয়ে দিচ্ছে। আমাদেরকে নিয়ে গেল ব্রিগেডিয়ার বশিরের চেম্বারে। সেখানে ছিল রাজাকার ও মুসলিম লীগ নেতা নান্না মিয়া। সে সবার বন্ড নিচ্ছিল। তার আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও খায়ের আমাকে বলল, 'না, বন্ড দিও না।' আমাদের বন্ড ছাড়াই নান্না মিয়ার সহযোগিতায় ছাড়া হল। একটা জীপে করে আমাদের আনা হল ভিসি সাজ্জাদ হোসেনের কাছে। বলা হল আমাদের যে সব বাড়ি দেখিয়ে দেবে, সে সব বাড়িতে থাকতে হবে। কিছুদিনের মধ্যে জানতে পারলাম যে সব শিক্ষককে ছেড়ে দিচ্ছে তাদেরকে পুনরায় রাতের বেলায় তুলে নিয়ে হত্যা করা হচ্ছে। রশিদুল হকের ভাইকে এবং আবুল খায়েরকে এভাবেই মেরেছে।

ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে আমার এক বন্ধু, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার মুর্তজা একটা গাড়ি জোগাড় করে রেডক্রসের চিহ্ন লাগিয়ে আমাকে ও আমার পরিবারকে পালাতে সাহায্য করেছে। কমলাপুরের এক বাসায় আমার স্ত্রী ও দু'সন্তানকে রেখে আজ রাতে এখানে তো, কাল রাতে ওখানে— এভাবে পালিয়ে বেঁচেছি। কোথাও দু'রাত এক সাথে থাকিনি। এভাবে দেশ স্বাধীন হলে আবার ক্যাম্পাসে ফিরে আসি। এসে শুনি ডাঃ মুর্তজাকেও ওরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

সাক্ষাৎকার ঃ রুহুল মতিন

প্রতিদিন আমাদের মেরে নারকীয় উল্লাস করত তারা

ক্যাপ্টেন (অব:) সৈয়দ সুজাউদ্দীন আহমেদ

জাতীয় গণমাধ্যম অধিদপ্তরের প্রাক্তন মহাপরিচালক ক্যাপ্টেন (অবঃ) সৈয়দ সুজাউদ্দীন আহমেদ '৭১-এ পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর একজন অফিসার ছিলেন। ৮ এপ্রিল পাকিস্তানিরা তাঁকে সাতক্ষীরায় গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের পর যথারীতি শুরু হয় জেরা এবং অমানুষিক নির্যাত। তার জবানবন্দি ধারণ করা হয় ২৫শে সেপ্টেম্বর '৯৯।

২৫শে মার্চ রাতে আমি যশোরে ছিলাম। প্রচণ্ড উত্তেজনা সারা শহরে। আমাদের বাসাটা ছিল বিহারী কলোনিতে। বিহারীরা সাংঘাতিক ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আমরা ওদের বোঝালাম। বললাম বাঙালিরা তোমাদের উপর হামলা করবে না। আমরা ওদের বুঝিয়ে বলতে পারব। আওয়ামী লীগ অফিসে গেলাম খবর জানতে। সেই সময় আমার দু'মাসের ছুটি ফুরিয়ে গেছে। তবুও পাকিস্তান ফিরে যাচ্ছিলাম না, যদিও ছুটি ফুরোলে দেরি করা আর্মিতে বড় ধরনের অপরাধ। তখন ইয়াহিয়া খানের সাথে বঙ্গবন্ধুর আলোচনা চলছে। ভাবছি দু/এক দিনের মধ্যে সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে; আমি পাকিস্তান ফিরে যাব। যদি ক্র্যাক ডাউন ৭/৮ দিন পরে হত তাহলে হয়ত পাকিস্তানে চলেই যেতাম।

২৫শে মার্চ রাত ১২টায় শুনলাম ঢাকায় গোলাগুলি হয়েছে। ঢাকাতে আমার এক ভাই-এর বাসায় ফোন করলাম। পেলাম না। সারা রাত উত্তেজনায় ঘুম হল না।

২৬ তারিখ সকালে সমস্ত যশোর শহরে কারফিউ ঘোষণা হল। বলা হল কেউ যদি রোড ব্লক করে, তবে ২৫/৫০ গজের মধ্যে কাউকে দেখলে গুলি করা হবে। আমরা জানালা দিয়ে দেখলাম আর্মির গাড়ি মাইকে ঘোষণা করতে করতে যাচ্ছে। আমার শুধু মনে হচ্ছে ঢাকা শহরের কথা। ঢাকা শহর আছে কি নেই। কারণ ক'দিন আগে ঢাকা শহরের মানুষের মধ্যে যে উদ্দীপনা দেখে এসেছি, তাতে মনে হয়েছে ক্র্যাক ডাউনের পর লোকজন রাস্তায় নেমে পড়েছে। এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে হয়ত অর্ধেক লোক মারাই পড়েছে। হয়েছেও অবশ্য তাই। ২৬ তারিখেই আমার পাশের বাসায় একজন উঁকি দিয়ে

দেখছিল বাইরে কি হচ্ছে। সাথে সাথে আর্মিরা গুলি করে তাকে মেরে ফেলেছে।

আমরা অপেক্ষা করছি কোন দিকে কি ঘটছে শোনার জন্য। রেডিও ধরছি সারাদেশের খবর জানার জন্য। ২৬ তারিখেই আর্মিরা টিএণ্ডটি, ইপিআর ক্যাম্প সব গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় অবস্থান নিল। ২৭ তারিখ সকালে দু'ঘন্টার জন্য কারফিউ তুলে নিল। আমি প্রথম যে কাজটি করলাম— কাছেই ইপিআর-এ ক্যাম্প, আমার এক বন্ধু ছিল ওখানে, ওর খোঁজ খবর নিতে গেলাম। হাসমতের দেখা পেলাম। জানতে চাইলাম, 'তোরা এর বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিবি না?'

সে বলল, অপেক্ষা করছি থার্ড বেঙ্গল আর চুয়াডাঙ্গার মেজর আবু ওসমান সাহেব কি করেন তা দেখার জন্য।

বুঝলাম তারা সাহস পাচ্ছে না। পরদিন কারফিউ আরেকটু বেশি শিথিল করা হল। যশোরে এ সময় বিচ্ছিন্ন দু'একটা কিলিং হচ্ছে। বিখ্যাত আর্মি ডাক্তার কর্ণেল হাবিবুর রহমানকেও পাকিস্তানিরা হত্যা করল। ২৮ তারিখে মাইকে ঘোষণা দিল— যার কাছে যা অস্ত্র আছে জমা দেয়ার জন্য।

আমাদের বাসায় একটা শর্ট গান ছিল। আব্বা বললেন, 'এটা জমা দিয়ে আয়।' আমি জমা দিতে যাচ্ছি; পথে কিছু ছেলেরা আটকাল। ওরা ওটা চাইল। বললাম, 'তোমরা কেড়ে নাও।' ওরা তখন কিছু বলল না। আমি ওটা থানায় জমা দিলাম।

আমি লক্ষ্য করেছি সবার মধ্যে প্রতিরোধের ইচ্ছা, কিন্তু সংগঠিত হতে পারছে না নেতৃত্বের অভাবে। যে যার অবস্থান থেকে সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছে, সম্মিলিতভাবে নয়। আর এ জন্য প্রতিরোধ সম্ভব হচ্ছে না। বিষয়টা এমন, বিড়ালের গলায় ঘন্টাটা বাঁধবে কে? কেউ নেতৃত্ব নিচ্ছে না। এর মধ্যে খবর পেলাম ক্যান্টনমেন্টে আর্মি ক্র্যাক ডাউন করেছে। ৩০ তারিখ সকালে আমার সেই বন্ধু হাসমত ইপিআর থেকে ছুটে এল। বলল, 'এখন আমাদের জন্য অপেক্ষা করা বিপজ্জনক। ক্যান্টনমেন্ট-এ বাঙালি সৈন্যদের ডিজ আর্ম (অস্ত্রহীন) করেছে, এখন আমাদেরও করবে।'

ইপিআর, পুলিশ সবাই অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল। পাকিস্তান আর্মি যারা শহরে ছিল— পালিয়ে ক্যান্টনমেন্ট-এ চলে গেল। যারা যেতে পারেনি, তারা মারা পড়ল। এ সময় আওয়ামী লীগ নেতা সালাহউদ্দীন সাহেবকে দেখলাম খুব সাহসের সাথে কাজ করতে।

এর মধ্যে ৯ তারিখের দিকে নড়াইল থেকে একজন অবসরপ্রাপ্ত আর্মি অফিসার প্রায় দেড় শ'জনের মত সমর্থক যোদ্ধা নিয়ে ইপিআর-এর জেলা দফতরে এলেন। সবাই শহরে আসছে, জড়ো হচ্ছে। উদ্দেশ্য ক্যান্টনমেন্টে হামলা করা। এ সময় দেখলাম যশোর এয়ারপোর্ট-এ একটার পর একটা আর্মি প্লেন নামছে। খবর পেলাম, চুয়াডাঙ্গার ইপিআর মেজর ওসমান বিদ্রোহ করেছেন। তাঁর সৈন্য নিয়ে শহরের দিকে এগুচ্ছেন। আমার মনে হচ্ছিল পাকিস্তান আর্মি শক্তি বৃদ্ধি করে যে কোন মুহূর্তে শহরে অপারেশন চালাবে। বন্ধু হাসমতকে বললাম, 'দোস্ত, অসংগঠিত অবস্থায় না থেকে শহর ছেড়ে ভাগ, নইলে মারা পড়বে।'

বিকাল চারটার দিক থেকে দেখলাম লোকজন শহর ছেড়ে পালাতে শুরু করেছে।

হাশমতকে বললাম, 'তুই যখন ইপিআর-এর সাথে ভাগবি আমাকেও সাথে নিস।'

পরদিন সকালে বাইরে বেরুলাম। ইপিআর ক্যাম্প-এ গিয়ে দেখলাম হাসমত নেই, পুরো ক্যাম্প খালি। সবাই ভেগেছে শহর ছেড়ে। বাসায় ফিরে আব্বাকে বললাম, 'চল, এক্ষুণি শহর ছেড়ে চলে যাই।'

প্ল্যান করলাম যে দিকে রাস্তা ফাঁকা পাই সেদিকে এগুবো— তবে ইচ্ছে ছিল খুলনার দিকে এগুনোর। খুলনা হয়ে বরিশালের গ্রামে চলে যাব।

একটা ট্রাক ভাড়া করলাম। আশে পাশের কয়েকটি ফ্যামিলিকেও আমাদের সাথে নিলাম। কিন্তু বরিশালের দিকে এগুতে পারলাম না। রাস্তা বন্ধ। ফলে সাতক্ষীরার দিকে এগুলাম। সাতক্ষীরায় আমার বাবার বন্ধু ছিলেন ফুড কন্ট্রোলার। তাঁর বাসায় উঠলাম। সাতক্ষীরা তখন মুক্ত। ওখানে আর্মি নাই। কিছু সংখ্যক ইপিআর আছে। তারাই মূলতঃ শহর রক্ষা করছে।

সাতক্ষীরার এসডিও ছিল অবাঙালি। ইপিআররা তাকে ধরে নিয়ে গেল। দেখলাম ওই সময় সাতক্ষীরাতে সিভিল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন নেই। তবে এ কারণে যে চুরি ডাকাতি হচ্ছে তাও নয়। এপ্রিলের ৮ তারিখে ভোর রাতে শহরে প্রচুর পরিমাণ আর্মি ঢুকল। ক্যাম্প করল পিএন হাইস্কুলে। ঢোকার পথে আমার কোর্সমেট অবাঙালি ক্যাপ্টেন আব্বাস, আমাকে দেখে চিনে ফেলল। আমি সকালে শহরের অবস্থা দেখতে বের হয়েছিলাম। সেই সময়ই আমাকে ধরল। ওটা ছিল সম্ভবতঃ ২৬ বেলুচ রেজিমেন্ট। নেতৃত্বে ছিলেন কর্ণেল জে জে ডিল।

একজন পাকিস্তান আর্মি অফিসার আব্বাসকে উদ্দেশ্য করে আমাকে দেখিয়ে বলল, 'উয়ো গাদ্দার হ্যায়, উসকো মার দো, জিন্দা নেহি ছোড়ে গা।' এই বলে আমাকে সজোরে লাথি দিল।

আব্বাস বাধা দিল। বলল, 'ওকে না মেরে নিয়ে চল।'

আমার সাথে আরও কয়েকজনকে তারা ধরে এনেছিল। আমাদের রাখা হয়েছিল দোতলা স্কুলটির নিচ তলায়। তখন দোতলায় মেয়েদের কান্নাকাটির শব্দ পাচ্ছিলাম। এদের কারো স্বামী, কারো ছেলে বা ভাইকে ধরে এনে পাকবাহিনী হত্যা করেছে। আব্বাস কিছু বাংলা জানত। সে আমাকে বলল, 'উপরের মহিলাদের জোরে চিৎকার করতে নিষেধ করে দাও। না হলে আরো ক্ষতি হবে।'

এ সময় মাঠের মধ্যে দেখলাম বেশ কিছু লাশ পড়ে আছে। শহরের ঢোকার পথে ওদেরকে হত্যা করা হয়েছে। আরো কিছু হত্যা করা হয়েছে এখানে এনে। আমি উপরে গিয়ে দেখলাম প্রায় দেড় শ'র মত মেয়েকে— বৃদ্ধ থেকে যুবতী পর্যন্ত, সবাইকে তারা ধরে এনেছে। ওদের বললাম, 'আপনারা কান্না কাটি করবেন না। ওরা এখনই চলে যাবে। সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে।'

এ সময় ওদের মধ্যে একজন অফিসারকে উত্তেজিত হয়ে বলতে শুনলাম, 'মুসলমান মেরেছ কেন? বলেছি না হিন্দু মারতে।' আসলে ওদের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের সব হিন্দু মেরে ফেলা।

পি এন স্কুলে আমাদের জেরা করার পর ক্যাপ্টেন আওলাদ ও আমাকে নিয়ে

যশোরের পথে রওনা দিল। আমাদের সঙ্গে যাদের ধরেছিল ওদের গুলি করে হত্যা করল। সবাইকে মারার পর আমাদের দু'জনকে বাঁচিয়ে রাখায় সিপাইরা অবাক হল। তারাও বোধহয় আমাদের মারার কথা ভেবেছিল।

পথে যেতে দেখলাম দুপাশে ঘরবাড়ি পোড়ানো। বুঝতে পারলাম সাতক্ষীরা যাওয়ার পথে এ কাজ করেছে। আমাদের যশোর ক্যান্টনমেন্টে রাখা হল। রাতে খেতে দিল না। পরদিন সকালে, সম্ভবত ১৬ এপ্রিল, F-20 প্লেনে করে ঢাকায় আনল। এ সময় জানালা দিয়ে দেখেছি, রাস্তার দু'পাশ কালো হয়ে আছে, অর্থাৎ যাওয়ার সময় রাস্তার দু'পাশের ঘর বাড়ি দোকানপাট সব পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে।

পুরাতন বিমান বন্দর থেকে আমাকে চোখ বেঁধে, ক্যান্টনমেন্টের আর্মি হেড কোয়ার্টারে নেয়া হল। এ সময় আলাপ করতে শুনলাম আমাদের গুলি করে মেরে ফেলা হবে। সারাদিন আটকে রাখল। শুনলাম, সকালে আমাকে শেষ করে দেবে।

ভোর বেলা এক অফিসার এসে দরজা খুলল। আতঙ্কিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ভাবলাম একটু পরেই তো শেষ করে দেবে। কিন্তু কেন যেন আমাদের মারল না। এ সময় আমি দেখেছি যদি কেউ বাঙালিকে গুলি করে মারে তাহলে তার জন্য কোন জবাবদিহিতা করতে হত না। বিচার হত না।

যাহোক, আমাদেরকে আনা হল এয়ার হেড কোয়ার্টার এ্যামুনেশন ডাম্পের গোডাউনে। এখানে অনেক ছোট ছোট খুপরি, ১৫×১০ ফুট। এখানে প্রতিটা সেলে ৫/৬ জন করে রাখত। এসব কুঠুরির মধ্যে ভয়াবহ অন্ধকার। বাতাস চলাচলের তেমন কোন পথ নেই। পেটানোটা ছিল এখানকার একটা স্বাভাবিক রুটিন। পেটানোর কোন ধরাবাঁধা নিয়ম ছিল না। কিল, ঘুষি, লাথি ও রড দিয়ে পেটানো, রাইফেলের বাট দিয়ে পেটানো, বেয়োনেটের খোঁচা, নানা ধরনের। কয়দিন পর আমাকে ইন্টারোগেশন সেলে নিয়ে গেল। প্রশ্ন করার আগে ধমাধম মার দিল। এরপর প্রথমে মেজর র‌্যাঙ্কের একজন আমাকে প্রশ্ন করল, 'তোমার ছুটিতো ফুরিয়েছে কয়েকদিন আগে, তুমি অফিসে জয়েন করনি কেন? তুমি সাতক্ষীরা গিয়েছিলে কেন? তুমি কি মুক্তিযুদ্ধে জয়েন করার প্লান করেছিলে? ইণ্ডিয়ান আর্মি দেখেছ কিনা? কয়টা বিহারী মেরেছ?'

এ ধরনের নানা রকম প্রশ্ন। ইন্টারোগেশন করার সময় চোখ বাঁধা থাকত, আবার কখনও খোলাও থাকত। প্রশ্নের উত্তর না দিলে নির্মমভাবে পেটানো হত। হাতে ও পায়ের তালুতেও টর্চার করত। অর্থাৎ যে সব জায়গায় মারলে বেশি লাগে, সে সব জায়গাতে বেশি অত্যাচার করত। চোখ বাঁধা অবস্থায় রোদের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ বসিয়ে রাখত।

একদিন টর্চারের জন্য একটি খালি রুমে নিয়ে গেল। রুমটিতে একটিমাত্র চেয়ার ছিল। সিগনাল কোরের মেজর ফারুকী এসে ইন্টারোগেট করল। জানতে চাইল আমি আর্মি পার্সন হয়ে ক্যান্টনমেন্ট-এ না গিয়ে কেন সাতক্ষীরা গেলাম। বললাম রাস্তা বন্ধ ছিল। সাতক্ষীরার দিকের রাস্তা খোলা পেয়ে পালিয়ে গেছি।

আমার সাথে মেজর বাশার ও ক্যাপ্টেন হুদাও ছিলেন। উত্তর মনঃপূত না হওয়ায় ওরা আমাদের প্রচণ্ড রকম পিটিয়েছিল। এ টর্চার সেলে পেটাতে পেটাতে মেজর বাশারকে ওরা মেরেই ফেলেছে বলে শুনেছি। মারার দিন আমি তীব্র চিৎকার শুনেছিলাম। পরে একজন

সিপাই আমাকে বলেছিল মেজর বাশারকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। এছাড়া আমি ক্যাপ্টেন হুদাকেও মারতে দেখেছি। টর্চার সেলে মেজর ফারুকী ও তার সঙ্গীরা ক্যাপ্টেন হুদাকেও মেরে ফেলে। পাকিস্তানিরা জানতে পেরেছিল মেজর বাশার ও ক্যাপ্টেন হুদা মার্চে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

আমাদেরকে যে সেলটাতে রাখা হয়েছিল, সেখানে বেশি দিন সবাইকে এক সাথে রাখত না। কিছুদিন পর পর পাল্টান হত। নিরাপত্তা জনিত কারণেই এটা করা হত। এলাকাটির চার দিকে কাঁটা তারের বেড়া দেয়া। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সেলের দরজা খোলা থাকত। সন্ধ্যার সাথে সাথে বন্ধ হত, পরদিন সকালের আগে খোলা হত না। প্রসাব পায়খানা সন্ধ্যার আগে একবারেই করতে হত। পরে কোনভাবেই করা সম্ভব ছিল না।

সকাল বেলায় ওরা টয়লেটে নিয়ে যেত। বাথরুমের সাথে শাওয়ারের ব্যবস্থা করেছিল। টয়লেট বাথ একসাথেই সারতে হত। সারাদিনে আর সুযোগ ছিল না। এক্ষেত্রেও কারো খুব প্রয়োজন হলে কপালে জুটতো এক চোট পিটুনি।

খাবার হিসেবে সকালে দিত এক কাপ চা আর একটা রুটি। দুপুরে এক বাটি ভাত আর ডাল কুমড়ার পানি। পানি বললাম এই অর্থে যে ওটাতে পানি ছাড়া ডাল কুমড়ার অস্তিত্বই থাকতো না। আর রাতে ডাল ভাত। পানি খাওয়ার জন্য প্রত্যেককে দেয়া হয়েছিল একটা করে জেরিক্যান।

বিভিন্ন সময় পাকিস্তান সেনারা সেলের মধ্যে ঢুকে অহেতুক লাঠি, বেত বা বুটের লাথি মারত, যেটা একটা পশুর ক্ষেত্রেও কেউ করে না। হেঁটে যাচ্ছে, হুট করে একটা লাথি মারল। কোথায় মারল এটা বড় কথা নয়। প্রতিদিন আমাদেরকে মেরে নারকীয় উল্লাস করত তারা। এভাবে একদিন প্রচণ্ড আঘাত করল আমার কিডনিতে। হাত দিয়ে রক্ষা করার চেষ্টা করলাম। এতে আরও ক্ষিপ্ত হল তারা। আবার আঘাত করল। প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। এরকম অত্যাচার চলল প্রায় পাঁচ মাস।

আমাদের পাশে ছিল একটা হল রুম। এখানে রাখা হয়েছিল প্রায় দু'শ বেসামরিক বন্দী। একদিন দুপুরে দেখলাম এক যুবককে পাকিস্তানি সৈন্যরা ধরে এনে রোদের মধ্যে নির্মমভাবে পেটাল। বিকাল নাগাদ তাকে মেরেই ফেলল। মরার আগে এই যুবক কয়েকটা লাফ দিয়েছিল। তারপর শেষ। শুনেছিলাম সে নাকি বন্দী অবস্থায় কোন দারোয়ানের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিল।

ওই ঘটনার পর আমাদের সেলেও সবাইকে বর্বরভাবে পেটানো হল রাইফেলের বাট ও বুট দিয়ে। শুনেছি ওখানকার অন্যান্য বন্দীদের ওই দিন ভীষণ ভাবে পেটান হয়। আমরা সেলে বসে শুনতাম একজন সিপাইয়ের কাছ থেকে। মাঝে মাঝে দেখতাম সিপাইদেরকে বন্দীদের লাশ বয়ে নিয়ে যেতে। সিপাইদের কাছে শুনেছি মুক্তিযোদ্ধা বলে কাউকে সন্দেহ হলে বিচিত্র ও নিষ্ঠুরতম পন্থায় তাদের হত্যা করা হত। পিঠে গ্রেনেড বেঁধে পিন খুলে দিয়ে বলত, 'ভাগো।' হতভাগ্য মুক্তিযোদ্ধা দৌড়াতে গিয়ে কয়েক সেকেন্ডের ভেতর ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত।

একদিন সকালে জেনারেল নিয়াজী এল আমাদের ক্যাম্পে। এসে জিজ্ঞেস করল— Having good time?

আমার বুঝতে অসুবিধা হল না good time বলতে সে কি বোঝাচ্ছে। আমার সাথে অনেক বিখ্যাত লোক বন্দী ছিলেন। এর মধ্যে বরিশাল আওয়ামী লীগের নেতা পিস্তল মহিউদ্দীন, বিএনপি'র প্রাক্তন চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ খায়ের, মেজর আলতাফ, মেজর আবদুল্লাহ, যমুনা ব্রীজের কনসালট্যান্ট, আ ন ম ইউসুফ আর এস ও আলম সাহেবের নাম এ মুহূর্তে মনে পড়ছে।

সাধারণত সকাল বেলায় যে সিপাইরা চা-নাস্তা দিয়ে যায়, তারাও চড় থাপ্পড় লাথি দেয়, গালাগালিও করে, রাইফেলের বাট দিয়ে গুতো দেয়। কর্ণেল রব্বানী সাহেব এভাবে একদিন কিডনির উপর রাইফেলের গুতা খেয়ে পরে মারা গেলেন।

এখানকার মারটা ছিল অনেকটা র‍্যানডম। যখন যার ইচ্ছা হল মেরে গেল— এমনি।

একদিন সকালে পেটানোর সময় সেলের আলম সাহেব কি ভেবে তাঁর বেতনের কথা বললেন। সিপাইটা সেই যে রাইফেলের বাট উঁচু করেছিল, আর নামাতে পারেনি। একে বারে থ হয়ে গেল। এত টাকা যে কেউ বেতন পেতে পারে এটা ছিল তার কাছে অবিশ্বাস্য। আমিও অবশ্য থ' বনে গিয়েছিলাম।

অক্টোবর মাসে আমাদেরকে প্রিজনার্স ক্যাম্প থেকে শেরে বাংলা নগর এমপি হোষ্টেলে ভিআইপি কেজে সরানো হল। এখানে প্রায়ই রাতে শুনতাম মেয়েদের কান্না। কান্নাগুলো ভেসে আসত এমপি হোষ্টেলের পিছনের কোয়ার্টারগুলো থেকে।

এমপি হোটেল আমাদের কাছে ওখানকার তুলনায় বেহেশ্‌ত মনে হল। কেননা, এখানে আর কিছু না হোক চব্বিশ ঘন্টা ইচ্ছামত বাথরুমে যাওয়া যেত। এর মধ্যে আমার বিরুদ্ধে চার্জশিট দিল।

নভেম্বর মাসে আমাকে পাকিস্তানে নিয়ে গেল। এর পিছনে কারণ ছিল মুলতানের আমার রেজিমেন্ট চীফের ভূমিকা। সেখান থেকে জিয়া মাসুদ নামে একজন অফিসার এসে আমাকে এখান থেকে খুঁজে বের করে। অবশ্য আমাকে সঙ্গে নেয়নি, তবে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। যাওয়ার আগে বলল, 'আমি তোমাকে এ অবস্থায় দেখতে অভ্যস্ত নই। তোমাকে যে অবস্থায় দেখছি আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না।'

পাকিস্তানে আমাকে রেজিমেন্টে ওপেন এ্যারেস্ট করে রাখা হল। ডিসেম্বরে দেশ স্বাধীন হলেও আমরা ফিরতে পারিনি। আমরা যারা বাঙালি অফিসার ছিলাম সবাইকে একত্র করে খাইবার গিরিপথের কাছে 'সাঘাই' ফোর্ট-এ রাখল। ৮০০-এর মত বাঙালি ছিল। '৭৩-এর ডিসেম্বরে বন্দী বিনিময় চুক্তির অধীনে আমরা বাংলাদেশে ফিরলাম।

বাংলাদেশে আসার পর পাকিস্তানি সৈন্যদের বহু নৃশংসতার কথা শুনেছি। আমার এক আত্মীয়ের কাছে শুনেছি পিরোজপুরে ভগিরথী নামে এক মেয়েকে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে তথ্য সরবরাহের দায়ে মেজর সাজ্জাদ হোসেন নামে এক পাকিস্তান আর্মি অফিসার তার গাড়ির পিছনে বেঁধে সারা শহর ঘুরিয়েছে। শেষ অব্দি ভগিরথীর কঙ্কাল ছাড়া আর কিছু ছিল না। সমস্ত শহরের লোক এটা প্রত্যক্ষ করেছে। এর চেয়েও দুঃখজনক হল কয়েক বছর আগে সেই সাজ্জাদ হোসেন ব্যবসায়িক কাজে বাংলাদেশ ঘুরে গেছে। আমাদের জন্য এর চেয়ে লজ্জাজনক আর কিছু হতে পারে না।

সাক্ষাৎকার ঃ রুহুল মতিন

ওরা আমার দু'বাহু, পিঠ, উরুর পিছন দিক পিটিয়ে রক্তাক্ত করল

নাসের বখতিয়ার আহম্মদ

প্রাইম ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর নাসের বখতিয়ার আহম্মদ ১৯৭১-এ ছিলেন স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের এক নম্বর গ্রেডের অফিসার। ৩০ আগস্ট '৭১ তিনি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে বন্দি হন। তার উপর চালান হয় অমানুষিক, বর্বর নির্যাতন। ৯ সেপ্টেম্বর '৯৯ তার এ নির্মম অভিজ্ঞতার জবানবন্দি ধারণ করা হয়েছে।

তখন আমরা থাকতাম সঙ্গীত পরিচালক আলতাফ মাহমুদদের পাশের বাড়িতে। সেদিন ছিল '৭১-এর ৩০ আগস্টের ভোর। পাঁচটা কি ছ'টা হবে। তখনও ঘুম ভাঙেনি। হঠাৎ বাইরে শুনি দৌড়াদৌড়ি চিৎকার। আর্মি এসেছে, আর্মি এসেছে। বিছানা ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে বসলাম। সোজা এসে দাঁড়ালাম দোতলার বারান্দায়। দেখলাম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে ৮ জনের একদল আর্মি আমাদের বাসার দিকে আসছে। আর্মির ঐ দলের সঙ্গে দেখলাম সামাদ ও আলতাফ মাহমুদও রয়েছেন।

তারা সোজা চলে এল আমাদের বাসার পেছনে টিউবওয়েলের কাছে। সেখানে মাটি খোঁড়া শুরু করল। সত্যি বলতে কি, তখনও পর্যন্ত আমরা জানতাম না ওখানে কি আছে। আমার বড় ভাই চিৎকার করে বললেন, 'তোমরা ওখানে খুঁড়ছ কেন? ওখানে তো কিছু নেই।' আর্মি জোয়ানরা অস্ত্র উচিয়ে ধরল বাসার দিকে। ক্যাপ্টেন অকথ্য ভাষায় গালি দিচ্ছিল। বলল, 'এক্ষুনি নাম।' এমনভাবে বলল যেন তক্ষুণি দোতলা থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে পড়তে হবে।

মাটি খুড়ে বিশাল আকৃতির একটা ট্রাঙ্ক উঠানো হল। ওটা পরিপূর্ণ ছিল বিস্ফোরক ও অস্ত্রশস্ত্রে। সম্ভবতঃ ওখানে রাখা হয়েছিল রাজারবাগ পুলিশ লাইনে অবস্থানকারী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করার জন্য।

যা হোক পাকিস্তানি সেনারা তখনই আমাদের দুই ভাই ও আশেপাশের ১৫ থেকে

৫০ বছর বয়সের পুরুষদেরসহ মোট ১১ জনকে আলতাফ ভাই-এর সাথে ক্যান্টনমেন্টের ফোর্টিন টিম হেড কোয়ার্টারে নিয়ে যায়।

দু'টি ভ্যানে জায়গা হচ্ছিল না বলে তনুকে লাথি মেরে ফেলে দিল পথের মধ্যে। ক্যান্টনমেন্টে আমাদের প্রত্যেকের নাম ঠিকানা নেয়া হল। আটকে রাখা হল এক ঘন্টা। তারপর ওরা আমাদের নিয়ে যায় নাখালপাড়া এমপি হোস্টেলে। তখন ওটাকে ব্যবহার করা হত মার্শাল ল কোর্ট হিসাবে।

প্রথমে আমাদেরকে দাঁড় করানো হল একটা লাইনে। ওখানে আগে থেকেই আরো কয়েকজন ছিল। পরে ১৭/১৮ জনের সবাইকে গরুর মত পেটাতে পেটাতে দোতলার একটা রান্না ঘরে নিল। রান্না ঘরটার সাইজ হবে বড় জোর ১০ ফুট বাই ১২ ফুট। এরপর তালিকা থেকে নাম ধরে ডাকল পাশের রুমে। অমানবিক নির্যাতন শুরু করল। আমরা চিৎকার গোঙানি শুনছি রান্না ঘর থেকেই। আর ভয়ে পাথর হয়ে যাচ্ছি। একের পর এক ডাকা হচ্ছিল সবাইকে।

এক সময় আমার ডাক পড়ল। রুমের ভিতরে নিয়ে ৪/৫ জনের গ্রুপের একজন উর্দুতে প্রশ্ন করল— অস্ত্র কোথায়? তোর সাথে আর কে ছিল? মুক্তিযোদ্ধাদের নাম বল? ঠিকানা বল। আমি বললাম, আমি কিছুই জানি না। আমি সরকারী চাকরি করি। আমি কিছুই জানি না। ক্যাপ্টেনটা ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, 'সুয়ারকা বাচ্চা, তুম গভর্ণমেন্ট কা নকরি কারতা অর রাত মে মুক্তিবাহিনী কি সাথ দেতা?'

ক্যাপ্টেনের নাম সঠিক মনে নেই, সম্ভবতঃ ক্যাপ্টেন রশিদ। যা হোক, এই বলে আমাকে উপুড় করে শোয়াল। দু'হাত দু'দিকে প্রসারিত করে দু'জন জোয়ান হাত দু'টি পা দিয়ে চেপে ধরল। একজন মাথার উপর পা দিয়ে নিচু করে রাখল। অন্য আর একজন পায়ের দিকে, দু'পায়ের উপর দাঁড়িয়ে ঠিক যেভাবে ধোপা কাপড় ধোয়, সেভাবে পেটাতে শুরু করল। আমি কোন দিকে নড়তে পারছিলাম না। যন্ত্রণায় ছটফট করতে চাইলাম । কোন উপায় নেই নড়ার। মাথা চেপে রেখেছিল এজন্য যেন মাথায় বাড়ি না লাগে।

এভাবে পেটাল ২০ থেকে ২৫ মিনিট। আমার পরনে ছিল ট্রাউজার শার্ট। ওরা আমার দু' বাহু, পিঠ, উরুর পিছন দিক পিটিয়ে রক্তাক্ত করল। শরীর ফেটে রক্ত প্রবাহিত হল। জামা ভিজে মাটিতে পড়ল রক্তের ফোঁটা। আমি মার সহ্য করতে না পেরে বেহুঁশ হয়ে গেলাম। যখন হুঁশ ফিরল তখন দেখলাম রান্না ঘরে পড়ে আছি। আমি দেখেছি বেহুঁশ হওয়ার পরও অন্যদের পেটাতে। এক সময় ওই রুমের মধ্যে ফেলে রাখত অথবা হাত বা পা ধরে টেনে রান্না ঘরে এনে ফেলে দিত। এভাবে চলত এক জনের পর একজনকে অত্যাচার। যারা বেহুঁশ হত তাদের মুখে ঘাড়ে পানির ছিটা দিয়ে আমরা হুঁশ ফেরাতাম। ধারাবাহিকভাবে ৩/৪ ঘন্টা পর আবার নেয়া হত টর্চার রুমে। একই প্রশ্ন করত সবার কাছে।

ওরা নখের মধ্যে সূঁচ ফোটাতো। আর নখ উপড়ানো হত লোহার চিমটে জাতীয় কিছু একটা দিয়ে। আমরা রান্নাঘর থেকে প্রচণ্ড আর্তনাদ শুনতাম। তারপর অজ্ঞান হয়ে যেত যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে। আমার বড় ভাইকে পিটিয়ে ওরা আঙুলে ফ্রাকচার করে দিয়েছিল। নখ উপড়ানো ছিল মুলতঃ সেকেণ্ড ডিগ্রি টর্চার। থার্ড ডিগ্রি তো মেরে

ফেলা। যা হোক পিঠের ওই ব্যাথা আমাকে এখনও মাঝে মাঝে কষ্ট দেয়।

এ ছাড়া আমার ক্ষেত্রে ওরা আর যেটা করত সেটা হচ্ছে— জ্বলন্ত সিগারেট গায়ে চেপে ধরে নিভিয়ে ফেলা। কোন কারণ ছাড়াই যখন তখন বুটের বাড়ি মারা, কিল, ঘুষি, লাথি এগুলো তো আছেই। অন্যান্যদের ক্ষেত্রে অত্যাচারটা আমার চেয়ে আরো বেশি হত। কাউকে কাউকে উলঙ্গ করে রেকটামে জলন্ত সিগারেট ঢুকানো হত। আমাদের মাঝে ছিল নাম করা আর্টিস্ট আলভী। ওকেও আলতাফ মাহমুদের বাসা থেকে ধরা হয়। ও যখন বলেছে আমি আর্টিষ্ট তখন ওর নখ-উপড়ে ফেলা হয়েছে। জোরে চিৎকার দিতে শুনেছি টর্চার রুম থেকে।

আলতাফ মাহমুদের উপর আমি যে অত্যাচারটা দেখেছি তা সাংঘাতিক নির্মম, ভয়াবহ অমানবিক। আমি নিজের চোখে দেখেছি, তাঁকে পাশের রুমে ফ্যানের সিলিং-এর সাথে পা বেঁধে দিয়েছিল। ওঁর পরনে লুঙ্গি গেঞ্জি ছিল। ওরা দড়িতে ঢিল দিত। নীচের ধোঁয়া ওঠা গরম পানির হাড়িতে মুখ ডুবিয়ে রাখত কিছুক্ষণ। তারপর দড়ি ধরে টেনে আবার ঝুলিয়ে রাখত। উহুঁ বলে খুব জোরে নিঃশ্বাস নিতেন আলতাফ ভাই। তারপর জিজ্ঞাসা করা হত, 'বোল শালা, কাহা মাল রাখা হ্যায়। কোন লোক তেরা সাথ থে।'

আমরা তো সবাই জানের ভয়ে উদুর্তে যে যেমন পারি, উত্তর দিয়েছি। আলতাফ ভাইই একমাত্র বাংলায় উত্তর দিতেন, তোমরা যা ইচ্ছা তাই কর আমি কিচ্ছু জানি না। এটা অনেকদিন বিভীষিকার মত মনে হত আমার কাছে। হেভী বডি ছিল ওনার, মুখ থেকে রক্ত ঝরছে, চুল উস্‌কো খুসকো, পানি পড়ছে। এখনও বলতে গিয়ে আমার গা শিউরে উঠছে। প্রথম দিকে প্রায় বছর খানেক আমি ঘুমুতে পারতাম না । ঘুমের মধ্যেই চিৎকার করে উঠতাম।

টর্চারের শেষ ছিল না। সারা দিন চলত, এক নাগাড়ে। একদল আসছে মারছে, চলে যাচ্ছে। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারটা ছিল এরকম— পাকিস্তানি সেনারা খাওয়া দাওয়ার পর রুটি মাংসের এঁটো অংশটুকু আমাদের দিত। তাও ছুঁড়ে ফেলে দিত। বলত ওটা থেকেই খাও। না খেলেও মারত। সে দিনগুলোর কথা চিন্তা করতে এখনও আমার ভয় হয়।

সারাদিন টর্চার করার পর রাত ১০টার সময় আমাদের রমনা থানায় আনা হত। রাতে এমপি হোস্টেলে রাখত না। যারা পুলিশের লোক, প্রায়ই বাঙালি— তারা পেনাডল ট্যাবলেট, আয়োডেক্স মলম আমাদের গায়ে দিয়ে দিত। রাতে আমরা যে কয়জন ছিলাম, তাদেরকে দু'আনা দামের রুটি আর এককাপ চা দিত। ব্যক্তিগতভাবে এসে বলত আমরা যে দিচ্ছি এটা কাউকে বলতে পারবে না।

যা হোক পরের দিন যখন একইভাবে পেটাতো তখন শরীর থেকে মলমের গন্ধ বেরুত কিন্তু সেটা নিয়ে আর্মিরা কখনও প্রশ্ন করেনি। বিষয়টা আমাকে অবাক করেছে। আর্মিরা টর্চারের সময় তাদের বুকে আটকানো নামটা খুলে ফেলে পকেটে রাখত। কেবল গ্রেডিং এর ব্যাজটা পরে থাকত। ক্যাপও খুলে ফেলত। যা হোক আমাদের টানা চার দিন টর্চার করা হল। এ সময় কাউকে মরতে দেখিনি ঠিকই কিন্তু নিখোঁজ হতে দেখেছি। এর মধ্যে রুমী, জুয়েল, বদি, বাকের, আজাদ, বাশারসহ আরো কয়েকজন

নিখোঁজ হয়েছে। পরে শুনেছি তাদেরকে ক্যান্টেনমেন্টে নিয়ে মেরে ফেলা হয়েছিল ওই সময়টায়। এ ক'দিনের অত্যাচারে আমার সোজা হয়ে দাঁড়ানোর শক্তি ছিল না।

চতুর্থ দিন ১২টার দিকে আমাদের এমপি হোস্টেল থেকে ক্যান্টনমেন্টে নেয়া হল। এখানে আমাদের আধা ঘন্টা বসিয়ে রাখা হল। সে সময় একজন কর্ণেল, সম্ভবতঃ কর্ণেল হেজাজী, আমাকে জিজ্ঞেস করল 'ঘর যা না মাংতা?' উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ'।

কর্ণেল তখন বলল, তো ঠিক হ্যাঁয়, তুমকো ছোড় র‍্যাহে। দু সপ্তাহ বাড়িতে থাকবে। অফিসে যেতে হবে না। আর খবর রাখতে হবে কে কোথায় কি কাজ করছে। তুমি যদি এর কোনটারও অবমাননা কর তাহলে তোমাকে আমরা আবার ধরে এনে টর্চার করব। আমাদের লোক চারিদিকে তোমাকে ফলো করবে। বাসায় যাবে, কাউকে কিছু বলতে পারবে না।

এরপর, প্রথম বারের মত ঠাণ্ডা ভাষায় একজন জোয়ানকে বলল, 'সাবকো রিক্সা মে উঠা দো।' এর আগে সুয়ারকা বাচ্চা, কাফের, মোনাফেক, গাদ্দার যা ইচ্ছে তাই বলে গালি দিত। এ প্রথমবার সম্মান করে কথা বলল। তখনো কিন্তু আমার মুখের ওপর সার্চ লাইট ফেলা। যেন আমি মুখ ঘুরিয়ে আশে পাশের কিছু দেখতে না পাই।

যা হোক, রিক্সায় চড়ে আমি বাসা পর্যন্ত এসে দেখি আমার পিছে আমার বড় ভাই আসছে। রিক্সাওয়ালাকে বললাম, 'দাঁড়াও বাবা, আমার কাছে তো কোনো টাকা পয়সা নেই, আমি এনে দিচ্ছি।'

রিক্সাওয়ালা কেঁদে ফেলল। বলল, 'বাবা ওরা তো আমাকে পয়সা নিতে মানা করেছে।' এরপর আমি যখন পয়সা নিয়ে বাইরে এলাম দেখলাম ও ভয়ে পালিয়েছে। আমাকে ছাড়ার আগে নিষেধ করার কারণে আমি ডাক্তারের চিকিৎসা পর্যন্ত নিতে পারিনি। আমার মা-দাদী চিকিৎসা করে, বাসায় হলুদ ও অন্যান্য জিনিস দিয়ে কিছুটা সুস্থ করে।

আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের কাপড়, টাকা-পয়সা, খাবার দিয়েছি প্রচুর। যখন যতটুক তথ্য দেয়া দরকার দিতাম।

আমি মুসলিম লীগ কিংবা মৌনভাবে যারা পাকিস্তানপন্থী ছিল, তাদের দোষ দেই না এ জন্য যে, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ থাকতেই পারে। কিন্তু যারা ক্রিমিনাল, যারা লক্ষ লক্ষ মানুষকে খুন করেছে, মা -বোনকে ধর্ষণ করেছে, গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে তাদের শাস্তি হওয়া অবশ্যই উচিত। জার্মানে হিটলারের রাজত্ব ছিল। সেই ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। কিন্তু এখনও দোষীদের খুঁজে বের করে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। ১৯৯৮ পর্যন্ত আমি জানি, তারা আর্জেন্টিনা থেকে একজন জেনারেলকে ধরল। তার বিচার হয়েছে। আমাদের দুর্ভাগ্য যুদ্ধাপরাধীদের বিচার আজও আমাদের দেশে হয়নি। জানি না, যারা ক্ষমতায় ছিল এতকাল, কিংবা যারা এখন ক্ষমতায় আছে তারা এর কী জবাব দেবে।

সাক্ষাৎকার ঃ রুহুল মতিন

আমি গুলির শব্দের পূর্বে ভেবেছিলাম আমাদের ওরা গুলি না করে আগুনে পুড়িয়ে মারবে

দূর্গাদাস মুখার্জী

বগুড়ার বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা ও সাংবাদিক দূর্গাদাস মুখার্জী '৭১-এ ঢাকায় এসে পাকিস্তানিদের হাতে গ্রেফতার হন। গ্রেফতারের পর তাকে নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকার হিন্দু প্রধান এলাকা শাঁখারী বাজারে। সেখানে তিনি প্রত্যক্ষ করেন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যা ও নারী নির্যাতন সহ যাবতীয় ধ্বংসযজ্ঞ। ১২ অক্টোবর '৯৯ তারিখে স্বাক্ষরিত দূর্গাদাস মুখার্জীর লিখিত জবানবন্দির সংক্ষিপ্ত ভাষ্য প্রকাশ করা হল।

১৯৭১ সালের ১লা মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য নব নির্বাচিত পাকিস্তান জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন তৎকালীন সামরিক স্বৈরশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান স্থগিত করে দেয়। ইয়াহিয়া খানের এই ঘোষণায় সমগ্র বাঙালি জাতি বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ঢাকা শহর সহ দেশের অন্যান্য শহর সেদিন রূপান্তরিত হয় মিছিলের শহরে। অবিসম্বাদী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডাক দিলেন অসহযোগ আন্দোলনের। এরপর থেকে ঢাকা তথা বাংলাদেশের বুক থেকে অপসৃত হতে থাকে পাকিস্তানের শাসন। বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ এক বিরাট জনসমুদ্রে নির্দেশ দিলেন, 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো।' তিনি রেস কোর্সের জনসমুদ্রে বললেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

আমি তখন পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। পার্টি ছিল বেআইনি। আমি ছিল বরিশালে আন্ডারগ্রাউন্ড অবস্থায়। ২৩শে মার্চ স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সমগ্র দেশে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রস্তাবিত পতাকা উত্তোলনের আহ্বান জানায়। এই আহ্বানে স্বাধীনতার স্বপক্ষের জনতা ও বরিশালে মুসলিম লীগ ও পাকসেনাদের সমর্থকদের বাড়ির শীর্ষে বাংলাদেশের পতাকা

উত্তোলনের হিড়িক পড়ে যায়।

ঐদিন কয়েকজন রাজনৈতিক বন্ধু আমাকে পরামর্শ দিলেন, দেশের যে পরিস্থিতি এমতাবস্থায় আমার বরিশালে থাকা উচিৎ হবে না। সামনে ভয়নক বিপদ। সে কারণে আমাকে সপরিবারে ঢাকায় যেতে হবে।

সপরিবারে ঢাকা যাবার কথা আমার দিদিমাকে বললে তিনি আমাকে জানান, আমার স্ত্রী গর্ভবতী। সেই পরিস্থিতিতে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় কোথাও থাকা ঠিক হবে না। দিদিমার কথামত আমি আমার স্ত্রীকে সাবধানে থাকার পরামর্শ দিয়ে পরের দিন ২৪শে মার্চ বরিশাল থেকে লঞ্চে চড়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিই। লঞ্চটি ঢাকায় সকাল ৭টার মধ্যে পৌছার কথা। কিন্তু বরিশাল থেকে ঢাকা যাবার পথে মেঘনা পাড়ি দেবার সময় কুয়াশায় বেশ কয়েক ঘন্টা আটকে থাকতে হয়। অবশেষে ঢাকার সদর ঘাটে বেলা ১২টার পর পৌঁছি। এদিকে আমার যে বন্ধুটি আমাকে সঙ্গে করে শেলটারে নিয়ে যাবার কথা তিনি বেলা ১১টা পর্যন্ত অপেক্ষা করে চলে যান।

ঢাকায় পৌঁছে, আমার কোন বন্ধুকে দেখতে না পেয়ে প্রথমে কিছুটা হতাশ হলাম। এ ছাড়া সেদিন সদর ঘাটের যাত্রী-সাধারণের ভীড় নেই, যানবাহনের মধ্যে রিকসা খুবই অল্প। সদরঘাটের সে দিনের চিত্র থমথমে।

এ অবস্থায় আমি সিদ্ধান্ত নিই সদরঘাটের নিকটে নর্থব্রুক হল রোডে আমাদের এক আত্মীয়ের বাসায় উঠে পরে আমার বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করব।

বেলা প্রায় ১টায় নর্থব্রুক হল রোডের আত্মীয়ের বাসায় গিয়ে পৌঁছার পর জানতে পারি তিনি দু'দিন পূর্বে ঢাকা ত্যাগ করে ভোলায় চলে গেছেন। ক্লান্ত দেহে আমি চিন্তা করছি, কি করব। এমন সময় ঐ বাড়ির এক ভাড়াটিয়া আমাকে বললেন, আমার শিক্ষক আত্মীয় ছাত্রদের পড়ানোর জন্য যে ঘর ব্যবহার করেন সেটি খোলা আছে। আমি কিছুটা নিশ্চিত হয়ে ঘরটি খুলি, একটি চৌকি দেখতে পাই। চৌকির উপর আমি সঙ্গে আনা বিছানাপত্র বিছিয়ে কিছু সময় বিশ্রাম করি। সন্ধ্যার দিকে আমাদের সে সময়কার পার্টি কর্মী সাংবাদিক সৈয়দ জাফরের সঙ্গে দেখা করতে যাই। জাফর সাহেবের সঙ্গে দেখা হলে তাঁর সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ভবিষ্যতে কি হতে পারে এসব নিয়ে আলোচনা করি। তিনি জানালেন, ইয়াহিয়া খান, ভুট্টো ও শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনা বৈঠক প্রহসনে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে দলে দলে পাক সেনাবাহিনী গোলা বারুদ নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে আসছে। বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর দেখা গেছে। পরিস্থিতি খুবই উদ্বেকজনক। শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর মধ্যে কোনও মিমাংসা হয়নি। সৈয়দ জাফরের সঙ্গে আলোচনা করার সময় দেখি রাস্তাঘাটে লোকজন নেই, রিক্সা নেই বললেই চলে। থমথমে অবস্থা। এর মধ্যে সংবাদ পাই ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করেছে। একটা বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটার আশঙ্কায় ঢাকাবাসী তটস্থ।

এদিকে আমি কি করব বললে সৈয়দ জাফর আমার নিকট নর্থব্রুক হল রোডের ঠিকানা নিয়ে বলেন, রাতে ওখানে থাকবেন। পরের দিন আমাকে সঙ্গে করে শেলটারে যাবেন। আমি সেদিন নর্থব্রুক হল রোডে আসার পথে জন মানুষ শূন্য পথঘাট দেখতে

পাই। প্রায় সকল দোকান বন্ধ। যা ১টি খাবারের দোকান খোলা থাকলেও খাবার শূন্য। আমি একটি হোটেলে সামান্য কিছু খেয়ে দ্রুত বাসায় পৌছে ক্লান্ত শরীরে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

২৫ মার্চ রাত অনুমান ১২টার দিকে প্রচন্ড গোলাগুলির শব্দে বাসার সকলে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। গোলাগুলির শব্দে আমারও ঘুম ভেঙে যায়। ঘরের বাইরে এসে লক্ষ্য করি সমগ্র আকাশ লালে লাল; প্রজ্বলিত আগুনের ফুলকি। চারিদিকে আগুন জ্বলছে। কি হচ্ছে প্রথমে পরিপূর্ণ বুঝতে না পারলেও অনুমান করতে পারি— দখলদার পাক সেনাবাহিনী বাঙালি নিধন যজ্ঞ শুরু করেছে।

বাসার সকলে সারারাত আতঙ্কে কাটালাম। ২৬শে মার্চ রেডিও থেকে কারফিউ জারির সংবাদ জানতে পারি। ২৬শে মার্চ সারাদিন ও রাত বাড়িতে আবদ্ধ থাকি। আমরা সকলে ভয়ার্ত ও আতঙ্কিত ছিলাম।

২৭শে মার্চ, কারফিউ কয়েক ঘন্টার জন্য প্রত্যাহার করা হলে, ঐ বাসায় ভাড়াটিয়াদের কয়েকজন আত্মীয় এসে ২৫শে মার্চ ও ২৬শে মার্চ দখলদার পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক বাঙালি নিধনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিলে আমি আরও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ি। এ ধরনের নিষ্ঠুর, অমানবিক হত্যাকান্ড ঘটতে পারে কখনও ধারণা করিনি।

আমি বাসা থেকে বের হয়ে পড়ি, বগুড়া না গিয়ে বরিশালে যেতে পারি কিনা এ উদ্দেশ্যে। প্রথম সদরঘাটের দিকে এগিয়ে যাই। সদরঘাটের দিকে এগিয়ে যেতে দেখতে পাই দোকানপাট আগুনে ভষ্মিভূত, কয়েকটি মার্কেট ছাই হয়ে গেছে। রাস্তায় চাপ চাপ রক্ত। সদরঘাটে ভয়াল রাতে যে নৃশংস হত্যাকান্ড ঘটেছে তার বহু চিহ্ন দেখতে পাই। রক্ত পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করা হলেও সমগ্র সদরঘাটের এলাকা জুড়ে রক্ত। অসংখ্য বাঙালি নিধনের ফলে এত রক্তের চিহ্ন তখনও বিদ্যমান ছিল।

সদরঘাটে পন্টুনে কোন লঞ্চ, নৌকা নেই। পাকসেনাদের সারি সারি গান বোট সদরঘাটে কামান তাক করে আছে। গা ছম ছম করতে থাকে। বেশি সময় থাকা ঠিক হবে না ভাবছি। এ সময় লক্ষ্য করলাম দোকানের আড়ালে এক যুবক ছোট্ট একটি ট্রানজিস্টার রেডিও কানে লাগিয়ে কি যেন শুনছেন। আমি তার নিকট গিয়ে দাঁড়ালাম। শুনতে পেলাম, বঙ্গবন্ধুর পক্ষে মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা। আমি ভালভাবে শোনার জন্য লোকটির নিকটে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি ভয়ার্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রেডিওটা লুকিয়ে দ্রুত ঐ স্থান ত্যাগ করেন।

আমি ঐ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিই, আমার স্ত্রী ও ২ পুত্র বরিশালে আছে, আমাকে বরিশালে পৌছতে হবে এবং সঙ্গে করে শুকনো খাবার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে। এই ভেবে আমি সদরঘাট থেকে নর্থব্রুক হল রোডের বাসায় যাবার পথে কোন দোকানপাট খোলা দেখতে পাই না। আমি বিউটি বোডিং এর সম্মুখ দিয়ে যাবার সময় লক্ষ্য করি দুই দিন পূর্বে অর্থাৎ ২৫শে মার্চ দিনের বেলায় বোর্ডিং-এর যে ঠাকুর ভাত দিয়েছে, সেই ঠাকুর, বোর্ডিং-এর চাকর এবং কয়েকজন বোর্ডারকে পাকসেনাবাহিনীর লোকেরা অস্ত্রের মুখে নিয়ে যাচ্ছে। পাক সেনাবাহিনীদের সঙ্গে বেশকয়েকজন অবাঙালিকে দেখতে পাই। আমি এই দৃশ্য দেখে দ্রুত সরে যাই,

পথিমধ্যে আরও দেখি বেশ কয়েকটি বাড়ি থেকে পাক সেনারা অস্ত্রের মুখে লোকজনকে নিয়ে যাচ্ছে। আমি খুবই সতর্কতার সঙ্গে দ্রুত নর্থব্রুক হল রোডের বাসায় ঢুকে বাসার সকলের উদ্দেশ্যে বললাম, 'আপনারা এখনি বাসা ত্যাগ করে পালিয়ে যান। পাক সেনারা বাড়ি থেকে বাঙালি লোকজনদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে।'

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা ঐ বাড়ির এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার কথা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। তিনি আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'আমাদের কি হবে? আমরা কি নক্সাল বা জয়বাংলার লোক?' এর জবাবে আমি তাঁকে জানাই, ২৫শে মার্চ যে গোলাগুলি হয় এবং আক্রমণ চলে সে আক্রমণ চালায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালি সেনাবাহিনীর উপর, বাঙালি ই-পি-আর, বাঙালি পুলিশের উপর, বিশেষ করে রাজনৈতিক নেতৃবর্গের যাঁরা বাঙালি জাতির স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। দখলদার বাহিনী নিরাপরাধ অসহায় গরীব দুঃখী মানুষদের বস্তি পুড়িয়ে জ্বালিয়ে ধ্বংস করেছে এলাকার পর এলাকা। আমার নিকট থেকে ভয়াবহ ঘটনার কথা শুনে বৃদ্ধ ভদ্রলোক আর কোন প্রতিবাদ করলেন না। এর মধ্যে তার দুই ছেলে বাবাকে বলে, 'আমরা বাইরে গিয়ে দেখে আসি প্রকৃত ঘটনা কি।' এই কথা বলে তারা বাইরে চলে গেল।

আমার নিকট থেকে ভয়াবহ বিভীষিকাময় নির্যাতনের কথা শুনে ঐ বাড়ির এক ভদ্রলোকের সুন্দরী স্ত্রী তার স্বামীকে বার বার বলছিল, চল আমরা এখনি বাড়ি থেকে বের হয়ে যাই। কিন্তু স্বামী ইতস্ততঃ করছিল।

আমি আমার কিছু জিনিসপত্র নিয়ে ঐ বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবার জন্য পাশের বাড়ির প্রাচীরে উঠার সময় আমার পা ধরে টানলেন সদ্য বিবাহিত সুন্দরী বধূ, তিনি আমাকে অনুনয় করে বললেন, দেখুন তো আমার স্বামীকে বাইরে মারধর করছে। আমি তার কথা শুনে সহজেই অনুমান করলাম আর রক্ষা নেই। পাচিল টপকে বধূটি পালাবার সুযোগ ছিল না। আমি দালানের ফাঁক দিয়ে লক্ষ্য করি, পাকসেনারা সম্পূর্ণ বাড়ি ঘিরে রয়েছে। এ বাড়িটি ছিল এক হিন্দু জমিদারের। এলাকার বিখ্যাত বাড়ি। বুঝলাম পালাবার আর পথ নেই।

কিছুক্ষণের মধ্যে মারণাস্ত্র নিয়ে একদল পাক সৈন্য বাসায় ঢুকে পড়ল। সৈন্যরা আমাদের নির্দেশ দিল হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে। এক পাকসেনা আমার বুকে থাবা দিয়ে বলতে থাকে, 'তুম জয় বাংলা কা আদমী, তুমহারা পাস বোম হ্যায়। বোম কাঁহা হ্যায়?' ইতোমধ্যে অন্যান্য সৈন্যরা ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র ট্রাঙ্ক, বাক্স ভেঙ্গে মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করতে থাকে। আমার নিকট যে ব্যাগ ছিল তার মধ্যে আমার স্ত্রীর একটি মূল্যবান সোনার মালা ছিল। এবং টাকা ছিল বেশ কয়েক হাজার। সৈন্যরা ঐসব জিনিস পেয়ে খুবই খুশি। আমাকে জিজ্ঞাসা করে তাদের ভাষায়, আমাকে ছেড়ে দেবে যদি মূল্যবান গহনা ও টাকা দিতে পার। আমি এর উত্তরে বলি, যা ছিল তা তো তোমরা সবই নিয়েছ, এখন আর কিছুই নেই।

বেশ কিছু সময় লুটপাট করার পর পাকসেনারা বাসার ৫ জন মহিলাকে একটি ঘরে ঢুকিয়ে শিকল দিয়ে আটকে রাখল। অন্যদিকে আমরা ৭ জন পুরুষ হাত উঁচু করে পাকসেনাদের অস্ত্রের মুখে লাইন করে দাঁড়িয়ে আছি। এর মধ্যে নূতন একদল পাকসেনা

বাসার ভিতর ঢুকল। তারা এসেই আমাদের বুকের দিকে আধুনিক মারণাস্ত্র ঠেকিয়ে বলে, 'কেউ কোন কথা বলবে না।' এরপর আমাদেরকে বাসা থেকে লাইনবদ্ধভাবে বাইরে নিয়ে যায়। আমাদেরকে সতর্ক করে বলা হয় কেউ এদিক ওদিক তাকাতে পারবে না।

আমাদের পাক সেনারা একটি পার্কের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখে কিছু সময়। এর কিছু পর একটি সামরিক বহরের মধ্য থেকে একটি সামরিক বাহিনী বোঝাই বড় ধরনের গাড়ি এল। ঐ গাড়ির মধ্য থেকে বেশ কয়েকজন সেনাসদস্য আমাদের নির্দেশ দিল পিঠে পিঠে হাত দেবার জন্য। আমরা পিঠে পিঠে হাত রেখে তাদের নির্দেশমত চলতে থাকি। এ সময় কারফিউ না থাকার জন্য রাস্তায় ভীত সন্ত্রস্ত লোকজন চলাচল করছিল। আমি আড়চোখে দেখলাম কি ভীতকর পরিস্থিতি। পাকসেনাদের নির্দেশমত এগিয়ে যাচ্ছি যন্ত্রচালিতের মত আর ভাবছি একটু পরেই আমাদের মরতে হবে। আমার স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, রাজনৈতিক দলের সাথীরা কেউ জানতে পারবে না।

আমরা সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে চলেছি। দেখতে পেলাম সামনে জগন্নাথ কলেজ। আমাদেরকে জগন্নাথ কলেজে ঢোকান হল। কলেজে ঢুকে আড় চোখে লক্ষ্য করি, বেশ কয়েকজন লোককে বেঁধে রেখেছে। এর মধ্যে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মৃত বলে মনে হল কয়েকজনকে। এই দৃশ্য দেখে আমার বদ্ধ ধারণা হল পাকসেনারা আমাদের এভাবেই হত্যা করবে।

পাকসেনারা আমাদের একটি হল ঘরে গুনতি করে ঢুকিয়ে দিল। সেই হল ঘরে সেনাবাহিনীর যে সকল প্রহরী ছিল তারা আমাদের গুনতি করে নিল। আমাদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হল সবাই চুপচাপ বসে থাকবে, কেউ কারো দিকে তাকাতে পারবে না। আমি আড়চোখে সমস্ত হলঘরের বন্দিদের দেখতে পেলাম। এর মধ্যে বিউটি বোর্ডিং সহ অন্যান্য যে সকল বাঙালিদের আটক করেছিল তাঁরা সবাই ঐ ঘরে চুপচাপ বেঞ্চে বসে আছেন। আমার ধারণা হল এ সকল বন্দি হিন্দু সম্প্রদায়ের হবে। এর মধ্যে বেশ কয়েকজনকে ধুতিপরা অবস্থায় দেখতে পাই। হল ঘরে যে সকল সামরিক বাহিনীর সেনারা ছিল তারা চা পান করছে। আর আমাদের প্রতি অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করছে। তাদের ভাষা এতই কু ৎসিৎ ছিল যা লেখার মত নয়। যেমন, 'মাদারচোৎ, বানচোৎ, জয়বাংলা আদমী মালাউন কা বাচ্চা' প্রভৃতি অশ্লীল মন্তব্য করছে আর হাসাহাসি করছে। বাঙালি জাতিকে কুৎসিত ভাষায় গালমন্দ করছিল সব সময়। ওরা "জয়বাংলা" শব্দ বার বার বলছিল আর গালাগাল করছিল।

এ অবস্থায় প্রায় সন্ধ্যা গড়িয়ে এল। আমি স্থির করি মলত্যাগের কথা বলে পায়খানায় গিয়ে পালাবার চেষ্টা করতে পারি কি না। আমি উর্দু ভাষায় মলত্যাগের কথা বললে প্রথমে সেনা প্রহরীরা গালাগাল করে বলে হল ঘরের কোনায় গিয়ে মলত্যাগ কর। কিন্তু বুদ্ধি খাটিয়ে বলি ঘরে মল ত্যাগ করলে গন্ধ উঠবে, তাতে তাদের অসুবিধা হবে। আমার কথা শুনে প্রহরীদের মধ্যে দু'জন আমার কোমরে দড়ি বেঁধে পায়খানায় নিয়ে

যায়, কিন্তু পায়খানা থেকে পালিয়ে যাবার কোন পথ খুঁজে পেলাম না। কিছু পানি ফেলে পুনরায় হল ঘরে এসে বসে পড়ি।

বন্দিদের মধ্যে কয়েকজন পানি পান করার কথা বললে তাদের পানি না দিয়ে চড় থাপ্পড় মারা হল। সারাদিন অভুক্ত অবস্থায় বন্দিরা নির্বাক নিশ্চল অবস্থায় বসে আছে। অন্যদিকে প্রহরীরা ঘন ঘন চা পান করে চলেছে আর ওদের ভাষায় গালাগালি করে মহাউল্লাসে আনন্দ করছে।

এমতাবস্থায়ও বন্দিদের মধ্যে এক বৃদ্ধ ব্যক্তি ক্লান্ত দেহে ঝিমুচ্ছিলেন, হল ঘরের বর্বর সামরিক সেনা ঐ বৃদ্ধের পাশে বসে থাকা এক যুবক বন্দিকে নির্দেশ দিল বৃদ্ধ লোকটিকে থাপ্পড় মারার জন্য। যুবকটি থাপ্পড় মারতে ইতস্তত করছিল। এমন সময় এক সৈন্য উঠে এসে ঐ যুবককে প্রচণ্ড থাপ্পড় মেড়ে দেখিয়ে দিল, কিভাবে থাপ্পড় মারতে হয়। অবশেষে যুবকটি বাধ্য হয়ে বৃদ্ধ ভদ্রলোককে থাপ্পড় মারল। অতর্কিতে থাপ্পড়ের আঘাতে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি মাথা ঘুরে নীচে পড়ে যান। এরপর সেনারা কয়েকজন এসে কিল, ঘুষি মারতে থাকে আর বলে, 'নিদ নেহি হোগা।'

এক বন্দি প্রস্রাব করবে বললে সেনারা বলে, 'পেসাব নাহি হোগা।' মাঝে মধ্যে সেনারা বন্দিদের নিকট গিয়ে গালাগালি করে মারধর করে অট্টহাসি হাসতে থাকে।

কিছুক্ষণ পর সেনাবাহিনীর এক পদস্থ ব্যক্তি এসে ভদ্রভাবে আমাদের উদ্দেশ্যে তাদের ভাষায় বলে, আমাদের মেজর সাহেব দেখা করবেন। আমরা তাকে যেন জানাই, আমরা জয় বাংলার লোক নই। তাহলেই আমাদের ছেড়ে দেবে। এই কথা বলেই সেই ব্যক্তি বন্দিদের নিকট কিছু মূল্যবান জিনিসপত্র আছে কিনা তা তল্লাসি করতে থাকে। কয়েকজন বন্দির নিকট সোনার আংটি ও টাকা ছিল। সে সব নিয়ে তাদের নাম জেনে নিয়ে বলে, পরে সব ফেরৎ দেয়া হবে।

আমি ঐ সেনাসদস্যের কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারি, গচ্ছিত দ্রব্যের কোন লেখালেখি নেই। সম্পূর্ণ প্রতারণামূলক কার্যক্রম। আমার পকেটে কিছু বাতের ব্যথার ঔষধ ও খুচরা পয়সা ছিল— ঐ সব নিল না। একটি কলম ছিল, কলমটি নিয়ে নেয়। এর আগে আমার পকেটে পার্টির কিছু কাগজপত্র ও ঠিকানা ছিল। সে সব আগেই ছিঁড়ে চিবিয়ে গিলে ফেলি আতঙ্কে।

কিছুক্ষণ পর এক সৈনিক এসে জিজ্ঞাসা করল আমাদের মধ্যে কোন মুসলিম আছে কিনা এবং উর্দু ভাষা জানে কিনা। দু'জন যুবক দাঁড়িয়ে বলে তারা মুসলিম এবং উর্দু ভাষা বলতে পারে। সৈনিকটি ঐ দু'জনকে ঘরের বাইরে নিয়ে যায়। এর কয়েক মিনিট পর বেশ কয়েকটি গুলির শব্দ কানে আসে। আমার বদ্ধ ধারণা হল ঐ দুই জনকে সেনারা গুলি করে হত্যা করল। উর্দুভাষী বলে পরিচয় দিয়েও মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই মেলেনি।

এই ঘটনার পর হল ঘরে বেশ কয়েকজন সেনাবাহিনীর সদস্য এসে আমাদের সকলকে দাঁড়াবার নির্দ্দেশ দেয়, এবং লাইন করে একে অপরের ঘাড়ে হাত রেখে হল ঘর থেকে বের হবার আদেশ দেয়। আমরা বন্দিদের ঘাড়ে হাত রেখে সারিবদ্ধভাবে বের হতে থাকি। আমাদের এদিক ওদিক তাকান চলবে না— মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়।

বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। হিমেল হাওয়া বইছে, এর মধ্যে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আর আমাদের দু'পাশে সেনারা সশস্ত্র অবস্থায়।

আমাদের সারিবদ্ধভাবে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল শাঁখারী বাজারের গলির দিকে। আমি আড় চোখে দেখতে পাই ছোট ছোট ঘরগুলিতে আগুন জ্বলছে। ঐসব ঘরে মানুষের মৃতদেহ পুড়ছে। অনেকের হাত, পা, দেহ দেখতে পাই। আমি ভাবছি, আমাদেরকে এভাবেই ঘরের মধ্যে পুড়িয়ে মারা হবে।

পাক সৈন্যরা আমাদের সারিবদ্ধ অবস্থায় নিয়ে যাবার সময় শাঁখারী বাজারের একটি ঘরের সামনে দাঁড়াবার নির্দেশ দিল। কয়েকজন সৈন্য একটি ঘরের দরজা লাথি মেরে ভেঙে ফেলে। তারপর ঘরের মধ্যে ঢুকে কি যেন পরীক্ষা করে বেরিয়ে আসে। আমাদের ঐ ঘরে ঢোকান হল না, এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেয়া হল। আমরা সৈন্যদের ঘেরাওয়ের মধ্যে এগিয়ে চলেছি, যেন জীবন্ত লাশ। পুনরায় থামার আদেশ হল। সৈন্যরা একটি ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ পর বের হয়ে এসেই আমাদের প্রতি নির্দেশ হল ভেতরে ঢোকার জন্য। সৈন্যদের নির্দেশে সামনের কয়েকজন বন্দি ডুকরে কেঁদে উঠে। সৈন্যরা ক্রন্দনরত বন্দিদের রাইফেলের বাট দিয়ে আঘাত করতে থাকে।

বন্দিদের মধ্যে কয়েকজন কিছুতেই ঘরে ঢুকতে চাচ্ছিল না, কিন্তু পাকিস্তানি সৈন্যদের প্রচণ্ড প্রহারে বন্দিরা ঘরে ঢুকতে বাধ্য হল।

আমি ভাবছি, আমাদের সবাইকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে আগুনে জ্বালিয়ে হত্যা করা হবে। সৈন্যরা বন্দিদের গুনতি করে ৩৭ জন বাঙালি বন্দিকে ঐ ছোট্ট ঘরে ঢোকায়। আমি একটা ছোট্ট চৌকির নিচে ঢোকার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে চৌকির দেয়াল ঘেঁষে উপুড় হয়ে থাকি। আমার দেহের উপর বহু লোক। বন্দিদের চাপে নিঃশ্বাস বন্ধ হবার মত অবস্থা। ঐ মুহূর্তে আমি ভাবছিলাম, আমাকে মরতে হচ্ছে, এমন বধ্যভূমিতে, যার কোন হদিস কোন দিন কেউ পাবে না, আর বার বার মনে হচ্ছিল, বরিশাল থেকে আসার সময় আমার বড় ছেলে— বাবা, বাবা বলে কাঁদছিল।

ইতোমধ্যে সব বন্দিদের ঘরে ঢোকানোর পর সমস্ত ঘরটি নিঃশব্দ। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া কোন শব্দ নেই। একটু পরেই কানে বাজল গুলির শব্দ। পাক সৈন্যরা ঘরের মধ্যে মারণাস্ত্র দিয়ে গুলি করছে বুঝতে অসুবিধা হল না। ব্রাশফায়ারের মধ্যে আমি অনেক মানুষের নিচে চ্যাপ্টা হয়ে পড়ে আছি। কিছুক্ষণের মধ্যে তপ্ত রক্তে আমার সমস্ত শরীর ভিজে গেল। রক্ত যে এত তপ্ত হয় তা আমার ধারণা ছিল না। গুলিবিদ্ধ বন্দিদের রক্ত, আর আমি ভাবছি এই গুলি আমার মাথা, দেহ ভেদ করে নিশ্চিত মৃত্যু ঘটতে যাচ্ছে। আমি তখনও বেঁচে আছি। আমার দেহের উপর রক্তের বন্যা। সৈন্যদের গুলি আমার দেহে তখনও লাগেনি। ভাবছি এই বুঝি গুলি দেহ ভেদ করে ঝাঁঝরা করে দেবে। আমি গুলির শব্দের পূর্বে ভেবেছিলাম আমাদের ওরা গুলি না করে আগুন পুড়িয়ে মারবে কিন্তু ধারণা যে ঠিক নয় তা কিছুক্ষণের মধ্যে বুঝতে পারি। এর মধ্যে গুলির শব্দ বন্ধ হয়ে গেল, ঘরের মধ্যে নানা ধরনের শব্দ। ঘাতকদের গুলিতে নিহত বা আহত বন্দিদের অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, ভুঁড়ি, বুক ফেঁসে গেছে উপলব্ধি করতে পারি। সে সব শব্দ শুনতে পারছি। আমার পা ধরে একজন মৃত্যুপথ যাত্রী বিকৃত কণ্ঠে কি যেন

বলছে। আমি তখনও বেঁচে আছি। আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে নিথর হয়ে পড়ে আছি। জানি না ঘাতকরা আমাকে দেখতে পাচ্ছে কি না। সমস্ত ঘরে গোঙ্গানি ও এমন সব শব্দ হচ্ছিল যা লিখে বর্ণনা করার মত নয়। এদিকে আমি বেঁচে আছি, রক্তস্নাত অবস্থায় দম বন্ধ করে আছি। হঠাৎ আলোর ঝলক। আমার সে সময় ধারণা হল সৈন্যরা টর্চের আলো জ্বালিয়ে দেখছে বন্দি বাঙালিরা সবাই গুলিবিদ্ধ হয়ে মরেছে কিনা।

আমি নিথর হয়ে পড়ে আছি। কিছু পরেই আবার গুলির শব্দ। আর রক্ষা নেই, এবার অবধারিত মৃত্যু, এর মধ্যে আমার ডান হাতের উপরে তপ্ত কি যেন ঢুকল। কিছুক্ষণ পর কোমরে আঘাত। রক্ত ঝরছে, আমি গুলিবিদ্ধ হলাম। মরে যাচ্ছি, সবশেষ— এসব চিন্তা করছি। এক সময় গুলির আওয়াজ বন্ধ হল, আমি যাতে অজ্ঞান হয়ে না পড়ি সেই মনোবল নিয়ে পড়ে আছি। গুলির আওয়াজ বন্ধ হবার পর ঘরের মধ্যে ঘুট ঘাট আওয়াজ শুনতে পাই। আমি ঐ রূপ ভয়াবহ অবস্থার মধ্যেও খুবই সতর্কতার মধ্যে নিজেকে পরীক্ষা করছিলাম, আমার দেহের গুলিবিদ্ধ অংশ, অর্থাৎ ভাইটাল অঙ্গ প্রত্যঙ্গে গুলি লেগেছে কি না। আমি তখনও শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারছিলাম, আমি বেঁচে আছি, মৃতদেহের তপ্ত রক্তে আমি নিমজ্জিত। এরপর কি? ভাবছি, বেঁচে থাকার জন্য শেষ চেষ্টা করতে পারি কি না।

ঐ সময় আমার মনে হল, শাঁখারী বাজারের যে সকল ঘরে মৃতদেহ পুড়তে দেখেছি, সে সব ঘর ধ্বংসস্তুপের মত ছিল। তার মধ্যে লাশ। আমাদের ঘরকেও ধ্বংস করে দেবে বিস্ফোরক দিয়ে। আমার মনে ধারণা হল বিস্ফোরণের পূর্বে তো পাক সৈন্যরা থাকবে না। ঐ মুহূর্তটার জন্য অপেক্ষা এবং বেঁচে থাকতে পারি কি না। যাতে অজ্ঞান হয়ে না পড়ি তার জন্য মনোবল চাঙ্গা রাখার চেষ্টা করছি। বেঁচে থাকার জন্য সে সময়কার আমার মানসিক পরিস্থিতি যে কি ছিল তা ভাষায় বর্ণনা করার মত অবস্থা নেই।

আমি বেঁচে আছি, কান খাড়া করে আছি। ঘরের মধ্যে শব্দ হচ্ছে। মনে হল ঘাতক পাক সৈন্যরা আমাদের জীবন্ত দগ্ধ করার জন্য ব্যবস্থা করছে। এ অবস্থার মধ্যে আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম উর্দু ভাষায় কম্যান্ড হল "হঠ যাও"। সঙ্গে সঙ্গে বহু বুটের আওয়াজ। সৈন্যরা বধ্যভূমি থেকে সরে যাচ্ছে। আমি সৈন্যদের বুটের আওয়াজ শেষ না হতেই বধ্যভূমির লাশের স্তুপের নিচ থেকে বেরুনোর চেষ্টা করে অনেকক্ষণ পর সফল হলাম। কতজন লাশের নিচে আমি গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উঠে পড়েছিলাম তা আমার পক্ষে ধারণা করা সম্ভব হল না। আমি গুলিবিদ্ধ আহত অবস্থায় টলতে টলতে উঠে দেখি দরজার বাইরে আগুনের আলো। দরজার দিকে যাওয়ার সময় বধ্যভূমির ঘর থেকে এক ব্যক্তিকে উঠে দাঁড়াতে দেখি। আমার শরীর শিউরে উঠে। লোকটি আমার হাত ধরলে আমি আতঙ্কিত হয়ে প্রায় অজ্ঞান হবার অবস্থা। লোকটি আমাকে ধরে ফেলে। আমি তাকে বলি, আমার শরীরে গুলি।

লোকটি আমাকে টলটলায়মান অবস্থায় ঘর থেকে বের করে জাপটে ধরে ইসলামপুর রাস্তার দিকে নিয়ে ছুটতে থাকে। ছুটছি, এর মধ্যে বেশ কয়েকটি বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজ শুনতে পাই, পরে জানতে পেরেছি, পাকসৈন্যরা যে

ঘরটিতে আমাদের আবদ্ধ করে গুলিবিদ্ধ করেছিল সেই ঘরটি বিস্ফোরক দিয়ে ধ্বংস করে দেয়।

আমরা ছুটছি। রাস্তা অন্ধকার। কোথাও এতটুকু আলো নেই। রাত তখন আনুমানিক ১২টা হবে। বাইরে হিমেল হাওয়া।

আমরা দুই জন ছুটতে ছুটতে কোথায় যাচ্ছি বুঝতে পারছিলাম না। ভয় হচ্ছিল পাক নরঘাতকরা পিছু পিছু ধাওয়া করছে কি না। অন্ধকারে আমরা ছুটতে ছুটতে একটি প্রাচীরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমার সঙ্গের লোকটি নর্থব্রুক হল রোডের যে বাসায় আমি উঠেছিলাম সেই বাসার সম্মুখে ব্যাটারি চার্জ করার এক দোকানের কর্মচারি বা মালিক হবে। লোকটি লাফ দিয়ে প্রাচীরের উপর উঠে পড়ে, আমাকে প্রাচীরের উপর উঠতে বলে। কিন্তু আমি খুবই দুর্বল ও প্রায় আধমরা অবস্থা। আমার পক্ষে প্রাচীরে উঠা সম্ভবপর হল না। লোকটি আমাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাকে ফেলে রেখে প্রাচীরের অপরদিকে অদৃশ্য হয়ে যায়। লোকটি আমাকে ফেলে রেখে চলে যাবার পর আমার চোখ ঝাপসা হয়ে যায়। আমার রক্ত ভেজা দেহ, সমস্ত শরীর হিমশীতল হয়ে পড়ছে। চিন্তা করছি আর বুঝি রক্ষা নেই। সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এলাকা। কোথায় বিপদ লুকিয়ে আছে বুঝতে পারছি না। আমি প্রাচীর থেকে অন্ধকারে কিছুটা পথ হেঁটে একটি স্থানে দাঁড়িয়ে চিন্তা করছি কি হবে এরপর? ঠিক এ সময় কানে ভেসে এল— 'কৌন হ্যায়?'

আমি ঐ মুহূর্তে ভাবলাম এবার নিশ্চিত মৃত্যু। কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম ঠিক তার পিছনেই একটি জানালা খুলে গেল। এক অবাঙালি মহিলা, হ্যারিকেনের আলোয় আমাকে দেখে। রক্ত ভেজা দেহ আমার, চমকে ও আতঙ্কিত অবস্থায় মহিলা বলে ওঠে, 'তুম কৌন্ হ্যায়'— আমি সে মুহূর্তে বুঝে নিলাম মহিলা বিহারী। আমি তাকে ভাঙা ভাঙা উর্দু ভাষায় 'মাইজি' সম্বোধন করে বললাম, মিলিটারীরা আমাকে গুলি করেছে। আমি কোন রকমে প্রাণে বেঁচে আছি। আমি করুণ স্বরে তাদের নিকট আমার জীবন রক্ষার আবেদন করি। আমার আবেদনে মহিলার করুণা হল। সতর্কভাবে দরজা খুলে আমাকে তাদের বাসার মধ্যে নিয়ে যায়। বাসার মধ্যে স্বল্প আলোতে দেখলাম বেশ কয়েকজন মহিলা বিস্ময়ভরা চোখে আমাকে দেখছে। এর মধ্যে একজন বয়স্ক মহিলা আমার রক্ত ভেজা দেহ দেখে আমার নিকট থেকে গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা শোনেন। আমি ভাঙা ভাঙা উর্দু ভাষায় ঘটনা বললে। মহিলা আমাকে বলেন, আমার বাবা-মা অনেক পূণ্য করেছেন। সেজন্য আমি এত নির্যাতন ও গুলিবিদ্ধ হয়েও বেঁচে আছি।

এদিকে আমার গুলিবিদ্ধ স্থান থেকে রক্তক্ষরণ হওয়ায় আমি দুর্বল বোধ করি। অজ্ঞান হওয়ার মত অবস্থা হয়। প্রচন্ড শীত লাগছিল, আমি কাঁপছিলাম। আমার মরণ নিশ্চিত ভেবে আমি মহিলাদের অনুরোধ করি— আমার ঠিকানা লিখে দেব। মহিলাদের মধ্যে একজন একটি পেন্সিল ও কাগজ দিল। আমি বরিশাল, বগুড়া ও ঢাকার কয়েকটি ঠিকানা লিখে দিয়ে অনুরোধ করলাম, আমার মৃত্যু হলে প্রদত্ত ঠিকানায় সংবাদ পাঠাতে।

আমার কথা শুনে মহিলারা আমাকে সান্তনা দিয়ে বলল, আল্লাহর রহমতে আমি বেঁচে যাব। আমার কোন ভয় নেই। এরপর মহিলারা একটি লুঙ্গি ও পাঞ্জাবি দিয়ে আমার দেহ থেকে রক্ত ভেজা পায়জামা পাঞ্জাবি খুলে নেয়।

গুলিবিদ্ধ হাত ও কোমর থেকে তখনও রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। আমি তাদেরকে অনুরোধ করি যদি সম্ভব হয় তবে আমার দেহ থেকে গুলি বের করার চেষ্টা করুন।

ওরা ডেটল তুলা ও শোন দিয়ে গুলিবিদ্ধ স্থানে গুলি বের করার ব্যর্থ চেষ্টা করে। সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় ঐ সময় ঐ বাড়িতে কোন পুরুষকে দেখতে পাইনি।

জনৈকা মহিলা আমার দেহ থেকে গুলি বের করার সময় আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। কত সময় ধরে অজ্ঞান অবস্থায় ছিলাম তা বলা সম্ভবপর ছিল না। জ্ঞান ফিরে এলে আমার মাথা ও দেহ পানিতে ভেজা উপলব্ধি করি। সেই সাথে প্রচন্ড শীত। ঠান্ডায় জমে যাবার মত অবস্থা হয়। আমি ঠান্ডায় কাঁপছি। এ অবস্থায় মহিলারা ছেড়া মশারি ও পর্দার কাপড় দিয়ে আমার শরীর ঢেকে দেয়। সমস্ত রাত অবাঙালিদের আশ্রয়ে আমাকে থাকতে হয়। মহিলারা সে সময় আমাকে তাদের জীবনের যথেষ্ট নিরাপত্তার অভাবের কথা বলছিল।

২৮শে মার্চ ভোরের দিকে ঐ বাড়িতে বেশ কয়েকজন তাগড়া পুরুষ দেখতে পেলাম। এসব পুরুষ মহিলাদের স্বামী বা আত্মীয় হবে। পুরুষরা আমাকে দেখে মহিলাদের সঙ্গে কথা বলছিল। সে সময় আমি কিছুটা শঙ্কিত হই। কেন যেন ভয় করছিল। অবাঙালিদের দ্বারা নূতন করে কোন বিপদের আশঙ্কা করলেও শেষ পর্যন্ত অবাঙালি পুরুষদের মধ্যে মাঝবয়েসী একজন আমার দেহে গুলিবিদ্ধ ক্ষতস্থান দেখে বললেন, হাসপাতালে গিয়ে গুলি বের করতে হবে।

'কারফিউ' না থাকায় রাস্তায় লোকজন চলাচল শুরু হয়েছে। অলি-গলি দিয়ে একটা দু'টো রিক্সা চলাচল করছে। এ অবস্থায় মাঝবয়েসী পুরুষটি আমাকে হাসপাতালে পৌঁছে দেবার কথা বলেন। আমি মহিলাদের সালাম জানিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

পায়ে হেঁটে কিছুদূর চলার পর একটি রিক্সা পেলাম। রিক্সায় উঠে কিছুদূর যাবার পর রাস্তায় লোকজন ভীত ও আতঙ্কিত অবস্থায় ছুটতে দেখে রিক্সাওয়ালা আমাদের নামিয়ে দিল। পরে কয়েকজন লোকের নিকট থেকে জানতে পারি নবাবপুর রোডে প্রকাশ্য দিনের বেলায় পাকসেনারা কয়েক ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করে। এর ফলে লোকজনদের মধ্যে আতঙ্ক।

আমি ও অবাঙালি ব্যক্তি পায়ে হেটে সেগুনবাগিচার রাস্তায় পৌছে অবাঙালি ব্যক্তিকে বলি, নিকটে আমার এক পরিচিত চিকিৎসক আছেন। আমি তার সাহায্যে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হতে পারব। অবাঙালি ব্যক্তি আমাকে অভয় দিয়ে বললেন, কোন সমস্যা হলে আমি যেন তাদের আশ্রয়ে চলে যাই।

আমি সেগুনবাগিচার রাস্তার মধ্যে ঢোকার পূর্বে অবাঙালি ভদ্রলোককে সালাম জানিয়ে বিদায় নিয়ে দ্রুত চলে যাই। সেগুন বাগিচায় বগুড়ার রহমান ব্রাদার্সের এর বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে। আমি ঐ অফিসে গিয়ে তিন জন লোক দেখি। তারা আমাকে দেখে ভীত হয়। এর মধ্যে একজন আমার পরিচিত কিন্তু নোংরা পোষাক দেখে আমাকে চিনতে

পারে নি। আমি আমার নাম বলামাত্র ঐ ভদ্রলোক তার পকেট থেকে তিন টাকা দিয়ে আমাকে চলে যেতে বলেন, তারাও অফিসে আতঙ্কিত অবস্থায় আছেন বলে মনে হল।

আমি গুলিবিদ্ধ অবস্থায় প্রথমে ডাঃ এমএ করিমের বাসায় যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বাসা চেনা সম্ভব হল না। ঘুরতে ঘুরতে রাজারবাগ এলাকায় গিয়ে পৌছলাম। রাজারবাগ এলাকা বিধ্বস্ত। রাস্তায় লোকজন চলাচল নেই বললে চলে। আমি দিশেহারা— কোথায় যাব? জীবন রক্ষা শেষ পর্যন্ত হবে কি না, এসব কথা ভাবছি। এ সময় রাস্তায় কয়েকজন যুবকের দেখা পাই। আমি যুবকদের নিকট গিয়ে লেখক বদরুদ্দীন উমরের বাসার ঠিকানা চাইলে তারা উমর সাহেবকে চেনেন না বলে দ্রুত চলে যেতে উদ্যত হন। আমি তাদের জানাই, আমি পাকসেনাদের হাতে বন্দি ছিলাম। আমার শরীরে দুটি স্থানে গুলিবিদ্ধ হয়েছে। আমার জীবন বিপন্ন। এ অবস্থায় আমাকে সাহায্য না করলে প্রাণে মারা যাব। উল্লেখ্য যুবকেরা প্রথমে আমার পোষাক পরিচ্ছদ দেখে সন্দেহ করেছিল। আমি আমার নাম তাদের জানাতেই তারা বিস্মিত হয়ে আমাকে বলেন, দুর্গাদা, আপনি কবে ঢাকা এলেন? আমি সংক্ষেপে তাদেরকে জানাই ঢাকার ভয়াবহ ঘটনার কথা, শাঁখারী বাজারের বধ্যভূমি থেকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় জীবন রক্ষার কথা।

যুবকদের মধ্যে ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির মঞ্জুরুল আহসানের ভাই কামরুল হাসান, ছাত্র ইউনিয়নের নেতা কাজী আকরাম এবং মোস্তফা ওয়াহিদ খান। ওরা আমার পরিচয় পাওয়া মাত্র অত্যন্ত আন্তরিক হয়ে উঠেন, এবং আমাকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যান এবং আমার দেহের গুলি বের করার জন্য ডাক্তারের খোঁজ করেন। কোন ডাক্তার না পেয়ে তারা হতাশ হয়ে পড়েন। এদিকে আমার গুলিবিদ্ধ স্থান রক্তক্ষরণ বেশি হওয়ায় তারা আমাকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুতি নেন। এর মধ্যে যুবকদের একজন আমার অতি পরিচিত বগুড়ার ডাঃ রফিকুল ইসলাম জিন্নাহের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যাবার জন্য দু'টি রিক্সা সংগ্রহ করেন যুবকরা। একটি রিক্সায় আমাকে তুলে দিয়ে রিকসাওয়ালাকে ভালভাবে বুঝিয়ে দেন। পিছনের রিক্সায় দুই জন যুবক বন্ধু আমাকে অনুসরণ করেন।

অবশেষে নিরাপদে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পৌছলাম। হাসপাতালে ডাঃ রফিকুল ইসলাম জিন্নাহের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি আমার গুলিবিদ্ধ হবার সংবাদ শোনামাত্র অপারেশনের জন্য সার্জনদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। বিকেলে জনৈক সার্জেন আমার ডান হাতের গুলিবিদ্ধ স্থান থেকে গুলি বের করে ফেলেন। কিন্তু কোমরে গুলি নেই বলে জানান। সার্জেন আমার নিকট থেকে গুলিবিদ্ধ হবার ঘটনা শোনার পর বলেন, বধ্যভূমিতে অনেক লোকের দেহের মধ্য থেকে গুলি গিয়ে আমাকে বিদ্ধ করায় মারাত্মক ঝুঁকি থেকে বেঁচে গেছি।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তির সময় আমার প্রকৃত নামের পরিবর্তে মতিয়ার হোসেন নাম লেখানো হয় নিরাপত্তার স্বার্থে। কেন না হিন্দু নাম থাকলেই পাক সেনারা হাসপাতাল থেকে ভর্তি রোগী তুলে নিয়ে গেছে, এ ধরনের একাধিক ঘটনার সংবাদ জানার প্রেক্ষিতে নিরাপত্তার স্বার্থে প্রকৃত নামের পরিবর্তে অন্য নামে ভর্তি হতে হয়।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আমাকে রাতে থাকতে হয়। ডাঃ জিন্নাহ আমাকে পূর্বেই বলে দিয়েছিলেন আমি যেন সিটে না থাকি। পাক সেনারা হাসপাতালে এলে যে ঘরে লাশ রাখা হয় সেই ঘরে গিয়ে যেন আত্মগোপন করি।

রাতের দিকে পাক সেনারা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আহত বাঙালিদের সন্ধান করার জন্য একাধিকবার আসে, কিন্তু হাসপাতালের ডাক্তার ও অন্যান্যদের বলিষ্ঠ ভূমিকার জন্য ওদের ঢুকতে দেয়া হয় না। রাতের দিকে পাক সেনাদের আগমনের সংবাদ কয়েকজন নার্স আমাকে জানালে আমি যে ঘরে লাশ রাখা হয় সেই ঘরে বেশ কয়েকবার গিয়ে আত্মগোপন করি।

হাসপাতালে পাক সেনাদের আনাগোনা রোগীদের জন্য আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ডাঃ জিন্নাহ আমাকে জানালেন, আমাকে গোপনে হাসপাতাল ত্যাগ করে অন্যত্র যেতে হবে।

৩০শে মার্চ প্রখ্যাত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ ফজলে রাব্বী নিজের গাড়িতে করে আমাকে চামেলিবাগে এক বাসায় পৌঁছে দেন।

চামেলীবাগে কিছু সময় মেজর এনামুল হকের বাসায় থাকার পর গ্যারেজে রাখা তাঁর গাড়িতে আমাকে, ডাঃ জিন্নাহ ও তার এক মেডিক্যাল ছাত্রকে গোড়ানে নিয়ে যাওয়া হয়।

নৌকাযোগে আমরা কাঞ্চনে পৌঁছি। সে সময় কাঞ্চনের সাত্তার জুট মিলের ডাক্তার ছিলেন উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম রূপকার ডাঃ আশিকুল আলম। ডাঃ আশিকুল আলম ছাত্রাবস্থাতেই মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর হেফাজতে কয়েকদিন থাকার পর লৌহজং এর নিকটে এক গ্রামে আমাকে থাকতে হয়।

ইতোমধ্যে আমার রাজনৈতিক বন্ধুরা সংবাদ দেন বগুড়া ও বরিশালে পাক সেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধের মুখে হটে গেলেও পুনরায় আক্রমণ চালানোর প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। আমার স্ত্রী পুত্র যেহেতু বরিশালে রয়েছে, সে কারণে আমাকে বরিশালে যেতে হবে। রাজনৈতিক বন্ধুরা একটি লঞ্চের ব্যবস্থা করেন। সঙ্গে একজন চিকিৎসকও ছিলেন গুলিবিদ্ধস্থানের পচন ড্রেসিং করার জন্য।

বরিশাল শহরে পৌঁছে শহরের বাড়িতে আমি শুধুমাত্র দিদিমাকে দেখতে পাই। আমার স্ত্রী পুত্র কাশীপুরে আমার এক আত্মীয়ের বাড়িতে। দিদিমা আমাকে দেখে কেঁদে উঠেন। তাদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল আমি বেঁচে নেই। আমি রাতেই কাশীপুর গ্রামে রওয়ানা দেই।

পরেরদিন ভোরে আমি আমার স্ত্রী, দুই পুত্র, দিদিমা ও আমার এক ভাড়াটিয়াকে সঙ্গে করে কাজলাকাঠি গ্রামে রওয়ানা দিই। সেখানে আমার স্ত্রী-পুত্রদের পৌঁছে দিয়ে আমি কয়েকদিন পর ঢাকায় চলে যাই। কেননা কাজলাকাঠি গ্রামে আমার অবস্থান নিরাপদ মনে হয়নি।

এভাবে আমি প্রাণে রক্ষা পেলেও যে সব গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলাম সে সব স্থানে রাজাকার, আলবদর, জামাত, মুসলিম লীগের অত্যাচারে মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এদের অত্যাচারের পাশাপাশি পাক দখলদার বাহিনীর বর্বর হামলা বৃদ্ধি পায়। আমার স্ত্রী গ্রামে

থাকতে না পেরে বরিশালে ফিরে যায়। ইতোমধ্যে বাসার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মূল্যবান জিনিসপত্র লুণ্ঠিত হয়। আমার স্ত্রী ও দুই পুত্র বরিশালে আমার অবর্তমানে রাজাকারদের হুমকির মুখে এফিডেবিট করে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করে। অপরদিকে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে আমি বন্ধুদের আশ্রয়ে থাকাকালে বন্ধুরা আমার স্ত্রী পুত্রদের জন্য চাল-ডাল, তেল, লবণসহ যাবতীয় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাঠাতেন। শিশু পুত্রদের জন্য দুধের কৌটা পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু বরিশালে আলবদর রাজাকাররা সকল জিনিসপত্র লুণ্ঠন করে নিয়ে যেত। আমি নারায়ণগঞ্জে ও বিক্রমপুরে মোশারফ হোসেন নামে পরিচিত হই। দাড়ি সহ আমি একজন দরবেশের ছদ্মবেশ গ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে কাজ করতে থাকি।

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। সেই সাথে বরিশালে মিশনারীদের এক হাসপাতালে আমার স্ত্রী এক কন্যা সন্তান প্রসব করলে মিশনারীরা নবজাতক কন্যার নাম রাখেন 'মুক্তি'।

কথা বের করার জন্য প্রতিদিন আমার হাত পায়ের নখে সুঁচ ফুটান হত

মোশাররফ হোসেন

'৭১ সালে মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন পাবনার একজন প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদার ছিলেন। পাবনায় প্রথম পর্যায়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হামলা প্রতিরোধের অন্যতম সংগঠক ছিলেন তিনি। যুদ্ধের শেষের দিকে তিনি পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে ধরা পড়েন এবং নৃশংস নির্যাতনের শিকার হন। এই নির্যাতনের বিবরণ তিনি দিয়েছেন তাঁর জবানবন্দিতে, যেটি পাবনায় ধারণ করা হয় ১৮ অক্টোবর '৯৯ তারিখে।

১৯৭১ সালে আমি পাবনা শহরে আনসার ব্যাটালিয়ান কমান্ডার (অনারারি) নিযুক্ত ছিলাম। এ ছাড়াও পাবনা রাইফেল ক্লাবের ফাউন্ডার মেম্বার ও সহ-সম্পাদক ছিলাম। মার্চের প্রথম সপ্তাহেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, শেখ মুজিবকে ওরা পাওয়ার দেবে না। তাই আমি কলেজের প্রায় ৫০ জন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছাত্র নিয়ে কৃষ্ণপুর গার্লস হাই স্কুলে কমান্ডো ট্রেনিং শুরু করি। যদিও এ প্রশিক্ষণের সময় অনেকেই আমাকে নানা ধরনের প্রশ্ন করে।

তৎকালীন জেলা প্রশাসক নুরুল কাদের খান এ ব্যাপারে আমাকে সমর্থন করেছিলেন। মূলতঃ তাঁরই সহযোগিতায় এ প্রশিক্ষণ চালাতে থাকি। ২৩শে মার্চ আমি, আনোয়ার হোসেন ঘুটু, সিভিল ডিফেন্স কমান্ডার রহিমউদ্দিন পেশকার ও ডিসি নুরুল কাদের খান পাবনা পুলিশ প্যারেড ময়দানে পাকিস্তানি পতাকার বদলে বাংলাদেশের ম্যাপ অঙ্কিত পতাকা উত্তোলন করি। এবং গার্ড অফ অনার দিই। গার্লস গাইড, সিভিল ডিফেন্স ও আনসার এতে অংশ নেয়। জেলা প্রশাসক নুরুল কাদের খানের আদেশে আমি দিনাজপুর রাইফেল ক্লাব থেকে প্রায় ৩০ হাজার রাউন্ড টুটুবোর রাইফেলের গুলি নিয়ে আসি এবং আমার রাইফেলসহ আনসারদের ৪৯টি রাইফেল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত

আনসারদের কাছে বিলি করি।

প্রথম পর্যায়ে পাবনা হানাদার মুক্ত হবার পর পুনরায় পাকবাহিনী পাবনা দখল করার পূর্বে নুরুল কাদের খান ও তৎকালীন এসপি সহ আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয়রা ভারতে চলে যান। নূতন দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিসি, এসপি, আমাকে গোপনে ডেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ ও সহযোগিতার পরামর্শ দেন। আমি পাবনা পুলিশ লাইনের আরমারার ইদ্রিস আলী মারফত রাইফেল ও এসএমজির গুলি সংগ্রহ করি এবং মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পৌঁছে দিই। এ ছাড়াও পাবনার এসডিও বিভিন্ন নামে মাস্টার রোল তৈরি করে রিলিফের গম ও পরিবার প্রতি নগদ ২০ টাকা করে আমার মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার সংস্থানের জন্য প্রেরণ করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আমি ও আমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা ২৫ মার্চ মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে পাবনায় আগত পাকসেনাদের বিপর্যস্ত করে এবং পাবনা শহরে থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা, অস্ত্র ও গুলি সরবরাহের কারণে চিহ্নিত হয়ে পড়ি।

চূড়ান্ত বিজয়ের দু'মাস পূর্বে পাবনা সদর থানায় নাজিরপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে নকশালদের এক সংঘর্ষ হয়। এ সংঘর্ষে নকশাল নেতা টিপু বিশ্বাসের ৭/৮ জন লোক মারা যায়। এর দোষ পড়ে আমার উপর। তাই টিপু বিশ্বাসের চাচা ও খোন্দকার নুরুল ইসলাম আমার বিরুদ্ধে পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন তাহেরের কাছে ১৩ দফা অভিযোগ দায়ের করে। এ সময় একদিন পাকবাহিনী আমার বাড়ি ঘিরে ফেলে এবং আমার হাত-পা চোখ বেঁধে গাড়িতে তুলে ওয়াপদা ক্যাম্পে নিয়ে যায়।

গ্রেফতারের পর প্রথমে আমাকে ক্যাপ্টেন তাহেরের কাছে নেয়া হলে তাহের উর্দুতে বলে— 'তুমি পাবনা শহরে এতো বড় বাঘ, আমি আগে জানলে আমার অনেক আর্মি লোকসানের হাত থেকে বেঁচে যেত।'

পাক ক্যাপ্টেন তাহের আমাকে জেরা করার পাশাপাশি বেয়নেট দিয়ে আমার হাতে মুখে খুচিয়ে খুচিয়ে কথা বের করার চেষ্টা চালাতে থাকে। এ গভীর দাগের চিহ্ন এখনও আমার সারা শরীরে আছে। এভাবে দীর্ঘ সময় আমাকে নির্যাতন চালালে এক পর্যায়ে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।

একটানা চব্বিশ ঘন্টা আমি অজ্ঞান ছিলাম। পরদিন দুপুরে জ্ঞান ফিরলে দেখি আমার পাজামা-পাঞ্জাবি রক্ত জমে কালো হয়ে গেছে। এদিন দুপুর ২টা থেকে শুরু করা হয় আমার উপর পৈশাচিক নির্যাতন। এ সময় ঘাড়ের উপর দু'হাত তুলে আমাকে রশি দিয়ে মোটা এক পিলারের সাথে বাঁধা হয়। তখন আমি ক্যাপ্টেন তাহেরকে সামনে ইজি চেয়ারে বসে সিগারেট হাতে দেখতে পাই। তাহের আমাকে পেটানোর আদেশ দেয়। তার আদেশে পাকিস্তানি সৈন্যরা লাঠিতে বাঁধা রাইস মিলের চাকা ঘোরানো বেল্ট দিয়ে আমাকে পেটাতে শুরু করে। আমি মরণ যন্ত্রনায় যতই চিৎকার করি ততই পাকিস্তানি সৈন্যরা পেটাতে পেটাতে উল্লাস প্রকাশ করে।

তারা ঐ ১৩ দফা অভিযোগের স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। এভাবে ২০/২৫ মিনিট মারার পর আমি আবার জ্ঞান হারাই।

৪র্থ দিন পাকিস্তানি সুবেদারকে ক্যাপ্টেন তাহের হুকুম দেয় আমাকে সহ

অন্যান্যদের স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য আবার নির্যাতন চালাতে। এদের মধ্যে ভারতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারাও ছিল। ওয়াপদা কন্ট্রোল রুমের সামনের আম গাছের সাথে দু'হাত উপরে তুলে আমাদের বাঁধা হল, প্রত্যেকের বেল্ট বাঁধা লাঠি দিয়ে পেটাতে থাকে। প্রতিদিন বেলা একটা দেড়টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে আমাদেরকে পেটানো হতো।

গ্রেপ্তারের ১২/১৩ দিন পর স্বীকারোক্তি আদায়ে ব্যর্থ হয়ে খান সেনারা আমাকে কয়েদখানা থেকে অফিস ঘরে নিয়ে আসে। এখানে ৪ জন পাক সৈন্য আমাকে মেঝেতে শুইয়ে চেপে ধরে রাখে এবং ১ জন পাকসেনা আমার পায়খানার রাস্তায় বরফখন্ড ঢুকিয়ে দেয়। আমি চিৎকার শুরু করলে খানসেনারা বলে, 'তুম বহুত শরীফ আদমী হ্যায়। সাচ বাতা দো, তুমকো ছোড় দেগা।' এই ভয়ঙ্কর নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে আমি জ্ঞান হারাই। জ্ঞান ফিরলে আমি কয়েদখানায় পড়ে থাকা অবস্থায় দেখতে পাই। তার দু'দিন পর চোখ-হাত বেধে আমাকে টর্চার চেম্বারে নেয়া হয়। সেখানে মেঝের উপর বরফ ভেঙে বিছিয়ে দিয়ে তার উপর উলঙ্গ অবস্থায় শুইয়ে বুকের উপর ২৫/৩০ কেজির বরফ খন্ড চেপে ধরে রাখা হয়। এসময় ৪/৫ জন খানসেনা আমার হাত পা চেপে ধরে রাখত। কিছু সময় পর আমি আবার জ্ঞান হারাই।

এছাড়া কথা বের করার জন্য প্রতিদিনই আমার হাত পায়ের নখে সূচ ফুটানো হত। আমি প্রায় প্রত্যেক দিনই লক্ষ্য করেছি আমাকে এ ধরনের নির্যাতনের সময় ক্যাপ্টেন তাহের ইজিচেয়ারে বসে নানা রকম নির্যাতনের আদেশ প্রদানসহ তত্ত্বাবধান করছে।

পাকবাহিনী প্রায় প্রত্যেক বন্দিকে আমার মতো করে নির্যাতন চালাত। তবে পাকসেনাদের কমন মার ছিলো বেল্ট বাঁধা লাঠি দিয়ে পেটানো। পাকসেনাদের এ ধরনের অত্যাচার এতোই ভয়াবহ ছিল মারখাওয়া লোকদের আর উঠে দাঁড়ানোর মতো ক্ষমতা থাকত না। পাকসেনারা চ্যাঙদোলা করে বন্দিদের মেঝের উপর আছড়ে ফেলত। ৫/৬ ঘন্টার আগে মার খাওয়া লোকদের জ্ঞান ফিরত না। বেল্ট দিয়ে পেটানো লোকদের অধিকাংশেরই পাছার চামড়া পঁচে ঘা হয়ে যেতে দেখেছি। এছাড়াও প্রতিদিন ৪/৫ জনকে ধরে আনা হত এবং প্রতিদিন ২/৩ জনকে বাছাই করে চোখ, হাত বেঁধে গাড়িতে তুলে নিয়ে যেত পাক সেনারা। তারা আর ফিরে আসত না। ওরা কোথায় গেল জিজ্ঞাসা করলে সুবেদার টিটকারি মেরে জানায়— চাঁদে চলে গেছে।

প্রতিদিন রাত ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত আমরা এতোই উদ্বিগ্ন থাকতাম— হয়তো এবার আমাকে নেয়া হবে। চোখ হাত বাধা এ বন্দিদের কিছু দূর নিয়ে গিয়েই গুলি করে হত্যা করা হত।

গ্রেপ্তারের ১৪ দিনের দিন আমাকে হাত পিছনে বাঁধা অবস্থায় জেলা কাউন্সিল হলে আনা হয়। ক্যাপ্টেন তাহের আমাকে পাঞ্জাব রেজিমেন্টের মেজর আসলাম খটকের কাছে হাজির করে। আমি স্বীকারোক্তি দেইনি বলে মেজর আসলাম খটকের কাছে ক্যাপ্টেন তাহের অভিযোগ করে।

দু'জনে আলাপ আলোচনা করার পর হঠাৎ করে পাকসেনারা আমার চোখ বেঁধে

চ্যাঙদোলা করে ট্রাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ট্রাকটি প্রায় সোয়া ঘন্টা চলার পর থেমে যায়। এরপর দু'জন সৈন্য আমাকে দু'দিক দিয়ে ধরে হাঁটাতে থাকে। দুই পাকসেনার উপর ভর করে প্রায় ১শ গজ হাঁটার পর ওরা থেমে যায়। পায়ের তলায় বালি অনুভব করি। আমি ধরে নিই নগরবাড়ী ঘাটের যমুনা নদীর তীরে আমাকে আনা হয়েছে। এখানেই পাকসেনারা আমাকে গুলি করে হত্যা করবে। এখানে পাকসেনারা আমাকে আবার জিজ্ঞাসাবাদ করে। তারা বলে, যদি তুমি সত্য করে সব কিছু বল তাহলে তোমাকে ছেড়ে দেব, তা না হলে হত্যা করব। তারা আরও জানায় তোমার বিরুদ্ধে যে ১৩ দফা অভিযোগ দেয়া হয়েছে তা সবই মিথ্যা।

আমি বললাম ঠিকাদারী নিয়ে শত্রুতার কারণে এসব মিথ্যা অভিযোগ তোলা হয়েছে। আমি এসব কিছুই জানি না।

পাকসেনারা রাইফেলের বাট দিয়ে সজোরে পর পর দু'টি আঘাত করলে আমি পড়ে যাই। পাকসেনারা চ্যা-দোলা করে আবার আমাকে ট্রাকের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে। আমি প্রায় অচেতন অবস্থায় গাড়ির মধ্যে পড়ে থাকি। পাকসেনারা আমার সারা শরীরের উপর বুট দিয়ে পাড়াতে থাকে। ট্রাক চলতে থাকে। প্রায় ১ ঘন্টা পর গাড়ি থেমে যায়। এ সময় পাকসেনারা চ্যাঙদোলা করে ধরে নামিয়ে পাবনা ওয়াপদার কয়েদখানার মধ্যে ছুঁড়ে মারে।

৪/৫ দিন এ সেলে ছিলাম। এরপর জেলখানায় পাঠানো হয়। ১৩ দিন পর জামিন পাই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পাকসেনারা বন্দি অবস্থায় সারা দিনে পাতলা দু'খানা চাপাতি ও ১ বালতি পানি বরাদ্দ ছিল। এছাড়া খালি মেঝেতে মাথার নিচে সেন্ডেল দিয়ে আমাদের শুতে হত।

আমাকে গ্রেপ্তারকারী সুবেদার বার বার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে, ক্যাপ্টেন তাহেরের সাথে তোমার কি হয়েছে। সে তোমাকে বার বার মারছে কেন?

আমি ঐ সুবেদারের কাছ থেকেই মেজর আসলাম খটকের নাম জানতে পাই। আমি নিশ্চিত পাবনার ডেমড়া, সাতবাড়ীয়া সহ জেলার হাজার হাজার নিরস্ত্র বাঙালি হত্যার সাথে পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন তাহের সরাসরি জড়িত ছিল। ক্যাপ্টেন তাহের অত্যন্ত বদমেজাজী ছিল। নির্যাতনের উপর তার আমেরিকা থেকে প্রশিক্ষণ নেয়া ছিল বলে সুবেদার আমাকে জানিয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার কারণে আমাকে পাকবাহিনীর হাতে ভয়াবহ নির্যাতন সইতে হয়েছে। আমার শ্বশুর মুহম্মদ আলী খাঁ, তিন শ্যালক সিরাজ, ইজাজ, নূরুল ও আমার দু'ভায়রাকে পাকবাহিনী নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করেছে। এত কিছুর পরেও মুক্তিযোদ্ধার তালিকায় আমাদের নাম ওঠেনি। সে সময় রাজনৈতিক কোন্দলের কারণে আমার নাম মুক্তিযোদ্ধা তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

সাক্ষাৎকার ঃ শফিউল আলম রাজা ও কৃষ্ণ ভৌমিক

আমার গলায় দড়ি দিয়ে ট্রাকের পিছনে বেঁধে নিয়ে যায় মাইল খানেক পথ

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

দক্ষিণের জেলা সাতক্ষীরার ব্রক্ষরাজপুর গ্রামের একজন সাধারণ কৃষক ছিলেন মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম। আওয়ামী লীগের স্থানীয় সংসদের আত্মীয় হওয়ার কারণে একাত্তরে তিনি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মম নির্যাতনের শিকার হন। সেই নির্যাতনের ধকল এখনও তাঁকে পোহাতে হচ্ছে। ১১ অক্টোবর '৯৯ তারিখে তাঁর গ্রামের বাড়িতে এই জবানবন্দি ধারণ করা হয়।

আমি মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, পিতা মৃত মোহাম্মদ হোসেন সরদার, গ্রাম ও পোস্ট—ব্রক্ষরাজপুর, থানা—সাতক্ষীরা, জেলা—সাতক্ষীরা। আমি ১৯৭১ সালে গ্রামে কৃষিকাজ করতাম।

আমার ভগ্নিপতি এম এ আব্দুল গফুর ছিলেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা। '৭০-এর নির্বাচনে তিনি এম এল এ নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁরই কারণে '৭১-এর এপ্রিলের ২ তারিখে বিকেল চারটার দিকে পাকিস্তানি মেজর নাসের খানের নেতৃত্বে পাকিস্তানি সৈন্যরা একটি জিপ ও ট্রাকযোগে এসে আমার বাড়ি ঘেরাও করে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে স্থানীয় পিস কমিটির সেক্রেটারী শুকুরালী ছিল। আমাকে ঘুমন্ত অবস্থা থেকে ডেকে তুলে ওরা জিজ্ঞাসা করে, তোমার আব্বা কোথায়? মেশিনগান, স্টেনগান কোথায়?

এরপর আমাকে ঘর থেকে টানতে টানতে বের করে। এঘর-সেঘর খোঁজ করে কোন অস্ত্রই ওরা পায়নি। তারপরও আমাকে পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে নিয়ে যায় মাহমুদপুর পাক বাহিনীর হেডকোয়ার্টারে।

সেখানে নিয়ে প্রথমে আমাকে হাত বেঁধে ঝুলিয়ে ডান্ডা দিয়ে পিটাতে থাকে।

তারপর ইট মাথায় দিয়ে সারারাত পুকুরে দাঁড় করিয়ে রাখে। সেখান থেকে তুলে আবার এনে মারধর করে।

তার পরের দিন আমার গলায় দড়ি দিয়ে ট্রাকের পিছনে বেঁধে টেনে নিয়ে যায় মাইল খানিক পথ। তারপর খুঁটিতে বেঁধে বেয়নেট দিয়ে সারা শরীর খুঁচিয়ে ক্ষত বিক্ষত করে। এভাবে তিন দিন কেটে যায়। ওদের প্রচণ্ড অত্যাচারে বার বার আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। তারপর্ থেকে আর কিছু বলতে পারি না। একদিন রাইফেলের বাট দিয়ে মুখে বাড়ি মারার পর আমার উপরের দাঁতগুলো সব পড়ে যায়। বেশির ভাগ সময় ওরা আমাকে মাটিতে ফেলে সারা শরীর বুটজুতা পায়ে মাড়াতো। চার দিনের মাথায় আমাকে সাতক্ষীরা থানায় নিয়ে এসে সাতাশ দিন আটক রাখে। থানাতেও আমার উপর মারধর সহ্ অকথ্য নির্যাতন চালান হয়।

তারা বার বার আমার কাছে জানতে চেয়েছে, এম এল এ আব্দুল গফুর কোথায়? অস্ত্র কোথায়? অথচ আমি এ বিষয়ে কিছুই জানতাম না।

প্রায় এক মাস পর আমার অপর এক ভগ্নিপতি তালার আব্দুল লতিফ থানার ওসির সাথে যোগাযোগ করে টাকা পয়সা দিয়ে আমাকে ছাড়িয়ে আনেন। তারপর থেকে রাজাকার ও পিস কমিটির লোকজনরা আমাদের বাড়িতে আসত, কিন্তু কিছু বলত না। তারা আমার উপর নজর রাখার জন্যই হঠাৎ হঠাৎ আসত। বাড়িতে ফেরার পর স্থানীয় ডাক্তার সিদ্দিকুর রহমানের নিকট চার মাস চিকিৎসার পর একটু সুস্থ হই।

এখনও অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময় আমার সমস্ত শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা হয়। ফলে দুইটা করে ইনজেকশন নিতে হয়। ব্যথা দূর করার ইনজেকশন নেয়ার পর একটু সুস্থ বোধ করি। আমার শারীরিক অবস্থা খুই খারাপ। একাত্তরে পাকিস্তানি সৈন্যদের নির্যাতনের জন্য আমাকে আটাশ বছর পরও ভুগতে হচ্ছে।

সাক্ষাৎকার ঃ আবুল কালাম আজাদ

রাস্তার ধারে স্তুপকৃত অনেক লাশের উপর আমার আব্বার লাশ দেখতে পাই

গাজী কামালউদ্দীন

চট্টগ্রামের শহীদ পিতার সন্তান গাজী কামাল। '৭১-এর নভেম্বরে পাকিস্তানিরা তার পিতা আলী করিমকে হত্যা করে পাহাড়তলীর বধ্যভূমিতে ফেলে রাখে। পাহাড়তলী ছিল চট্টগ্রামের বৃহত্তর বধ্যভূমি। গাজী কামালউদ্দীন এ বধ্যভূমিতে তাঁর পিতার হত্যা এবং বাঙালি নিধনের বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর এ জবানবন্দি ৪ অক্টোবর '৯৯ চট্টগ্রামে ধারণ করা হয়েছে।

১৯৭১-এ ২৫শে মার্চ সারাদেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যে গণহত্যাযজ্ঞের সূচনা করে, সেই বর্বরতার আঁচড় থেকে চট্টগ্রামও রেহাই পায়নি। আমার বাবা আলী করিম রেলওয়ে সিএমই বিভাগের হেডক্লার্ক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। আমরা সাত ভাই, এক বোন সহ বাবার পাহাড়তলীস্থ পাঞ্জাবী লেনের (বর্তমানে শহীদ লেইন) রেলওয়ের ২৩০/বি কোয়ার্টারে থাকতাম। পাঞ্জাবী লেনের আশেপাশে প্রচুর পরিমাণে অবাঙালি বিহারীদের বসবাস ছিল।

১৯৭১-এ আমার বয়স ছিল ১৩ বছর। ২৫শে মার্চের পর থেকে যে বাঙালি নিধন শুরু হয় তাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে অবাঙালি বিহারীরাও যোগ দেয়। আমাদের এলাকাটি অবাঙালি বিহারীদের আধিপত্যের কারণে তাদের অত্যাচার পৈশাচিকতায় রূপ নেয়। আমরা ৫ এপ্রিল পায়ে হেঁটে নোয়াখালির গ্রামের বাড়িতে যাই।

আমরা গ্রামে বেশ কিছুদিন অবস্থান করি। এরই মাঝে আমার তিন ভাই গাজী মেজবাউদ্দীন, গাজী শামসুদ্দীন ও গাজী সালাহ্উদ্দীন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে ভারতে চলে যান। আমরা গ্রামের বাড়িতে থেকে যাই। ততদিনে সারা দেশে মুক্তিযুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে।

তৎকালীন পাকিস্তান সরকার সকল সরকারি কর্মচারীদের বার বার কর্মস্থলে যোগদানের নির্দেশ দিচ্ছিল। সেপ্টেম্বরের শেষে আমার বাবা আমাকে ও আমার চাচা আলী হোসেনকে নিয়ে চট্টগ্রাম আসেন। আমরা আবার আমাদের রেলওয়ের ২৩০/বি কোয়ার্টারে এসে উঠি। আমাদের সাথে আমাদের গ্রামের গোফরান ও রেলওয়ের কোয়ার্টারের মান্নান ও আসলাম নামের এক ব্যক্তি থাকতেন।

চারদিকে সারাক্ষণ গোলাগুলির আওয়াজে ভীষণ ভয় হত। তার উপর অবাঙালি বিহারীদের লুটপাট ও হম্বিতম্বি আমাদের সবসময় অস্থির করে রাখত। আমার বাবা সহ অন্যান্য বাঙালিরা এরই মাঝে অফিসে যেতেন। অফিসে যাওয়ার জন্য তারা সবসময় যে রাস্তাটি ব্যবহার করতেন সে রাস্তাটি ছিল অবাঙালি বিহারীদের পাড়ার ভিতর দিয়ে। অনেক বাঙালিকে ঐ রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় অবাঙালি বিহারীরা তাদের উপর নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করেছিল। তাই বাঙালিরা পরে ঐ রাস্তাটি ব্যবহার না করে ঘুরপথে অফিসে যাতায়াত করতেন।

নভেম্বরের ১০ তারিখ, রমজান মাস, আব্বা প্রতিদিনের মত ভোরে অফিসের উদ্দেশ্যে বের হন। প্রতিদিনের মত আব্বা চলে যাওয়ার পর আমি দরজায় খিল দিতে যাই কিন্তু সেদিন দরজায় খিল না দিয়েই চলে আসি। অল্প কিছুক্ষণ পর বাইরে প্রচণ্ড গোলাগুলির আওয়াজ ও আর্তচিৎকার ভেসে আসে। আমার চাচা ও অন্যান্যরা উঁকি দিয়ে দেখি সমস্ত কোয়ার্টার পাকিস্তানি সৈন্য ও কালো পোশাক পরা মিলিশিয়া বাহিনী ঘিরে রেখেছে। তাদের ছত্রছায়ায় অবাঙালি বিহারীরা লুটপাট চালাচ্ছে এবং ঘর থেকে বাঙালিদের বের করে সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দিচ্ছে।

তাদের এই অত্যাচার এত পৈশাচিক ও ভয়াবহ যে আজও ঐ দিনগুলোর স্মৃতি মনে পড়লে আতঙ্কে শরীর শিহরিত হয়ে ওঠে। যাহোক, হঠাৎ করে দরজা দিয়ে আব্বা ঘরে ঢুকে খিল আটকে দেন ও আমাদের ডেকে কোয়ার্টার থেকে চলে যেতে বলে পিছনের রাস্তা দিয়ে বের হয়ে যান। আমি এত ভীত হয়ে পড়েছিলাম যে আব্বার সাথে আর কোন কথা বলতে পারলাম না। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে পেছনের দরজা দিয়ে আব্বাকে ডাকতে গিয়ে দেখলাম আব্বা চলে গেছেন।

আমরা আব্বার নির্দেশ মত ঘর তালা দিয়ে বের হতে যাব সেই মুহূর্তে বেশ ক'জন বিহারী সেনাবাহিনীর লোক নিয়ে আমাদের ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে। আমি ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে খাটের নিচে চালের ড্রামের আড়ালে লুকিয়ে পড়ি। ওরা আমার চাচাদের সাথে কথা বলে। তাদের বলে যে, বেশ কিছু লাশ সামনের রাস্তায় পড়ে আছে। চাচাদের যেতে হবে ওদের সঙ্গে। তারা লাশগুলো সনাক্ত করেই চলে আসতে পারবে। তারা আরও বলে যে জেনারেল নিয়াজী সাহেব স্বয়ং এসেছেন। তাছাড়া রেলওয়ের সি,এম,ই, সাহেবও উপস্থিত আছেন।

ওরা আমার চাচাদের নিয়ে গেলে আমি খাটের নিচে চালের ড্রামের আড়াল থেকে বের হয়ে আসি। কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে কাটাই। হঠাৎ আবার আমাদের ঘরের দরজা ভেঙে ২/৩ জন বিহারী ও পাক সেনাবাহিনীর লোক ঢুকে পড়ে ও আমাকে দেখে উর্দুতে জিজ্ঞাসা করে 'তুম কাঁহাসে আয়া।'

আমি তাদের বলি যে, আমি ঘরে আড়ালে লুকিয়ে ছিলাম। তারা আমাকে নিয়ে কলোনীর উত্তর দিকে যায়। কিছুদূর আসার পরে বর্তমান চক্ষু হাসপাতালের বিপরীতে আমার চাচাদের দেখি হাত পিছমোড়া করে বাঁধা সারি বেঁধে দাঁড়ানো অবস্থায়। তাদের দু'পাশে দু'জন পাকিস্তানি সৈন্য দেখতে পাই। অবাঙালি বিহারীরা বিভিন্ন দিক থেকে হত্যার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বাঙালিদের বের করে পাক সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দিচ্ছিল।

আমার চাচা আমাকে দেখে পালিয়ে যাওয়ার জন্য বলেন। আমি সুযোগ বুঝে পালিয়ে যাই। পাকসেনাদের একজন 'পাকড়ো,' বলে আমার পিছে ধাওয়া করে। আমি দৌড়ে বাসার পিছনে পায়খানার ট্যাংকের ভিতর লুকিয়ে পড়ি। তারা বহু খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে চলে যায়। আমি বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আমার মামা মহিউদ্দিন সাহেবের বাসায় আশ্রয় নিই। গোসল সেরে আব্বার খোঁজে বের হই। ততক্ষণে বাঙালিরা ঘর থেকে বের হয়ে এসে একে অপরের খোঁজ নিচ্ছিল।

একটু পরে আবার কালো পোষাক পরিহিত পাকিস্তানি মিলিশিয়া বাহিনী এসে হাজির হয় ও পুরো এলাকাটি ঘিরে ফেলে। আব্বার কোন খবর না পেয়ে আমি তাঁর খোঁজে তার সহকর্মী নাদরুজ্জামান সাহেবের বাসায় যাই। তিনি জানান পাঞ্জাবী লেইনের এই খবর শুনে তিনি ও আমার বাবা ১১.৩০ মিনিট অফিস থেকে বাসার উদ্দেশ্যে বের হন। পথে তিনি তার বাসার দিকে চলে যান। তিনি বলেন সম্ভবত আমার আব্বা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীদের হাতে ধরা পড়েছেন, কারণ তিনি আমার বাবাকে দুইজন বিহারীর সাথে কথা বলতে দেখেন। আমি ফিরে আসি ও রাতে আমার মামা করিম সাহেব আমাকে তার পাথরঘাটাস্থ বাসায় নিয়ে আসেন।

তার পর দিন ১১ নভেম্বর সকালে আমি পাঞ্জাবী লেইনে ফিরে আসি। বর্তমানে বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্রের বিপরীতে খোলা মাঠে অসংখ্য লাশ দেখতে পাই। মাঠটি রাস্তা থেকে উঁচু হওয়ায় আমি উপরে উঠে আব্বার লাশ খুঁজতে থাকি। রাস্তার ধারে স্তুপকৃত অনেক লাশের উপর আমার আব্বার লাশ দেখতে পাই। ঠিক তখনই রাস্তা দিয়ে কালো পোষাক পরিহিত পাকিস্তানি মিলিশিয়া ও বেলুচ রেজিমেন্ট জায়গাটি ঘিরে ফেলে ও গুলিবর্ষণ করে সমবেত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। আমি গড়িয়ে উল্টো দিকের পাহাড়ের উপরে উঠে দেখি মিলিশিয়া ও বেলুচ রেজিমেন্টের জোয়ানরা বিশাল গর্ত খুড়ে সমস্ত লাশ গর্তে কবর দিচ্ছে।

বর্তমানে সেই ঐতিহাসিক গণকবরটি সম্পূর্ণ অরক্ষিত। আমরা এর এক সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ কামনা করি। কারণ এই গণকবরটি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নৃশংসতম গণহত্যা যজ্ঞের এক ঐতিহাসিক নিদর্শন।

সাক্ষাৎকার ঃ পৃথ্বীশ সেন ঋষি
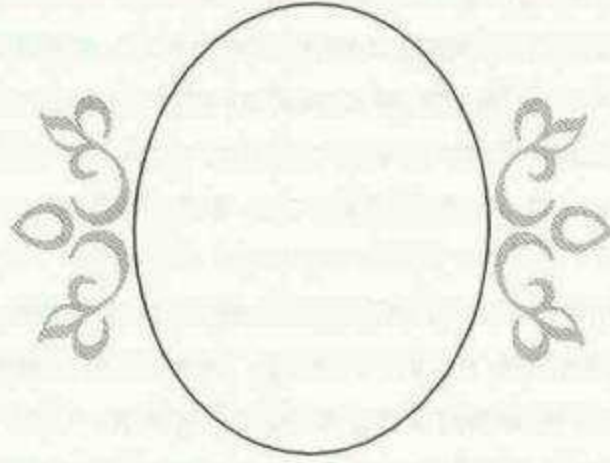
এক পাঞ্জাবি কুকুর, কুকুরের মতই আমার কোমরের ওপর চড়াও হয়ে আমাকে উপর্যুপরি ধর্ষণ করেছিল

রাবেয়া খাতুন

'৭১-এর ২৫শে মার্চের পর রাজারবাগ পুলিশ লাইনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যা, নারী নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞের নারকীয় দৃশ্যাবলী প্রত্যক্ষ করেছেন সেখানকার সুইপার রাবেয়া খাতুন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংসতা যে কত ভয়ঙ্কর হতে পারে তার একটি প্রামাণ্য দলিল রাবেয়া খাতুনের এ জবানবন্দি, যা নেয়া হয়েছে 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও দলিলপত্র ঃ অষ্টম খন্ড' থেকে। এই খণ্ডে রাজারবাগের রিজার্ভ ইন্সপেক্টর অব পুলিশ আব্দুল কুদ্দুস মিয়া এবং আর্মস এস আই বি আর পি সুবেদার খলিলুর রহমানের জবানবন্দিও ছাপা হয়েছে। আমরা এই তিনটি জবানবন্দি মিলিয়ে দেখেছি। রাবেয়া খাতুন নিজে ধর্ষিতা হওয়ার কারণে এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্যাতন কাছে থেকে দেখার কারণে তাঁর জবানবন্দি আমরা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছি। তিনি এই জবানবন্দি দিয়েছেন '৭৪-এর ১৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে।

॰ ১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ রাতে হানাদার পাঞ্জাবি সেনারা যখন রাজারবাগ পুলিশ লাইনের উপর অতর্কিতে হামলা চালায় তখন আমি রাজারবাগ পুলিশ লাইনের এস, এফ, কেন্টিনে ছিলাম। আসন্ন হামলার ভয়ে আমি সারাদিন পুলিশ লাইনের ব্যারাক ঝাড়ু দিয়ে রাতে ব্যারাকেই ছিলাম। কামান, গোলা, লাইটবোম আর ট্যাঙ্কের অবিরাম কানফাটা গর্জ্জনে আমি ভয়ে ব্যারাকের মধ্যে কাত হয়ে পড়ে থেকে থরথরিয়ে কাঁপছিলাম। ২৬শে মার্চ সকালে ওদের কামানের সম্মুখে আমাদের বীর বাঙালি পুলিশ বাহিনী বীরের মত প্রতিরোধ করতে করতে আর টিকে থাকতে পারে নাই। সকালে ওরা পুলিশ লাইনের এস, এফ, ব্যারাকের চারদিকে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং ব্যারাকের

মধ্যে প্রবেশ করে বাঙালি পুলিশদের নাকে, মুখে, সারা দেহে বেয়নেট ও বেটন চার্জ করতে করতে ও বুটের লাথি মারতে মারতে বের করে নিয়ে আসছিল।

ক্যান্টিনের কামরা থেকে বন্দুকের নলের মুখে আমাকেও বের করে আনা হয়, আমাকে লাথি মেরে মাটিতে ফেলে দেয়া হয় এবং আমার উপর প্রকাশ্যে পাশবিক অত্যাচার করছিল আর কুকুরের মত অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছিল। আমার উপর উপর্যুপরি পাশবিক অত্যাচার করতে করতে যখন আমাকে একেবারে মেরে ফেলে দেয়ার উপক্রম হয় তখন আমার বাঁচবার আর কোন উপায় না দেখে আমি আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্য ওদের নিকট কাতর মিনতি জানাচ্ছিলাম। আমি হাউ মাউ করে কাঁদছিলাম, আর বলছিলাম আমাকে মেরো না, আমি সুইপার, আমাকে মেরে ফেললে তোমাদের পায়খানা ও নর্দমা পরিষ্কার করার আর কেউ থাকবে না, তোমাদের পায়ে পড়ি তোমরা আমাকে মেরো না, মেরো না, মেরো না, আমাকে মেরে ফেললে তোমাদের পুলিশ লাইন রক্ত ও লাশের পচা গন্ধে মানুষের বাস করার অযোগ্য হয়ে পড়বে।

তখনও আমার উপর এক পাঞ্জাবি কুকুর, কুকুরের মতই আমার কোমরের উপর চড়াও হয়ে আমাকে উপর্যুপরি ধর্ষণ করছিল। আমাকে এভাবে ধর্ষণ করতে করতে মেরে ফেলে দিলে রাজারবাগ পুলিশ লাইন পরিষ্কার করার জন্য আর কেউ থাকবে না একথা ভেবে আমাকে এক পাঞ্জাবি সেনা ধমক দিয়ে বলতে থাকে, ঠিক হায়, তোমকো ছোড় দিয়া যায়েগা জারা বাদ, তোম বাহার নাহি নেকলেগা, হারওয়াকত লাইন পার হাজির রাহেগা। একথা বলে আমাকে ছেড়ে দেয়।

পাঞ্জাবি সেনারা রাজাকার ও দালালদের সাহায্যে রাজধানীর স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা এবং অভিজাত জনপদ থেকে বহু বাঙালি যুবতী, মেয়ে, রূপসী মহিলা এবং সুন্দরী বালিকাদের জীপে, মিলিটারী ট্রাকে করে পুলিশ লাইনের বিভিন্ন ব্যারাকে জমায়েত করতে থাকে। আমি ক্যান্টিনের ড্রেন পরিষ্কার করছিলাম— দেখলাম আমার সম্মুখ দিয়ে জীপ থেকে আর্মি ট্রাক থেকে লাইন করে বহু বালিকা যুবতী ও মহিলাকে এস, এফ ক্যান্টিনের মধ্য দিয়ে ব্যারাকে রাখা হল। বহু মেয়েকে হেডকোয়ার্টার বিল্ডিং-এর উপর তলায় রুমে নিয়ে যাওয়া হল, আর অবশিষ্ট মেয়ে যাদেরকে ব্যারাকের ভিতরে যায়গা দেওয়া গেল না তাদের বারান্দায় দাঁড় করিয়ে রাখা হল। অধিকাংশ মেয়ের হাতে বই ও খাতা দেখলাম, অনেক রূপসী যুবতীর দেহে অলঙ্কার দেখলাম, তাদের মধ্যে অধিকাংশ মেয়ের চোখ বেয়ে অঝোরে অশ্রু পড়ছিল।

এরপরই আরম্ভ হয়ে গেল সেই বাঙালি নারীদের উপর বীভৎস ধর্ষণ। লাইন থেকে পাঞ্জাবি সেনারা কুকুরের মত জিভ চাটতে চাটতে ব্যারাকের মধ্যে উন্মত্ত অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে প্রবেশ করতে লাগল। ওরা ব্যারাকে ব্যারাকে প্রবেশ করে প্রতিটি যুবতী, মহিলা ও বালিকার পরণের কাপড় খুলে একেবারে উলঙ্গ করে মাটিতে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে বীভৎস ধর্ষণে লেগে গেল। কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সেই নিরীহ বালিকাদের উপর ধর্ষণে লেগে গেল, আমি ব্যারাকে ড্রেন পরিষ্কার করার অভিনয় করছিলাম আর

ওদের বীভৎস পৈশাচিকতা দেখছিলাম। ওদের উন্মত্ত উল্লাসের সামনে কোন মেয়ে কোন শব্দ পর্যন্তও করে নাই, করতে পারে নাই। উন্মত্ত পাঞ্জাবি সেনারা এই নিরীহ বাঙালি মেয়েদের শুধু মাত্র ধর্ষণ করেই ছেড়ে দেয় নাই— আমি দেখলাম পাক সেনারা সেই মেয়েদের উপর পাগলের মত উঠে ধর্ষণ করছে আর ধারাল দাঁত বের করে বক্ষের স্তন ও গালের মাংস কামড়াতে কামড়াতে রক্তাক্ত করে দিচ্ছে, ওদের উদ্ধত ও উন্মত্ত কামড়ে অনেক কচি মেয়ের স্তনসহ বক্ষের মাংস উঠে আসছিল, মেয়েদের গাল, পেট, ঘাড়, বক্ষ, পিঠের ও কোমরের অংশ ওদের অবিরাম দংশনে রক্তাক্ত হয়ে গেল।

যে সকল বাঙালি যুবতী ওদের প্রমত্ত পাশবিকতার শিকার হতে অস্বীকার করলো দেখলাম তৎক্ষণাৎ পাঞ্জাবি সেনারা ওদেরকে চুল ধরে টেনে এনে স্তন ছো মেরে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে ওদের যোনি ও গুহ্যদ্বারের মধ্যে বন্দুকের নল, বেয়নেট ও ধারাল ছুরি ঢুকিয়ে দিয়ে সেই বীরাঙ্গনাদের পবিত্র দেহ ছিন্ন ভিন্ন করে দিচ্ছিল। অনেক পশু ছোট ছোট বালিকাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে ওদের অসার রক্তাক্ত দেহ বাইরে এনে দুজনে দু পা' দুদিকে টেনে ধরে চড়চড়িয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিল, আমি দেখলাম সেখানে বসে বসে, আর ড্রেন পরিষ্কার করছিলাম, পাঞ্জাবিরা শ্মশানের লাশ যেকোন কুকুরের মত মদ খেয়ে সব সময় সেখানকার যার যে মেয়ে ইচ্ছা তাকেই ধরে ধর্ষণ করছিল।

শুধু সাধারণ পাঞ্জাবি সেনারাই এই বীভৎস পাশবিক অত্যাচারে যোগ দেয় নাই, সকল উচ্চ পদস্থ পাঞ্জাবি সামরিক অফিসারই মদ খেয়ে হিংস্র বাঘের মত হয়ে দুই হাত বাঘের মত নাচাতে নাচাতে সেই উলঙ্গ বালিকা, যুবতী ও বাঙালি মহিলাদের উপর সারাক্ষণ পর্যায়ক্রমে ধর্ষণ কাজে লিপ্ত থাকত। কোন মেয়ে, মহিলা যুবতীকে এক মুহূর্তের জন্য অবসর দেওয়া হয় নাই, ওদের উপর্যুপরি ধর্ষণ ও অবিরাম অত্যাচারে বহু কচি বালিকা সেখানেই রক্তাক্ত দেহে কাতরাতে কাতরাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে, পরের দিন এসকল মেয়ের লাশ অন্যান্য মেয়েদের সম্মুখে ছুরি দিয়ে কেটে কুচি কুচি করে বস্তার মধ্যে ভরে বাইরে ফেলে দিত। এসকল মহিলা, বালিকা ও যুবতীদের নির্মম পরিণতি দেখে অন্যান্য মেয়েরা আরও ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ত, এবং স্বেচ্ছায় পশুদের ইচ্ছার সম্মুখে আত্মসমর্পণ করত।

যে সকল মেয়ে প্রাণে বাঁচার জন্য ওদের সাথে মিল দিয়ে ওদের অতৃপ্ত যৌন ক্ষুধা চরিতার্থ করার জন্য সর্বতোভাবে সহযোগিতা করে তাদের পিছনে ঘুরে বেড়িয়েছে তাদের হাসি তামাশায় দেহ দান করেছে তাদেরকেও ছাড়া হয় নাই। পদস্থ সামরিক অফিসাররা সেই সকল মেয়েদের উপর সম্মিলিতভাবে ধর্ষণ করতে করতে হঠাৎ একদিন তাকে ধরে ছুরি দিয়ে তার স্তন কেটে, পাছার মাংস কেটে, যোনি ও গুহ্য দ্বারের মধ্যে সম্পূর্ণ ছুরি চালিয়ে দিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে ওরা আনন্দ উপভোগ করত।

এর পর উলঙ্গ মেয়েদেরকে গরুর মত লাথি মারতে মারতে, পশুর মত পিটাতে পিটাতে উপরে হেডকোয়ার্টারে দোতলা, তেতলা ও চার তলায় উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড়

করিয়ে রাখা হয়। পাঞ্জাবি সেনারা চলে যাওয়ার সময় মেয়েদেরকে লাথি মেরে আবার কামরার ভিতর ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করে চলে যেত। এর পর বহু যুবতী মেয়েকে হেডকোয়ার্টারের উপর তলায় বারান্দার মোটা লোহার তারের উপর চুলের সাথে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়— প্রতিদিন পাঞ্জাবিরা সেখানে যাতায়াত করত সেই ঝুলন্ত উলঙ্গ যুবতীদের কেউ এসে তাদের উলঙ্গ দেহের কোমরের মাংস বেটন দিয়ে উন্মত্তভাবে আঘাত করতে থাকত, কেউ তাদের বক্ষের স্তন কেটে নিয়ে যেত, কেউ হাসতে হাসতে তাদের যোনিপথে লাঠি ঢুকিয়ে আনন্দ উপভোগ করত, কেউ ধারাল চাকু দিয়ে কোন যুবতীর পাছার মাংস আস্তে আস্তে কেটে কেটে আনন্দ করত, কেউ উঁচু চেয়ারে দাঁড়িয়ে উন্মুক্তবক্ষ মেয়েদের স্তনে মুখ লাগিয়ে ধারাল দাঁত দিয়ে স্তনের মাংস তুলে নিয়ে আনন্দে অট্টহাসি করত। কোন মেয়ে এসব অত্যাচারে কোন প্রকার চিৎকার করার চেষ্টা করলে তার যোনিপথ দিয়ে লোহার রড ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হত। প্রতিটি মেয়ের হাত বাঁধা ছিল পিছনের দিকে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। অনেক সময় পাঞ্জাবি সেনারা সেখানে এসে সেই ঝুলন্ত উলঙ্গ মেয়েদের এলোপাথাড়ি বেদম প্রহার করে যেত।

প্রতিদিন এভাবে বিরামহীন প্রহারে মেয়েদের দেহের মাংস ফেটে রক্ত ঝরছিল, মেয়েদের কারও মুখের সম্মুখের দিকে দাঁত ছিল না, ঠোঁটের দু'দিকের মাংস কামড়ে, টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল, লাঠি ও লোহার রডের অবিরাম পিটুনিতে প্রতিটি মেয়ের আঙুল, হাতের তালু ভেঙে, থেতলে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এসব অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত মহিলা ও মেয়েদের প্রশ্রাব ও পায়খানা করার জন্য হাতের ও চুলের বাঁধন খুলে দেওয়া হত না এক মুহূর্তের জন্য। হেডকোয়ার্টারের উপর তলার বারান্দায় এই ঝুলন্ত উলঙ্গ মেয়েরা হাত বাঁধা অবস্থায় লোহার তারে ঝুলে থেকে সেখানে প্রশ্রাব পায়খানা করত— আমি প্রতিদিন সেখানে গিয়ে এসব প্রশ্রাব পায়খানা পরিষ্কার করতাম।

আমি স্বচক্ষে দেখেছি, অনেক মেয়ে অবিরাম ধর্ষণের ফলে নির্মমভাবে ঝুলন্ত অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেছে। প্রতিদিন সকালে গিয়ে সেই বাঁধন থেকে অনেক বাঙালি যুবতীর বীভৎস মৃতদেহ পাঞ্জাবি সেনাদেরকে নামাতে দেখেছি। আমি দিনের বেলায়ও সেখানে সেই সকল বন্দী মহিলাদের পুতগন্ধ, প্রশ্রাব-পায়খানা পরিষ্কার করার জন্য সারাদিন উপস্থিত থাকতাম। প্রতিদিন রাজারবাগ পুলিশ লাইনের ব্যারাক থেকে এবং হেডকোয়ার্টার অফিসের উপর তলা হতে বহু ধর্ষিতা মেয়ের ক্ষতবিক্ষত বিকৃত লাশ ওরা পায়ে রশি বেঁধে নিয়ে যায় এবং সেই জায়গায় রাজধানী থেকে ধরে আনা নতুন নতুন মেয়েদের চুলের সাথে ঝুলিয়ে বেঁধে নির্মমভাবে ধর্ষণ আরম্ভ করে দেয়। এসব উলঙ্গ নিরীহ বাঙালি যুবতীদের সারাক্ষণ সশস্ত্র পাঞ্জাবি সেনারা প্রহরা দিত। কোন বাঙালিকেই সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হত না। আর আমি ছাড়া অন্য কোন সুইপারকেও সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হত না।

মেয়েদের হাজারো কাতর আহাজারিতেও আমি ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বাঙালি মেয়েদের বাঁচাবার জন্য কোন ভূমিকা পালন করতে পারি নাই। এপ্রিল মাসের দিকে

আমি অন্ধকার পরিষ্কার হওয়ার সাথে সাথে খুব ভোরে হেডকোয়ার্টারের উপর তলায় সারারাত ঝুলন্ত মেয়েদের মলমূত্র পরিষ্কার করছিলাম। এমন সময় সিদ্ধেশ্বরীর ১৩৯নং বাসার রানু নামে এক কলেজের ছাত্রীর কাতর প্রার্থনায় আমি অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে পড়ি এবং মেথরের কাপড় পরিয়ে কলেজ ছাত্রী রানুকে মুক্ত করে পুলিশ লাইনের বাইরে নিরাপদে দিয়ে আসি। স্বাধীন হওয়ার পর সেই মেয়েকে আর দেখি নাই। ১৯৭১ সনের ডিসেম্বরে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্রবাহিনী বাংলাদেশ মুক্ত করার পূর্ব পর্যন্ত পাঞ্জাবি সেনারা এসকল নিরীহ বাঙালি মহিলা, যুবতী ও বালিকাদের উপর এভাবে নির্মম—পাশবিক অত্যাচার ও বীভৎসভাবে ধর্ষণ করে যাচ্ছিল। ডিসেম্বরের প্রথমদিকে মিত্রবাহিনী ঢাকায় বোমাবর্ষণের সাথে সাথে পাঞ্জাবি সেনারা আমাদের চোখের সামনে মেয়েদের নির্মমভাবে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। রাজারবাগ হেডকোয়ার্টার অফিসের উপর তলায়, সমস্ত কক্ষে, বারান্দায় এই নিরীহ মহিলা ও বালিকাদের তাজা রক্ত জমাট হয়েছিল। ডিসেম্বরে মুক্তিবাহিনী ও মিত্র বাহিনী রাজধানীতে বীর বিক্রমে প্রবেশ করলে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের সকল পাঞ্জাবি সেনা আত্মসমর্পণ করে।

টিপসহি
রাবেয়া খাতুন
১৮-২-৭৪

কয়েকটি বধ্যভূমির বিবরণ ও আলোকচিত্র
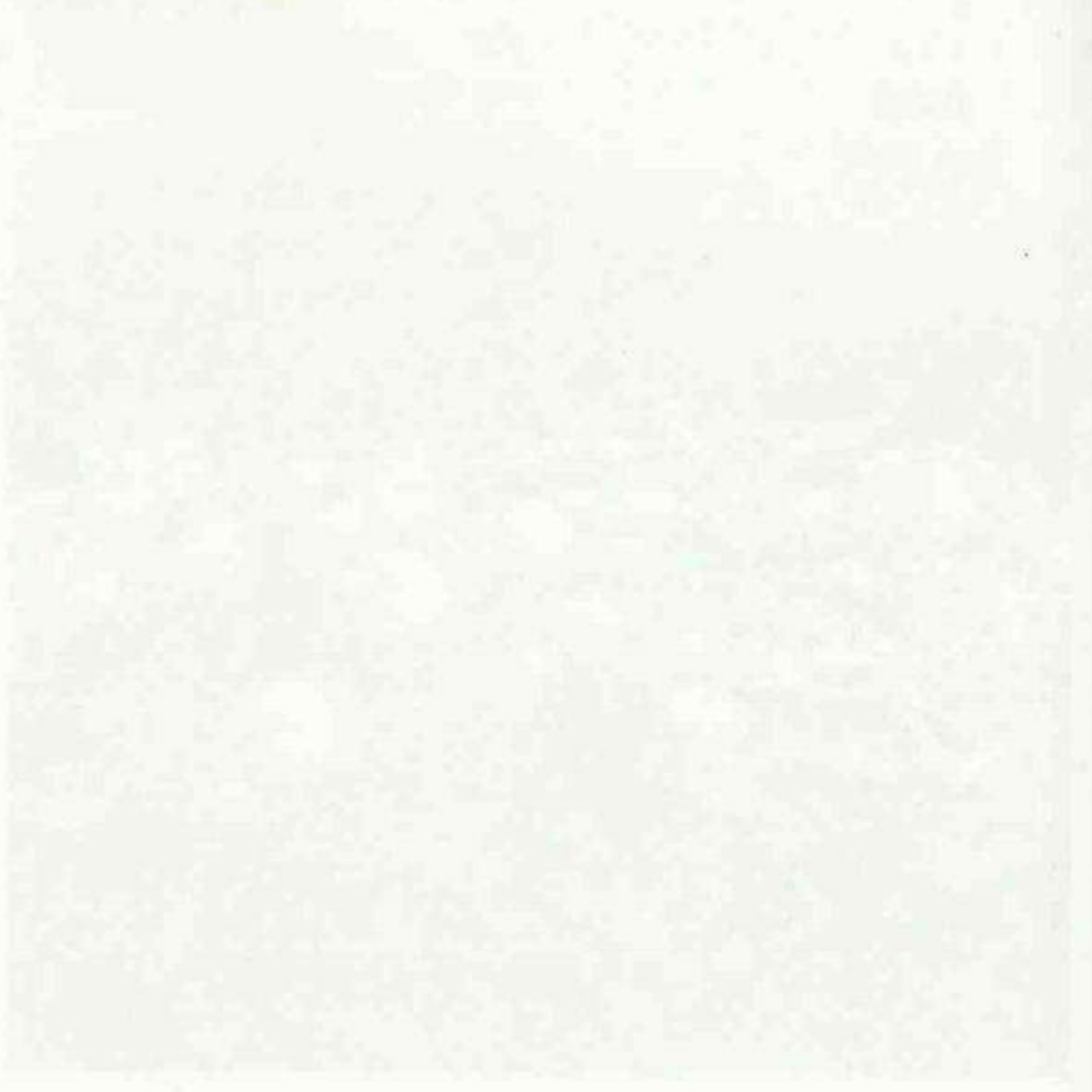
মাটি খুঁড়ে ইতিহাস অনুসন্ধানের শুরুর ঘটনাটা ঘটেছে আকস্মিকভাবে। ১৯৯৯ সালের জুলাই মাসের ঘটনা। মিরপুর ১২ নম্বর সেকশনের নুরী সমজিদ সংলগ্ন একটি ফাঁকা জমিতে মসজিদের সম্প্রসারণের কাজ চলছিল বেশ কিছুদিন ধরেই। মসজিদ কমিটির কর্মকর্তারা সেই জমিতে নতুন মসজিদ ভবন নির্মাণের জন্য পিলার তৈরির কাজ করতে গিয়ে ২৭ জুলাই মাটির নিচে একটি পরিত্যক্ত কুয়ার সন্ধান পান। কংক্রিটের স্ল্যাব দিয়ে ঢাকা ছিল কুয়ার মুখটি। নির্মাণ শ্রমিকরা স্ল্যাবটির অংশ বিশেষ ভেঙে তুলতেই কুয়ার মুখ থেকে তিনটি মাথার খুলি এবং বেশ কিছু হাড় পান। পরদিন একই স্থানে আরও একটি খুলি এবং বেশ কিছু হাড় পাওয়া যায়। 'একাত্তর স্মৃতি পরিষদ' নামে স্থানীয় একটি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এ খবর পেয়ে মাথার খুলি ও হাড়গুলো সংগ্রহ করে হস্তান্তর করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কাছে।

স্থানীয় মুসলিম বাজার সংলগ্ন নুরী মসজিদের নতুন ভবন নির্মাণের কাজ করতে গিয়ে দেহাবশেষ উদ্ধারের এ ঘটনা সর্বপ্রথম দৈনিক 'প্রথম আলো' প্রকাশ করে। এরপর অন্য সকল জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় এ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হতে থাকে। নুরী মসজিদ সংলগ্ন ওই ফাঁকা জমিটি একাত্তরের বধ্যভূমি হিসেবে চিহ্নিত হয়।

ঘটনার ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর উক্ত জমিটি খননের সিদ্ধান্ত নেয়। মাটির নিচ থেকে দেহাবশেষ ও অন্যান্য নিদর্শন উদ্ধারের মধ্যদিয়ে শহীদদের খোঁজ এবং ইতিহাসের অনুসন্ধান করাই ছিল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের খননের মূল লক্ষ্য। ৩১ জুলাই থেকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে নুরী মসজিদ সংলগ্ন পরিত্যক্ত কুয়ায় খনন কাজ শুরু করে। ৭ সেপ্টেম্বর '৯৯ পর্যন্ত প্রতিদিন সেই স্থানে খনন কাজ চলে। এর মধ্যে জাদুঘর কর্তৃপক্ষ খনন কাজে সহায়তার জন্য সেনাবাহিনীর সহযোগিতা দাবি করে সরকারের কাছে। সরকার ১২ আগস্ট '৯৯ থেকে খনন এবং শহীদদের দেহাবশেষ ও অন্যান্য নিদর্শন উদ্ধারের কাজে সহায়তার জন্য সেনাবাহিনী মোতায়েন করে।

তার আগেই ৮ আগস্ট মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এক সংবাদ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে নুরী মসজিদ সংলগ্ন পরিত্যক্ত কুয়া থেকে উদ্ধারকৃত দেহাবশেষগুলো বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষের এবং একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁদের বুলেট ও ধারালো অস্ত্রের আঘাতে হত্যা করা হয়েছিল। উদ্ধারকৃত মাথার খুলিগুলোর গঠন, উচ্চতা, হাড়ের সঙ্গে প্রাপ্ত কাপড়, জুতা ও ব্যবহার্য অন্যান্য দ্রব্যাদি এবং ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো পরীক্ষা- নিরীক্ষা করে জাদুঘর কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়।

উদ্ধারকৃত দেহাবশেষ ও নিদর্শন মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের—এ বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃপক্ষ পরিত্যক্ত কুয়া সংলগ্ন এলাকাকে একাত্তরে বধ্যভূমি হিসেবে চিহ্নিত করে এবং স্থানীয় বাজারের নামে এর নামকরণ করে 'মুসলিম বাজার বধ্যভূমি'।

জুলাই মাসের ৩১ তারিখ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মুসলিম বাজার বধ্যভূমি খননকালে প্রতিদিনই দেহাবশেষ ও অন্যান্য নিদর্শন পাওয়া যায়। সরকারের মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, ঢাকার মেয়র, জেলা প্রশাসক, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী বিভিন্ন

রাজনৈতিক দল, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নেতৃবৃন্দ, বরেণ্য বুদ্ধিজীবী এবং মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের সন্তানেরা পরিদর্শন করেন নব আবিষ্কৃত এ বধ্যভূমি এলাকা। এছাড়াও দেশের দূর-দুরান্তের অনেক জেলা থেকে অসংখ্য সাধারণ মানুষ ভীড় জমান বধ্যভূমি এবং উদ্ধারকৃত নির্দশন দেখার জন্য। দর্শনার্থীদের জন্য বধ্যভূমি সংলগ্ন এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর উদ্ধারকৃত দেহাবশেষ ও খনন কাজের আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে। একটি মন্তব্য খাতাও খোলা হয় সেখানে। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ সাধারণ মানুষ তাদের মন্তব্য লিখে জানান, সকলেই শহীদদের হত্যাকারীর বিচার দাবি করেন, ঘাতকদের প্রতি প্রকাশ করেন তাদের প্রচন্ড ঘৃণা।

প্রায় দেড়মাস মুসলিম বাজার বধ্যভূমি খনন করে শহীদদের দেহাবশেষ ও অন্যান্য নিদর্শন উদ্ধারের ঘটনা মানুষের মুখে মুখে ফিরতে শুরু করে। সকলেই উৎসুক হয়ে ওঠেন এই নির্মম হত্যাকান্ডের ইতিহাস জানতে। একাত্তরে নিখোঁজ শহীদদের সন্ধানে মিরপুরমুখী হয়ে ওঠেন তাদের স্বজনরা। মুক্তিযুদ্ধের সময় নিরীহ বাঙালি ও বুদ্ধিজীবীদের ধরে নিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহাযোগী বিহারী, রাজাকার, আলবদররা মিরপুরে হত্যা করেছিল। অনেক প্রবীণ ব্যক্তি যারা এই ইতিহাসের সাক্ষী তাঁরা সেই সব নারকীয় তান্ডবলীলার কথা জানাতে শুরু করেন।

মুসলিম বাজার বধ্যভূমি থেকে উদ্ধারকৃত শহীদদের দেহাবশেষের ব্যক্তি পরিচয় জানা যায়নি। কখনও জানা সম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু ২৮ বছর পরও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানার ব্যাপারে প্রবীণ ও নবীন সকল প্রজন্মের মানুষের মধ্যে যে ব্যাকুলতা লক্ষ্য করা গেছে তাতে ইতিহাস জীবন্ত হয়ে উঠছে। মুসলিম বাজার বধ্যভূমি যেন মানুষকে নতুন করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসমুখী করে তুলেছে। দৈনিক 'ভোরের কাগজ' পত্রিকা এই বধ্যভূমি আবিষ্কারের পর নিজেদের উদ্যোগে দীর্ঘ কয়েক মাস সেই ইতিহাস অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা চালিয়েছে। প্রকাশ করেছে বেশ কয়েকটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন। যার ফলে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার অজানা সাক্ষী বা প্রত্যক্ষদর্শীর সন্ধান পাওয়া গেছে। তাদের ভাষ্য থেকে বেরিয়ে এসেছে ইতিহাসের অনেক অজানা অধ্যায়।

মিরপুর থানার অধীনে মিরপুর ও হরিরামপুর নামে দু'টি ইউনিয়ন ছিল। স্বাধীনতার পর মিরপুর ইউনিয়নের প্রথম চেয়ারম্যান ফকির শফিরউদ্দিনকে খুঁজে বের করেছে ভোরের কাগজ। তার দীর্ঘ সাক্ষাৎকার থেকে পত্রিকাটি বের করে এনেছে ইতিহাসের অনুদঘাটিত অনেক তথ্য। ফকির শফিরউদ্দিন মিরপুরের আরও বড় বড় ৭টি বধ্যভূমির সন্ধান দিয়েছেন যেগুলোতে তিনি হাজার হাজার মানুষের দেহাবশেষ দেখেছিলেন নিজের চোখে। মুক্তিযুদ্ধের সময় মিরপুর এলাকায় বাঙালিদের ধরে নিয়ে হত্যাযজ্ঞ পরিচালনার যে নিদর্শন তিনি দেখেছিলেন, সেই লোমহর্ষক ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। মিরপুরে বাংলা কলেজের 'আমবাগান বধ্যভূমির' বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, সেখানে জবাই করে বাঙালিদের হত্যা করার নমুনাও তারা পেয়েছিলেন স্বাধীনতার অব্যাবহিত পরই।

তিনি বলেছেন, সেখানে বহু পুরোনো আমগাছের শেকড়ের গায়ে তখন ধারালো অস্ত্রের কোপের চিহ্ন দেখেছিলেন। গাছের এক পাশের নিচু জমিতে মাথার খুলির স্তুপ ও অন্য পাশে উঁচু জমিতে দেহের বাকি অংশের কংকালের স্তুপ দেখতে পেয়েছিলেন। তা

থেকে ধারণা করেন, গাছের বড়ো বড়ো শেকড়ের ওপর মাথা রেখে জবাই করা হয়েছিল বাঙালিদের। ফলে জবাইয়ের পর গাছের পাশের নিচু জমিতে মাথাগুলো গড়িয়ে পড়ে যায়, আরেক পাশে পড়ে থাকে দেহগুলো।

মুক্তিযুদ্ধের সময় মিরপুর ছিল বিহারী অধ্যুষিত এলাকা। এই বিহারীরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মিরপুরে বাঙালি নিধনে সহায়তা করেছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে। এই সহায়তাদানকারী বিহারীদের সম্পর্কেও ইতিহাসের এক দুর্লভ তথ্য বের হয়ে আসে ফকির শফিরউদ্দিনের ভাষ্য থেকে। তিনি জানিয়েছেন, মিরপুরে বাঙালি নিধনে সহায়তাদানকারী বিহারীদের নেতৃত্ব দিয়েছিল জনৈক 'আখতার গুন্ডা।'১৯৭২ সালে সারাদেশের মতো তৎকালীন সরকার মিরপুর ইউনিয়নে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দালাল ও সহযোগীদের বিচারের জন্য একটি 'কলাবরেটর কোর্ট' গঠন করেছিল। ৩ সদস্য বিশিষ্ট সেই আদালতের প্রধান ছিলেন চেয়ারম্যান ফকির শফিরউদ্দিন। তিনি বলেন, মিরপুর মুক্ত হওয়ার পরপরই আখতার গুন্ডাকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় হত্যাযজ্ঞ পরিচালনার শাস্তি হিসেবে ইউনিয়ন পর্যায়ের আদালতে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। জেলা জজ কোর্ট, হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টও এই রায় বহাল রাখে। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের স্থপতি রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটানোর পর তৎকালীন সরকার দালাল আইন প্রত্যাহার করাতে আখতার গুন্ডা জেল থেকে ছাড়া পেয়ে পাকিস্তানে চলে যায়।

ফকির শফিরউদ্দিন তার সাক্ষাৎকারে মিরপুরের বড়ো বড়ো ৭টি বধ্যভূমির সন্ধান দেয়া ছাড়াও জানিয়েছেন, স্বাধীনতার পরপর মিরপুরে পথ চলতে চলতে তাঁরা রাস্তার ধারে অসংখ্য মাথার খুলি ও হাড় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখেছেন। সে সময়ের গ্রামীণ জনপদ মিরপুরের অধিকাংশ কুয়াতেই বাঙালীদের মেরে ফেলে রাখা হয়েছিল। এগুলো খুঁড়লে এখনও অনেক দেহাবশেষ পাওয়া যাবে। স্বাধীনতার পর পর চেয়ারম্যান হিসেবে মিরপুর এলাকাকে তিনি যেরকম দেখেছিলেন ২৮ বছর পর তার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ফকির শফিরউদ্দিন বলেন, 'একাত্তরে গোটা মিরপুরটাই যেন একটা বধ্যভূমি ছিল।' কিন্তু পরবর্তীকালে মিরপুরের অবকাঠামোগত উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে এসব দেহাবশেষ মাটি চাপা পড়ে যায়। ফকির শফিরউদ্দিন জানান, মিরপুরে স্বাধীনতার পর তাঁরা যেই ৭টি বড়ো বড়ো বধ্যভূমি চিহ্নিত করেছিলেন সেগুলো হচ্ছে— শিয়ালবাড়ি, ১০ নম্বর সেকশনের জল্লাদখানা, ১২ নম্বর সেকশনের কালাপানি, আলোকদি, বাংলা কলেজের আমবাগান, ১ নম্বর সেকশনের সারেং বাড়ি ও চিড়িয়াখানার কাছে শিরনির টেক। এরমধ্যে শিয়ালবাড়ি মিরপুরের সবচেয়ে বড় বধ্যভূমি, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে শিয়ালবাড়ি বধ্যভূমিতে তিনি হাজার হাজার দেহাবশেষ দেখেছিলেন। সেসব হাড়ের কোনোটিই ৬ ইঞ্চির বেশ বড় ছিল না। নরঘাতকরা কসাইয়ের মত কুপিয়ে টুকরো টুকরো করে হত্যা করেছিল বাঙালিদের। আর ১০ নম্বর সেকশনের জল্লাদখানায় একটি বিশাল আকৃতির স্যুয়ারেজ রিভার্জার ভর্তি মানুষের দেহ দেখেছিলেন। বাঙালিদের হত্যা করে সেখানে ফেলে দেয়া হয়েছিল।

এছাড়াও মিরপুরে চিড়িয়াখানার কাছে আরও একটি বধ্যভূমির সন্ধান পাওয়া গেছে

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে মিরপুর হাউজিং এস্টেটের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী শহীদউদ্দিন আহমেদের কাছ থেকে। চাকরী জীবনের দীর্ঘ সময় তিনি মিরপুর এলাকায় সরকারের নির্মাণ ও উন্নয়ন কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এ কাজ করতে গিয়ে তিনি চিড়িয়াখানার কাছে রাইনখোলা বধ্যভূমির সন্ধান পেয়েছিলেন। 'ভোরের কাগজ' অবসরপ্রাপ্ত এই সরকারি কর্মকর্তাকে খুঁজে বের করে তাঁর কাছ থেকে এই চাপা পড়ে যাওয়া আরেকটি বধ্যভূমির তথ্য উদ্ধার করে। এছাড়াও শহীদউদ্দিন আহমেদ শিয়ালবাড়ি ও জল্লাদখানা বধ্যভূমির কথা বলেছেন যা উল্লেখ করেছিলেন ফকির শফির উদ্দিনও।

মুসলিম বাজার বধ্যভূমি আবিষ্কারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মিরপুরের আরও অনেক অজানা বধ্যভূমির খবর বেরিয়ে আসতে থাকলে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকেও নতুন নতুন বধ্যভূমির খবর আসতে থাকে। বগুড়া ও লাকসামের দু'টি বড় বড় বধ্যভূমির খবর প্রকাশ করে পত্রিকাগুলো। এর মধ্যে লাকসামের বধ্যভূমিতে প্রায় ১০ হাজার বাঙালিকে হত্যা করা হয়েছিল বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা থেকে জানা যায়। এছাড়াও বধ্যভূমিগুলোতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় সহযোগী রাজাকার, আলবদররা কিভাবে বাঙালীদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে, হত্যা করে ফেলে দিত— সেসব বর্ণনাও বিভিন্ন দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে।

১৯৯৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে দেশজুড়ে সর্বমহলেই 'একাত্তরের বধ্যভূমি' আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়। সরকারি পর্যায়েও এ নিয়ে বিভিন্ন উদ্যোগ ও আয়োজনের কথা আলোচিত হতে থাকে। সরকারের 'বধ্যভূমি চিহ্নিতকরণ জাতীয় কমিটি' দেশের ৬টি বিভাগের ছয়টি বধ্যভূমিতে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়। এছাড়াও মিরপুরে নব আবিষ্কৃত মুসলিম বাজার বধ্যভূমি এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বধ্যভূমিতেও স্মৃতি সৌধ নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছে সরকার।

মুসলিম বাজার বধ্যভূমি আবিষ্কৃত হওয়ার পর ঢাকাসহ সারাদেশে নতুন নতুন বধ্যভূমি খুঁজে বের করার জন্য সর্বমহলে যেমন নতুন করে তাড়নার সৃষ্টি হয়েছে, তার পাশাপাশি একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিটিও ধ্বনিত হচ্ছে বারবার। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সেনা কর্মকর্তাদের এবং তাদের সহযোগী বিহারী ও এদেশীয় রাজাকার, আলবদর, আলশামসদের বিশেষ ট্রাইবুনালে বিচারের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গণদাবি আবারও সবার মুখে মুখে।

১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারি মিরপুর মুক্ত হওয়ার আগের দিন, ৩০ জানুয়ারি মিরপুরে আত্মগোপনকারী পরাজিত পাকিস্তানি সৈন্য ও বিহারীরা পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ চালিয়ে হত্যা করেছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও পুলিশের অনেক সদস্যকে। সেদিন মিরপুরকে অস্ত্রমুক্ত ও ঘাতকদের গ্রেফতার করতে গিয়ে পাকিস্তানি সৈন্য ও বিহারীদের সঙ্গে যুদ্ধ হয় বাংলাদেশের সেনাবাহিনী ও পুলিশের। রক্তক্ষয়ী এ যুদ্ধের পর ৩১ জানুয়ারি মিরপুর স্বাধীন হয়। মিরপুর যুদ্ধের সেই ইতিহাস, দীর্ঘ প্রায় ২৮ বছর ছিল অন্তরালে। কিন্তু মুসলিম বাজার বধ্যভূমি আবিষ্কৃত হলে তারই আশেপাশের এলাকায়

সংঘটিত মিরপুর যুদ্ধের ইতিহাস উদঘাটনে ব্যাপক অনুসন্ধান চালায় পত্রিকাগুলো। মিরপুরের সেই যুদ্ধে সেনা ও পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে একমাত্র সিভিলিয়ন হিসেবে ছিলেন প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার, কথাশিল্পী, সাংবাদিক জহির রায়হান। ৩০ জানুয়ারির যুদ্ধের পর তাঁর কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি।

গত ২৮ বছর ধরে ৩০ জানুয়ারি পালন করা হয় জহির রায়হানের 'অন্তর্ধান দিবস' হিসেবে। মুসলিম বাজার বধ্যভূমিকে কেন্দ্র করে মিরপুর যুদ্ধের ইতিহাস উদঘাটনের জন্য জহির রায়হানেরই এক সন্তান সাংবাদিক অনল রায়হান ব্যাপক অনুসন্ধান চালান। তিনি সাপ্তাহিক ২০০০ পত্রিকায় 'পিতার অস্থির সন্ধানে' শিরোনামে একটি প্রচ্ছদ প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। মিরপুর যুদ্ধ ক্ষেত্রে গিয়ে জহির রায়হানের 'নিখোঁজ' হয়ে যাওয়ার প্রকৃত ঘটনা উদঘাটন করতে গিয়ে অনল রায়হান সেই ঘটনার বেশ কয়েকজন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাক্ষীর কাছ থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করেন। সুনির্দিষ্ট কোন প্রত্যক্ষ সাক্ষীর সন্ধান না পেলেও ঘটনাক্রমের ভিত্তিতে তিনি নিশ্চিত হন— তার বাবা বরেণ্য বুদ্ধিজীবী জহির রায়হান সেই যুদ্ধেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সহযোগী বিহারীদের আকস্মিক গুলিবর্ষণে সেদিন নিহত হয়েছিলেন। কিন্তু দৈনিক ভোরের কাগজ জহির রায়হানকে গুলিবিদ্ধ হয়ে সেই রণক্ষেত্রে পড়ে থাকতে দেখেছেন— এমন একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষীর জবানবন্দি প্রকাশ করলে দীর্ঘ ২৮ বছর পর একটি ঐতিহাসিক রহস্যের অবসান ঘটে। এছাড়াও বেরিয়ে আসে মিরপুর যুদ্ধের অনেক অজানা ইতিহাস।

'৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জহির রায়হান দেশে ফিরে এসে একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের দুষ্কর্মের তদন্ত শুরু করেছিলেন। তিনি বুদ্ধিজীবী হত্যা তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সংগ্রহ করেছিলেন '৭১-এর গণহত্যার অজস্র দলিল। তাঁর এই অনন্যসাধারণ কাজের কারণেই তিনি ঘাতকদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হন। মিরপুর যুদ্ধে সেই সুযোগ নিয়েছে একাত্তরের ঘাতকরা। মিরপুরে সেদিন বিহারীদের সঙ্গে এদেশীয় রাজাকাররা ছাড়াও সাদা পোশাকে ছিল ঘাপটি মেরে থাকা পাকিস্তানি সশস্ত্র সেনারা। পরিকল্পিতভাবে তারা '৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি আকস্মিকভাবে বৃষ্টির মত গুলি চালিয়ে, ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে জহির রায়হানসহ আমাদের মুক্তিযুদ্ধ জয়ী সেনা ও পুলিশ সদস্যদের। ইতিহাসের এই নির্মম অধ্যায় দীর্ঘ ২৮ বছর পর বের হয়ে এসেছে মুসলিম বাজারের বধ্যভূমি আবিষ্কারকে কেন্দ্র করে।

এই ইতিহাস উদঘাটনে আনন্দের চেয়ে বেদনাই বেশি। তারপরও ইতিহাসের অমোঘ সত্য প্রতিদিন উন্মোচিত হচ্ছে। ঘাতকদের কথা জানতে চাইছে নতুন প্রজন্ম। তারা গভীর ঘৃণা প্রকাশ করছে ঘাতকদের প্রতি। একাত্তরের গণহত্যার বিচারের দাবি উঠেছে ঘরে ঘরে।

রাজশাহীর বধ্যভূমি

একশটি গণকবর থেকে দশ হাজার মানুষের কঙ্কাল উদ্ধার করা হয়

ড. সুকুমার বিশ্বাস, স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রের অন্যতম গবেষক। বাংলা একাডেমীতে কর্মরত অবস্থায় ১৯৭২ থেকে '৭৪ সাল পর্যন্ত তিনি সারা দেশে ঘুরেছেন এবং একাত্তরের বধ্যভূমি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। প্রত্যক্ষদর্শী এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁর সংগৃহীত বধ্যভূমির তথ্য-উপাত্ত ভিত্তিক কিছু প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রে। একাত্তরের বধ্যভূমি সম্পর্কে তাঁর প্রকাশিতব্য গ্রন্থ থেকে দু'টি জেলার বধ্যভূমির বিবরণ এখানে সংকলিত হল।

পাকুরিয়া গ্রাম। রাজশাহী সদর থেকে ৩০ মাইল উত্তরে বর্তমান নওগাঁ জেলার মান্দা থানার অন্তর্গত এই পাকুরিয়া গ্রাম। '৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের সময় এই গ্রামেই সংঘটিত হয় বর্বরতম হত্যাযজ্ঞ। পাকুরিয়া হাইস্কুল মাঠকে বেছে নেয়া হয়েছিল বধ্যভূমি হিসেবে। বাঙালির লাশ আর রক্তে প্লাবিত হয়েছিল পাকুরিয়া হাইস্কুল মাঠ।

সেদিন ছিল ২৮ আগস্ট '৭১। ভোর হয়-হয়, এমন সময় পাকিস্তানি সেনা ও তাদের সহযাত্রীরা পাকুরিয়া গ্রামে এসে হাজির হল। ঘোষণা দেয়া হল পাকুরিয়া হাইস্কুল মাঠে শান্তি কমিটির সভা হবে— 'সবকো জানে পড়েগা'।

গ্রামের মানুষ এজন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না। পালাবার পথ রুদ্ধ। তাই পাকিস্তানিদের কিল ঘুষি লাথি খেয়ে শেষ পর্যন্ত পাকুরিয়া হাইস্কুল মাঠে ১২৮ জন গ্রামবাসী এসে হাজির হল। মাঠের মাঝখানে এই ১২৮ জনকে বসানো হল। তারপর শান্তি কমিটির সভার নামে পাকিস্তানিদের মেশিনগানগুলো গর্জে উঠল। আর্তচিৎকার, কান্না, আহাজারি— এরপর সব শেষ। সেসময় বৃহত্তর নওগাঁ রাজশাহী জেলার একটি মহকুমা ছিল। গণকবর আর বধ্যভূমিতে সয়লাব হয়ে যায় নওগাঁ শহর। পূর্বদেশ প্রতিনিধি ১৯৭২ সালেই এ বিষয়ে বলেছেন— যে কেউ নওগাঁ শহরে ঢুকলেই দেখতে পাবেন শহরের মধ্যবর্তী যমুনা নদীর ওপর নির্মিত পুরনো অথচ অতি সুন্দর সেতুটির পাশেই বিধ্বস্ত তাজ সিনেমা হলটি। এর দক্ষিণে দেখা যাবে অসংখ্য বাঙালির বিকৃত মৃতদেহ স্তূপীকৃত অবস্থায় পড়ে আছে। গণহত্যার এতবড় নিদর্শন দক্ষিণ ভিয়েতনামের

মাইলাই গ্রামেও ঘটেনি। এরই আর মাত্র সামান্য দূরে একটি পুরনো পাকা কূপ। কূপটির তিন হাত নিচ থেকে শেষ পর্যন্ত কেবল গলিত ও বিকৃত লাশ আর লাশই দেখা যাচ্ছে।

আর একটু এগিয়ে গেলেই দেখা যাবে দু'টি বড় ঢেউটিনের ঘর। ঘরের ভিতর ঝুলে আছে বহু দড়ি। নিচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে জুতো, জামা, প্যান্ট ও অন্যান্য পোশাক পরিচ্ছদ। এক নজরেই মনে হবে এগুলো এক বা একাধিক লোকের নয়।

এবার তাজ সিনেমার নিকটবর্তী পুরনো পশু হাসপাতালটি অতিক্রম করে উত্তর দিকে কিছুদূর গেলেই দেখা যাবে বাঁয়ে ছোট একটি মসজিদ। তার পাশেই রয়েছে একটি দালানবাড়ি। বসবাস করত বিহারী কামিজ ব্যবসায়ী, নাম ইদ্রিস। প্রতি বছর খাজা বাবার নামে তিনদিন ধরে এ বাড়িতে উৎসব চলত। কিন্তু তার বাসার ভিতর যেতেই যে কেউ চমকে উঠবেন। দেখতে পাবেন দু'ঘরের ভেতর নির্মম হত্যার প্রমাণ চিহ্ন। একটি ঘরে অনেক দড়ি ঝুলে আছে। আর অপরটিতে রয়েছে অসংখ্য বাঙালির রক্তের ছাপ। ... বিহারী ব্যবসায়ী খান সেনাদের সহযোগিতায় যেসব বাঙালিকে ধরে এনে জবাই করত তাদের রক্তে তার অপবিত্র হস্ত রঞ্জিত করে তা দিয়ে তার ঘরের দরজা জানালা রাঙিয়ে নিত। যেন আলতা দিয়ে সাজানো হয়েছে। এ নারকীয় দৃশ্য চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। ইদ্রিসের বাড়ির ভিতর কাঁচা কূপটি মাটি দিয়ে ভরাট করা হয়েছে। এখনো সে কূপের ভিতরে দড়ি দেখা যায়। কূপটিতে বহু অচেনা বাঙালির লাশ চাপা রয়েছে। আর এর পাশেই দেখা যায় প্রচুর রক্তের দাগ।

আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন সম্পাদিত 'মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস' গ্রন্থে নওগাঁর বধ্যভূমি বিষয়ে বলা হয়েছে—॰ ডিসেম্বরের ১৮ তারিখে এই বধ্যভূমিটি নওগাঁবাসী আবিষ্কার করেছিল, সেখানে কোন পুরুষের লাশ পাওয়া যায়নি। এখানে শুধু ৪ বছর থেকে ৩০/৩৫ বছরের অগণিত মহিলার লাশ পাওয়া গেছে। পার নওগাঁর পাঠশালা স্কুলই ছিল এই বধ্যভূমি। এখানে একটা বড়সড় পানির কুয়ো ছিল। যুবতী বা মহিলাদেরকে ধরে এনে এই কুয়োসংলগ্ন একটা ঘরে প্রথমে পর্যায়ক্রমে তাদের কয়েকদিন ধরে পাকবাহিনীর সদস্যরা ধর্ষণ করত। তারপর তাদেরকে জবাই করে অথবা জীবন্ত অবস্থায় হাত-পা বেঁধে এই কুয়োর ভেতরে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হত। ॰ ঠিক এই রকমেরই আরেকটি কুয়ো নওগাঁর পুরনো জনতা ব্যাংকের পশ্চিম পাশে আবিষ্কার করা হয়েছিল। এছাড়াও আরো কয়েকটি বধ্যভূমি পার নওগাঁয় আবিষ্কার করা হয়েছে। এসবের মধ্যে মরদুলা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের পূর্বদিকে রউফ মিয়ার বাগানে ওপার নওগাঁর ডাক্তার হাসান আলীর বাড়ির পুব-দক্ষিণ কোণে অবস্থিত পরিত্যক্ত জমিতে অজস্র লাশ পাওয়া গিয়েছিল। এখন অবশ্য ওইসব জায়গায় গড়ে উঠেছে জনবসতি। নওগাঁর দোগাছি গ্রামের দক্ষিণপাড়ায় ছিল বধ্যভূমি। পিরোজপুর, খিদিরপুর, চণ্ডিপুর, রাণীনগর থানার ত্রিমোহনী, নওগাঁ থানার বালিরঘাট, শিমুলিয়া, ইলিশবাড়ি এবং সুলতানপুর থেকে পাকসেনারা অসংখ্য বাঙালিকে ধরে এনে দোগাছির দক্ষিণপাড়ায় নৃশংসভাবে হত্যা করে। নওগাঁ ও বলিহার ইউনিয়নেও ছিল বধ্যভূমি।

রাজশাহীর চাঁপাইনবাবগঞ্জেও রয়েছে অনেক গণকবর, বধ্যভূমি। বর্তমানে এই

জেলার রেহাইচরে পাওয়া গেছে গণকবরের সন্ধান। শিবগঞ্জ থানার সোনা মসজিদ সংলগ্ন এলাকাতে রয়েছে গণকবর। এছাড়া নবাবগঞ্জ ইপিআর ক্যাম্প, শ্মশানঘাট, রেহাইচর, কাশমপুর, রহনপুর হাইস্কুলের পেছনে পুনর্ভবা নদীর ধারে, রহনপুর বোয়ালিয়া গ্রাম, কালুপুরে, দোরশিয়া গ্রাম এবং গোমস্তাপুর বাজারে ছিল বধ্যভূমি, গণকবর। তৎকালীন ট্রেজারি, বর্তমানে এজি অফিসকে করা হয়েছিল নির্যাতন কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে অত্যাচারের পর বহু মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। রাজশাহী মহানগরীর প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে একটি বধ্যভূমি। এই বধ্যভূমি পাকবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগী আলবদর-রাজাকরদের সৃষ্ট। বোয়ালিয়া থানার ২৫ গজ দূরে ঠিকাদার মুসলিম শাহ'র দ্বিতল বাড়ির পেছনে রয়েছে এই বধ্যভূমি। মুক্তিযুদ্ধের সময় মুসলিম শাহ সপরিবারে ভারতে চলে গিয়েছিলেন। এই সুযোগে তার বিরাট বাড়িটি আলবদররা দখলে নিয়ে সেখানে ক্যাম্প স্থাপন করে। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে রাজশাহী ও তার আশেপাশের এলাকা থেকে অসংখ্য নারী-পুরুষকে ধরে এনে এই ক্যাম্পে নির্যাতন চালায় আলবদররা। নির্যাতন-ধর্ষণের পর ক্যাম্পের পেছনে দেয়াল ঘেরা জঙ্গলে হত্যা করে মাটিচাপা দিয়ে রাখা হত তাদের।

বিজয়ের পর ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে এই বধ্যভূমি থেকে উদ্ধার করা হয় কয়েকশ' নারী-পুরুষের হাড়-কংকাল। রাজশাহীর বোয়ালিয়া, কাটাসুর, শিয়ালবাড়ি এবং গোদনাইলের পাশ দিয়ে সমান্তরালভাবে সংযোজিত হয়েছে এই বোয়ালিয়া। এই স্থানটিতে আরো একটি বধ্যভূমির সন্ধান মিলেছে। এই বধ্যভূমি-গণকবরেই পাওয়া যায় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এ জেড শওকত রেজার লাশ। শওকত রেজার নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি দৈনিক বাংলায় একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে বলা হয় ঃ

'বিগত ৯ই ডিসেম্বর ফ্যাসিস্ট জামাতে ইসলামীর কুখ্যাত আলবদরের ১৪/১৫ জন সশস্ত্র সদস্য এবং রাজশাহী টাউন থানার ওসি অতর্কিতে ছাত্রাবাসে ঢুকে শওকত রেজা ও অন্য চারজনকে চোখ বেঁধে নিয়ে যায়। এদের মধ্যে একজন পালিয়ে এসে পরে অন্য দু'জন আলবদরকে সনাক্ত করে। ওসির নাম শামসুল আলম। আলবদরের দু'জন সদস্য হচ্ছে আবদুল হাই ফারুকী, সে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। অপর জন মাযহারুল ইসলাম, পিতা মোঃ আনিছুর রহমান, সে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। চোখ বেঁধে রেজাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হয় তা প্রথমে কেউ অনুমান করতে পারে না। তবে তিন/চারদিন তারা একটি অন্ধকার কক্ষে আবদ্ধ থাকে। রেজার সহপাঠী সাহাবউদ্দিন আহমদ পালিয়ে আসতে সমর্থ হয়।'

পাকসেনারা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ শামসুজ্জোহা হলকে প্রায় গোটা ৯ মাস ক্যান্টনমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করেছিল। এই হলের পেছনে দীর্ঘ ১ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে ছিল বধ্যভূমি। এই বধ্যভূমিতে হাজার হাজার নারী-পুরুষকে পাকসেনা ও তাদের দোসররা নিয়ে হত্যা করত। এই ছাত্রাবাস থেকে আধ মাইল দূরে পূর্বকোণে ১৯৭২ সালের ২৩শে এপ্রিল আবিষ্কৃত হয় একটি গণকবর। এ সময় এই এলাকাটিতে ইট কাটার কাজ শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু গণকবর আছে এই সংবাদে মুক্তিযোদ্ধা

নুরুল ইসলাম এবং কন্টাক্টর জেবের মিয়ার নেতৃত্বে সমাধি এলাকাটি খনন করা হয়। খননের ফলে বেরিয়ে আসে মাথার খুলি, নরকংকাল। এই কবর থেকেই ৫টি ঘড়ি, ৫টি কলম, দুটি টুপি ১ ও ১০ টাকার নোট মিলিয়ে মোট ৩শ' টাকা, একটি চাবির রিং, দুটি সাইকেলের চাবি, দুটি কানের দুল, ৩টি সিগারেট লাইটার, একটি মানিব্যাগ, একটি কাজলের টিউব, ওড়না, পাথর বসানো আংটি, চিরুনি, মহিলাদের কার্ডিগান, জুতা ইত্যাদি উদ্ধার করা হয়।

পার্শ্ববর্তী মোহনপুর গ্রামের জনগণ জানিয়েছিলেন— '৭১-এর ৫ ও ৬ই মে হানাদাররা ট্রাক ও জীপে করে এসব হতভাগ্য নারী পুরুষকে এখানে নিয়ে এসে হত্যা করে। প্রতিদিনই অগণিত নারী-পুরুষকে হাত বাঁধা অবস্থায় জোহা হলের এই বধ্যভূমিতে নিয়ে হত্যা করা হত। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেলওয়ে স্টেশনের দক্ষিণ পাশে নরকংকাল ভর্তি বহু গর্তের সন্ধান পাওয়া গেছে। দৈনিক আজাদ প্রতিনিধি ও রাজশাহী সাংবাদিক ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারী মোহাম্মদ আবু সাঈদের লাশও এখানকার একটি গর্ত থেকে উদ্ধার করা হয়। সাংবাদিক মোহাম্মদ আবু সাঈদসহ ২৮ জনকে পাকিস্তানি দালালরা ধরে নিয়ে যায়। সাঈদকে প্রথমে সার্কিট হাউসে এবং সেখান থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের বাড়িতে নিয়ে প্রায় এক সপ্তাহ আটক রাখা হয়। এসময় তার ওপর অমানুষিক দৈহিক নির্যাতন চালানো হয়। এরপর ৫ই জুলাই অপর ১৫ জনের সঙ্গে সাঈদকেও জোহা হলে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের সামনেই দিনাজপুরের জনৈক রেলওয়ে কর্মচারীকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। সাঈদসহ ১৫ জনের এই বন্দী দলটিকে বাধ্য করা হয় মৃতদেহটি রেলওয়ে স্টেশনের দিকে বয়ে নিয়ে যেতে। স্টেশনের পাশেই একটি বাবলা গাছের নিচে তাদের সামনেই গর্ত করা হল। সকলকে জোর করে গর্তের মধ্যে ফেলে দিয়ে বেয়োনেট দিয়ে খোঁচানো শুরু হল এবং একই সাথে তাদের ওপর মাটিচাপা দেয়া শুরু হয়। আর এভাবেই অর্ধমৃত মানুষগুলোকে মাটিচাপা দিয়ে হত্যা করা হয়। কিন্তু না সবাই মরেনি। এই গর্ত থেকে পিওন আবদুল কাদের এবং শ্যামপুরের রূপভান মিয়া পরস্পরের সাহায্যে এই মৃত্যুকূপ থেকে উঠে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। স্বাধীনতার পর এরাই এই লোমহর্ষক করুণ কাহিনীর কথা জানিয়েছিলেন।

মলয় ভৌমিক লিখেছেন, 'জোহা হল ক্যাম্পে ধরে এনে নির্যাতনের পর যাদের হত্যা করা হয় তাদের কোনরকমে মাটি চাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল হর্টিকালচারের উত্তরের বধ্যভূমিতে। এখানে মাটি খোঁড়ার পর উঠে আসে নাম না জানা প্রায় এক সহস্র শহীদের হাড়-কংকাল।'

বস্তুত ১৪ই এপ্রিলের মধ্যে রাজশাহী শহর পাকিস্তানিদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। পাকিস্তানিরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের সুদৃঢ় ঘাঁটি গড়ে তোলে। পাকসেনারা ১৩ই এপ্রিল রাজশাহীতে প্রবেশ করার পথে সড়কের দু'ধারে প্রায় সমস্ত বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। শত শত লোককে তারা হত্যা করে। তারা কাটাখালী, মাসকাটা দীঘি, চৌদ্দপাই, শ্যামপুর, ডাশমারী, তালাইমারী, রানীনগর এবং কাজলার বাড়িঘর জ্বালিয়ে ধ্বংস করে, নির্যাতন চালিয়ে সমগ্র এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে।

পাকসেনারা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪ এপ্রিল থেকে পাকাপাকিভাবে ঘাঁটি গড়ে তোলে। এখান থেকেই তারা হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করে। পাকিস্তানিরা প্রথমে জোহা হল, আবদুল লতিফ হল, জিন্নাহ হল, কলাভবন, রসায়ন বিদ্যা ভবন, বিজ্ঞান বিভাগ, এক্সপেরিমেন্টাল স্কুল ভবন এবং বেশ কিছু স্টাফ কোয়ার্টারে শিবির স্থাপন করেছিল। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে তারা জোহা হলকেই মূল ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে। পাকসেনারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় ভবনসমূহ, ছাত্রাবাস, শিক্ষক ও কর্মচারীদের বাসভবনে ব্যাপকভাবে লুটতরাজ চালায়। এমনকি বিজ্ঞান গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি ও গ্রন্থাগারের বইপত্র পর্যন্ত তারা ধ্বংস করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হাবিব ব্যাংক শাখার যাবতীয় অর্থও তারা লুট করে। পাকবাহিনী পরিসংখ্যান বিভাগের কাজী সালেহ, গণিত শাস্ত্রের প্রভাষক মুজিবুর রহমান, ফলিত পদার্থ বিজ্ঞানের ডঃ রকীব এবং বাংলা বিভাগের ডঃ আবু হেনা মোস্তফা কামালকে ধরে নিয়ে গিয়ে দিনের পর দিন অমানুষিক নির্যাতন চালায়। অসংখ্য নারী তাদের লাঞ্ছনার শিকার হয়। এমনকি একজন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীর ১২ বছরের কিশোরী কন্যাও পাক হায়েনাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। এসব ধ্বংসযজ্ঞে তৎকালীন উপাচার্য সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন পাকিস্তানিদের সঙ্গে সরাসরি সহযোগিতা করেছিলেন। উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধানদের একটা তালিকাও পাকসেনাদের হাতে তুলে দেন। এই তালিকায় নানা ধরনের শাস্তি প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছিল। এ সময় মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ডঃ মতিয়ুর রহমান, দর্শন বিভাগের প্রধান ডঃ জামিল, ভূগোল বিভাগের রিডার ডঃ শামসি এবং আইন বিভাগের ডীন শাহ জিল্লুর রহমান বিপুল পরিমাণ মালামাল লুট করে এক পর্যায়ে তারা পাকিস্তানে পালিয়ে যায়।

সুখরঞ্জন সমাদ্দার ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষার সহকারী অধ্যাপক। সাদাসিধে সরল সুখরঞ্জন সমাদ্দার কারো সাতেপাঁচে থাকতেন না। কোন রাজনীতির সঙ্গেও তিনি জড়িত ছিলেন না। নির্ভেজাল নির্বিরোধী একজন শিক্ষক হিসেবেই তিনি ক্যাম্পাসে পরিচিত ছিলেন। ১৩ই এপ্রিল পাকসেনারা ক্যাম্পাসে প্রবেশ করলে তিনি ঘর ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করেননি। বেগে এসে ঢোকে ৫/৬ জন পাকসেনা। সন্ধান চালায় ইপিআর বাহিনীর। সেনারা ইপিআর না পেয়ে তারা যখন চলে যেতে উদ্যত ঠিক তখনই মনোবিজ্ঞান বিভাগের অবাঙালি অধ্যাপক ডঃ মতিউর রহমান সমাদ্দার বাবুকে দেখিয়ে বললেন, 'ইয়ে তো হিন্দু হ্যায়।' এ কথাই যথেষ্ট ছিল। সাথে সাথে পাকসেনারা তাকে জীপে তুলে নেয়। সেই শেষ যাওয়া। এ বিষয়ে 'পূর্বদেশ' প্রতিনিধি ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন : '... ১৪ই এপ্রিল দুপুরেই শ্রী সুখরঞ্জন সমাদ্দারকে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখের গ্রাম কাজলার একটি পুকুর পাড়ে। এপ্রিল মাসের ১৫ তারিখে পুকুরের ধারে কাজলার জনগণ সমাদ্দার বাবুর দেহটিকে মর্যাদার সাথে সমাহিত করেছিল। কাজলার আবদুল হাকিম, হারান মণ্ডল, জয়েনউদ্দিন, আসগর আলী, কানুবসন্ত, ফজলু নিজেদের জীবনের মায়া ত্যাগ করে সেদিন ঝুঁকি নিয়েছিল মৃত অধ্যাপকের লাশটি সমাহিত করবার। এ বছরের (১৯৭২) ২৫শে ফেব্রুয়ারি সেই

লাশের দেহাবশেষ আবার সমাধিস্থ করা হয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে।'

রাজশাহীর কাজলার ছেলে জয়নুদ্দিন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়াশোনা করেছেন। বর্তমানে তিনি রংপুর ক্যাডেট কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি ঢাকা এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেছিলাম। তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন কাজলার পুকুর পাড়ের একটি গর্ত থেকেই পাওয়া যায় সমাদ্দার বাবুর লাশ। তিনি সে সময় লাশ দেখেছিলেন। জয়নুদ্দীন সেদিন কাজলা-ঘোষপাড়ার গণকবর-বধ্যভূমির হৃদয়বিদারক চিত্র তুলে ধরেছিলেন। এখানকার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছিল মানুষের কংকাল, মাথার খুলি। বিভিন্ন স্থান থেকে বাঙালিদের ধরে এনে কাজলা-ঘোষপাড়া এলাকায় হত্যা করা হত। আর এ কাজটি নিখুঁতভাবেই করেছিল আলবদর-রাজাকাররা।

সংবাদ প্রতিনিধি মলয় ভৌমিক আমাকে জানিয়েছেন— রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ সীমানায় রাজশাহী-নাটোর সড়কের পাশে কাজলায় আবিষ্কৃত হয় আর একটি গণকবর। এখানে পাওয়া যায় শতাধিক শহীদের মাথার খুলি, হাড়, কংকাল। রাজশাহীর কোর্ট এলাকার গৃহবধূ নয়নবানু কংকালের হাতে বাঁধা একটি ঘড়ি দেখে সনাক্ত করেন তার নিখোঁজ স্বামীকে। শহীদের রক্তে সিক্ত এই গণকবরটি আজ অবহেলিত উপেক্ষিত। কোন পক্ষ থেকেই কোন রকমের সংরক্ষণের ব্যবস্থা আজো হয়নি। রাজশাহীর পদ্মার চরে বাবলা বনে পাওয়া গেছে আর একটি গণকবরের সন্ধান। এই গণকবরেই পাওয়া গেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক মীর আবদুল কাইয়ুমের লাশ।

পদ্মা তীরের বধ্যভূমি-গণকবর প্রসঙ্গে মলয় ভৌমিক আমাকে জানিয়েছেন— রাজশাহী মহানগর বোয়ালিয়া ক্লাবের পাশে পদ্মা তীরের বাবলা বনে রয়েছে একটি গণকবর। অবহেলিত এই স্থানটি বাঁশের বেত দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকবাহিনী রাজশাহীর বিভিন্ন স্থান থেকে লোকজন ধরে এনে পদ্মা তীরের এই বাবলা বনে হত্যা করেছে। এখানে যাদের হত্যা করে মাটি চাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল, তাদের বেশির ভাগই ছিলেন রাজশাহীর বুদ্ধিজীবী। অনেক লাশ মাটি চাপা না দিয়ে পদ্মার জলে ভাসিয়েও দেয়া হয়। ডিসেম্বরের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহেও বেশ কয়েকজন বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয় এই বাবলা বনে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমানও হারিয়ে গেলেন। ১৫ই এপ্রিল বিকেল ৪টায় একদল পাকসেনা তাঁকে ধরে নিয়ে যায় ব্রিগেডিয়ার আসলাম এবং কর্ণেল তাজের অতিথি ভবনের ছাদে। এরপর থেকে তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের দোসরদের নিষ্ঠুরতা-বর্বরতা-ধ্বংস-ক্ষয়ক্ষতি, হত্যাযজ্ঞ বিষয়ে ১৯৭২ সালে রাজশাহীতে ৭ জন শিক্ষক ও ৫০ জন ছাত্র সমন্বয়ে গঠিত দল 'চল গ্রাম ঘুরে' কর্মসূচীর মাধ্যমে সপ্তাহব্যাপী এক জরিপ চালান। সে সময় রাজশাহী জেলার পঁচিশটি গ্রামের প্রায় প্রতি ঘরে জরিপ চালানো হয়েছিল। শেষদিনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ডঃ খান সারওয়ার মুরশিদ, বেগম নূরজাহান মুরশিদ, স্থানীয় এমসিএ এবং রাজশাহী অঞ্চলের কমান্ডার মেজর গিয়াস

উদ্দিন চৌধুরী বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। তারা বেশ কয়েকটি স্থানে যুদ্ধবিধ্বস্ত জনগণের উদ্দেশ্যে বক্তব্যও রেখেছিলেন।

এই জরিপ কাজ চালানোর সময়ই গগণবাড়িয়া ও জগীশ্বর গ্রামে আবিষ্কৃত হয় গণকবর আর বধ্যভূমি। গণকবর দু'টির মধ্যে গগনবাড়িয়ার গণকবর ছিল বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। এখানকার বধ্যভূমি থেকে অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়া এক প্রত্যক্ষদর্শী জেলে সে সময়ের হত্যাযজ্ঞের যে বিবরণ দিয়েছেন তা যেমন ভয়াবহ তেমনি বেদনাদায়ক। বেঁচে যাওয়া প্রত্যক্ষদর্শী এই মৎস্যজীবী জানিয়েছেন— পবিত্র রমজান মাসের প্রথম সপ্তাহ হবে। দফায় দফায় ধরে আনা হল গগনবাড়িয়ার মানুষদের। হয়ত অন্য গ্রামেরও মানুষ ছিল। প্রায় ৫০০ লোককে দাঁড় করানো হল সারিবদ্ধভাবে। রাত ছিল আঁধার। হঠাৎ করেই আমাদের ওপর চালানো হল গুলি। প্রায় পাঁচশ লোকের আর্তচিৎকারে গগনবাড়িয়া প্রকম্পিত হল! মৃত্যু যন্ত্রণায় তখনো কেউ কেউ কাতরাচ্ছিল। কিন্তু রেহাই পেল না তারা। কিছুক্ষণের মধ্যেই সব নিস্তব্ধ নিথর হয়ে গেল। প্রাণে বেঁচে যাওয়া জেলে জানিয়েছেন, পাক সেনারা চলে যাবার অনেক পরে আমার মনে হল আমি বেঁচে আছি। তারপর আস্তে আস্তে রক্তের সাগর আর লাশের পাহাড় পেরিয়ে ছুটলাম যেদিকে দু'চোখ যায়। আমি বেঁচে গেলাম।

'৭১-এর মে মাস। পাক হানাদার বাহিনী জগীশ্বর গ্রামে এসে ফরমান জারি করল শান্তি কমিটি গঠন করা হবে— সবাইকে আসতে হবে। একে একে ২৭ জন গ্রামবাসী হাজির হল। আর কাউকে না পেয়ে পাক সেনারা ২৭ জনকেই সারিবদ্ধভাবে পিছনে হাত রেখে দাঁড়াবার হুকুম দিল। সবাই সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াল। আর তারপরই ঝাঁক ঝাঁক গুলি এসে পড়ল তাদের ওপর। মাত্র কিছুক্ষণ। তারপরই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ নামক প্রাণী নিষ্প্রাণ হয়ে গেল সবাই। এখানেই শেষ নয়— গ্রামে চালানো হল অকথ্য নির্যাতন-ধ্বংস। ৫৫ জন মহিলা নির্যাতিতা হলেন পাক দস্যুদের হাতে।

রাজশাহী উপশহরের সপুরা কলোনী। এই এলাকায় ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মিনি ক্যান্টনমেন্ট। তবে বেশ সুরক্ষিত। রাজশাহী সদরের এসডিও, পবা থানার আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক দল ও অন্যরা মিলে গোটা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় খনন কাজ চালিয়ে একশ'টি গণকবরের সন্ধান পান। এই একশ'টি গণকবর থেকে দশ হাজার মানুষের কঙ্কাল উদ্ধার করা হয়। এই ভয়াবহ দৃশ্যে গোটা এলাকায় এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সেদিন এই সংবাদে অশ্রুসজল নয়নে মানুষের ঢল নেমেছিল— কাফেলা ছুটেছিল গণকবরগুলোর দিকে।

বৃহত্তর রাজশাহী জেলার নাটোরের লালপুর থানায় অবস্থিত গোপালপুর উত্তরবঙ্গ চিনিকল চত্বরে 'শহীদ সাগর' নামের যে পুকুরটি রয়েছে— স্বাধীনতার আগে সে পুকুরটির নাম ছিল 'গোপাল সাগর।' ১৯৭১ সালের ৫ই মে রক্তের অক্ষরে লেখা একটি নাম। এই দিনে ওই পুকুরের পাড়ে সংঘটিত হয় এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড। উত্তরবঙ্গ চিনিকলের জেনারেল ম্যানেজার আনোয়ারুল আজিমসহ চিনিকলের ৫০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর একটি দলকে এই পুকুরের পাড়ে এক লাইনে দাঁড় করিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী গুলি চালায়। এই ঘটনায় আনোয়ারুল আজিমসহ চিনিকলের ৪৬ জন

কর্মকর্তা-কর্মচারী শহীদ হন। পুকুরের পাড়েই শহীদের লাশ মাটিচাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল। পাকসেনারা '৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বরের মধ্যে আরো বহু মানুষকে এই পুকুরের পাড়েই গুলি করে হত্যা করে। মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে পুকুরটি ছিল বধ্যভূমি। স্বাধীনতার পরে এই পুকুরের ভেতর এবং পুকুর পাড় থেকে অসংখ্য শহীদের কংকাল উদ্ধার করা হয়। পুকুরটির অর্থাৎ 'গোপাল সাগরে'র নামকরণ করা হয় 'শহীদ সাগর।'

মিসেস আজিম জানিয়েছেন— অবাঙালি দালাল সহকারী আখ সংগ্রহকারী অফিসার মাসাদ্দি, সহকারী কৃষি কেমিস্ট জামিল সিদ্দিকী, ফোরম্যান হাজী আসগর আলী, সহকারী প্রকৌশলী আনসারী ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা প্রায় আট মাস ধরে গোটা এলাকায় অত্যাচার চালিয়েছে। বাড়িঘর লুটও করেছে দিনের পর দিন। নারী নির্যাতন ছিল নিত্যদিনের ঘটনা।

পাকিস্তানিরা পুকুরপাড়ে হত্যাযজ্ঞ চালাবার পর মিল এলাকা ছেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের অবাঙালি দালালরা নিহতদের আত্মীয়স্বজনকে মৃতদেহের কাছে আসতে দেয়নি। বেশ কিছু দিন এসব লাশ পড়েছিল। তারপর যখন মৃতদেহগুলো পচে দুর্গন্ধ ছড়ায় তখনই এসব লাশ পুকুরপাড়ে গর্ত করে মাটি চাপা দেয়া হয়। অবাঙালিরা লাশ হাতড়িয়ে কারো হাত থেকে ঘড়ি, কারো বা আংটি, কলম অথবা টাকা পয়সা ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

খুলনার দুটি বধ্যভূমি

বাঙালিদের হত্যা করার পর দেহ ভাসিয়ে দেওয়া হত নদীর স্রোতে

খুলনা জেলার বধ্যভূমিতে গুলি করে, জবাই করে পাকিস্তানি সেনারা একাত্তরে হত্যা করেছিল বাঙালিদের। হত্যা করার পূর্বে পা উপরে মাথা নিচে দিয়ে ঝুলিয়ে রেখে তাদের ওপর চালানো হত অমানুষিক নির্যাতন। বিভিন্ন নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া লাশের বহরে লাল হয়ে গিয়েছিল পানির রং। বধ্যভূমিতে পড়ে থাকা অনেক বাঙালির দেহ পরিণত হয়েছিল শিয়াল-কুকুরের খাবারে। খুলনায় একাত্তরের কয়েকটি বধ্যভূমির ওপর প্রতিবেদন তৈরি করতে গিয়ে বাঙালিদের উপর পাকিস্তানিদের পরিচালিত এই নারকীয় তাণ্ডবের বর্ণনা করেছেন সাংবাদিক গৌরাঙ্গ নন্দী। সম্প্রতি তিনি বধ্যভূমিগুলো পরিদর্শনকালে এসব ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে এবং ১৯৭২ সালের সংবাদপত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে এ প্রতিবেদন তৈরি করেছেন।

গল্লামারী নদী। খুলনা শহরের তিন কিলোমিটার দূরের দক্ষিণ-পশ্চিমকোণ দিয়ে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর বয়ে চলেছে। আজ এই নদীটির ওপর ব্রীজ। ব্রীজের ওপারে খুলনা-সাতক্ষীরা রোডের ডান পাশে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়; বাম পাশে স্মৃতিসৌধ। শহীদ স্মৃতিসৌধ। হাজার সন্তানের শহীদী আত্মত্যাগকে ধরে রাখতে এই স্মৃতির মিনার।

১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধকালে খুলনা শহরে এখনকার মতো ঘন জনবসতি ছিল না। ছিল না গল্লামারী নদীর ওপর ব্রীজ। ছিল না খুলনা-সাতক্ষীরা রোড। শহর থেকে অদূরবর্তী এই গল্লামারী জায়গাটি ছিল বেশ নির্জন। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসনিক ভবনটি ছিল তখন একতলা। এই ভবন থেকে বেতার কার্যক্রম সম্প্রচার করা হত। বেতার কেন্দ্র দখলের নামে শুরুতেই পাকিস্তানি সৈন্যরা এ ভবনটি দখল করে নেয়। ভবনের অবস্থান ও আশে পাশের নির্জন এলাকা হয়ে ওঠে বধ্যভূমি। ধর্ম-লিঙ্গ-বয়স নির্বিশেষে বাঙালিদের ধরে এনে এখানেই গুলি করে, বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে, জবাই করে হত্যা করা হত। শেষে নিথর দেহ ভাসিয়ে দেয়া হত গল্লামারীর স্রোতে।

১৯৭২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি এ প্রসঙ্গে দৈনিক বাংলায় (অধুনালুপ্ত) লেখা হয়েছে— সারাদিন ধরে শহর ও গ্রাম থেকে বাঙালিদের ধরে এনে হেলিপোর্ট ও ইউ এফ ডি ক্লাবে জমা করা হত। তারপর মধ্যরাত হলেই সেই সব হতভাগ্য নিরস্ত্র

বাঙালিদের পেছনে হাত বেঁধে বেতার কেন্দ্রের সামনে দাঁড় করিয়ে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দ্বারা ব্রাশ করা হত। রক্তাপুত দেহে লুটিয়ে পড়ত হতভাগ্যরা। হত্যার আগে ট্রাক ভরে যখন সেইসব নিরুপায় মানুষদের নিয়ে যাওয়া হত তখন তাদের আর্তনাদ রাস্তার আশ-পাশের মানুষ শুনত। কিন্তু কারও কিছুই করার ছিল না। কারণ বাইরে কারফিউ। সেই আর্তনাদ সইতে না পেরে একদিন শেরে বাংলা রোডের এক ব্যক্তি জানালা খুলে মুখ বাড়িয়েছিল মাত্র। ব্যস, অমনি তাকে লক্ষ্য করে হানাদার বাহিনী গুলি ছুড়ল আর বুলেটবিদ্ধ হয়ে সে লুটিয়ে পড়ল।

হানাদার বাহিনী প্রতি রাতে কম করেও শতাধিক ব্যক্তিকে হত্যা করত। দিনের বেলায় তাদের লাশ জোয়ারের পানিতে ভেসে আসত। কিন্তু কারও সাহস হত না তাদের দাফন করার। অনেকে তাদের আপন জনের লাশ সনাক্ত করলেও সেখান থেকে তাকে উঠিয়ে নিতে পারেনি। কেননা এ খবর জানাজানি হলে তারও নিশ্চিত মৃত্যু।

কিছুদিন পর জল্লাদরা ঠিক করে, গুলি করে আর হত্যা নয়। অন্য পন্থা। শুরু হল জবাই করে হত্যা। তবে সংখ্যা সেই শতাধিক। আগে এসব হত্যাকাণ্ডগুলো রাতে ঘটানো হত। পরে ঘটে আরও নিষ্ঠুর ঘটনা। রাতের বদলে দিনেই হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। সকলের সামনে দিয়ে পিঠমোড়া দেয়া ট্রাকভর্তি বাঙালি সন্তানদের নিয়ে যাওয়া হত। আর ঘন্টা খানেক পরে শূন্য ট্রাক ফিরে আসত। গল্লামারীতে পড়ে রইত কিছুক্ষণ আগের নিয়ে যাওয়া সেই সব বঙ্গ সন্তানের নিথর দেহগুলো। খুলনা শহর মুক্ত হওয়ার পর গল্লামারী নদী থেকে দুই ট্রাক মাথার খুলি পাওয়া গিয়েছিল।

দৈনিক বাংলার প্রতিবেদক ঐ প্রতিবেদনে আরও লেখেন, ছবি তোলার জন্য গল্লামারীর অভ্যন্তরীণ ধান ক্ষেতে ঢুকে দেখলাম এক নৃশংস দৃশ্য। একাধিক লাশ পড়ে আছে। সেদিকে একটি কুকুর খাচ্ছে আর অপর একটি লাশের পাশে আর একটি কুকুর বসে হাঁফাচ্ছে। মনে হয়, মানুষ খেয়ে তার উদর অতিমাত্রায় পরিপূর্ণ।

বঙ্গ সন্তানের অসংখ্য লাশ ও রক্তে সিক্ত ভূমিকে জাজ্বল্যমান রাখতে আজ সেখানে স্মৃতির মিনার গড়ে উঠেছে। যদিও স্মৃতিসৌধের কাজ পরিকল্পনা মাফিক আজও হয়নি। স্মৃতিসৌধ দেখাশোনা করেন মুক্তিযোদ্ধা সাত্তার। দেশ মাতৃকার মুক্তির লড়াইয়ে সামিল হওয়া এই যোদ্ধা আজ বার্ধক্যের দ্বারপ্রান্তে। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় স্মৃতি বেদীমূলে তিনি জাতীয় পতাকা উঠানো নামানোর কাজ করেন। থাকেন বধ্যভূমি সংলগ্ন বাড়িতে।

গলা ভারী হয়ে আসা মুক্তিযোদ্ধা সাত্তার বলেন, দেশ হানাদারমুক্ত করার জন্য যে হাতে একদিন অস্ত্র উঁচিয়ে ধরেছিলাম; আজ সেই হাতে বধ্যভূমিতে গড়ে ওঠা এ স্মৃতিসৌধ পরিচর্যা করছি। প্রতিদিন চোখে ভাসে সেই নারকীয় তান্ডব। মানুষের গগনবিদারী আর্ত চিৎকার, গুলির শব্দ, রক্তাক্ত হয়ে ওঠা গল্লামারীর ঘোলা জল। সেই স্মৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে আজও মুক্তিযোদ্ধা সাত্তারের সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে ওঠে, শরীরের লোমগুলো দাঁড়িয়ে যায়।

তিনি বলেন, ১৬ ও ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ এখানে এসে লাশের পঁচা দুর্গন্ধ, কঙ্কাল, হাড়-গোর ও মাথার খুলিতে পা রাখা দায় হয়েছিল। যা আজ কল্পনাকেও হার মানায়। যেখানে আজকের বধ্যভূমি, সেটি ছিল ধানক্ষেত। গল্লামারী নদী। নদী

তীরবর্তী এলাকা, আশ-পাশের ধানক্ষেত, সামান্য দূরের বেতার সম্প্রচার ভবন প্রভৃতি গোটা এলাকায় ছিল হাজার হাজার মানুষের নিথর দেহ। অনেকে ছুটে গেছেন সেদিন স্বজনকে খুঁজতে। দুর্গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে ওঠা এলাকায় নাক-মুখ চেপে মানুষ সেই অবশেষ লাশ, হাড়-গোর, কঙ্কালের মধ্যে প্রিয়জনের স্মৃতিচিহ্ন খুঁজে ফিরেছে। কেউ পেয়েছে, কেউ পায়নি।

স্বজন হারানোর স্মৃতি চিহ্ন খোঁজা ছাড়াও নির্মমতা দেখতেও অনেকে ছুটে গিয়েছিলেন বধ্যভূমি গল্লামারীতে। কবি মোল্লা ফজলুর রহমান এমনি একজন ব্যক্তি। পাক-হানাদারদের নয় মাসের বর্বরতার চিহ্ন দেখে তিনি লিখেছেন, '১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর খুলনা বাদে সারা বাংলাদেশ মুক্ত হয়। খুলনা মুক্ত হয় ১৭ ডিসেম্বর শুক্রবার। বাংলার ভাগ্যাকাশে পতাকা উড়ল। যুগ-যুগান্তরের শৃঙ্খলবেড়ী ছিঁড়ে নতুন সূর্যোদয় হল। আমি সেবার বধ্যভূমি গল্লামারী দেখতে হেঁটে যাই। রাস্তার উপরে দু'ধারে পুলের (আজকের ব্রিজ) পার্শে হোগলাবনে ও কচুরীপানার ভিতর নরকঙ্কাল মাথার খুলি হাড় ভর্তি দেখলাম। যুবক-যুবতী, ছেলে-মেয়ের শাড়ী, লুঙ্গি জামা কাপড় দেখলাম। শিয়াল কুকুর মানুষের তাজা তাজা দেহের অংশ কুরে কুরে খাচ্ছে আর ঘেউ ঘেউ করছে। বধ্যভূমি খালের (নদী) কাঁদায় সদ্য কাটা যুবক ও যুবতীদের দেহ দেখলাম।

খুলনা মহানগরীর সার্কিট হাউসের পাশেই হেলিপোর্ট। আজ যেটি জেলা শিল্পকলা একাডেমীর অফিস। এখানে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী প্রকাশ্য দিবালোকে মানুষকে নির্যাতন করত। তাদের নিষ্ঠুর নির্যাতনে অনেকে মারা যেত। আবার কাউকে মেরে উল্লাস প্রকাশ করা হত। নিথর দেহগুলো ফেলে দেয়া হত ভৈরবের স্রোতে।

খুলনার মুক্তিযোদ্ধা কামরুজ্জামান টুকু এ প্রসঙ্গে বলেন, খুলনার গ্রামাঞ্চলে যুদ্ধশেষে শেষ পর্যায়ে আমরা শহরে আসি। হেলিপোর্ট ফরেস্ট ঘাট, গল্লামারীতে মানুষ মারার কাহিনী যুদ্ধে থাকতেই শুনেছি। এসে কিছু দেখেছি। তিনি নিজে যা দেখেছেন, সে সম্পর্কে বলেন, বীভৎস! ভাষায় বর্ণনা করা যায়না সেসব দৃশ্য। এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য লাশ। কুকুরে শিয়ালে মানবদেহ কুরে কুরে খাওয়া। নারী পুরুষের রক্তমাখা পোশাক।

খুলনার হেলিপোর্ট ঠিক জজকোর্টের সামনে এবং সার্কিট হাউস সংলগ্ন। মুক্তিযোদ্ধা টুকু বলেন, ধরে আনা মানুষদের প্রকাশ্য দিবালোকে হেলিপোর্টের প্রবেশ পথে পা উপরে মাথা নীচে দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হত। এ অবস্থায় তাদের ওপর অত্যাচার চলত। অত্যাচারের বিবিধ ধরণ ছিল, চড়, কিল, ঘুশি বা বেয়নেটের আঘাত। যার কাছ থেকে কথা আদায়ের চেষ্টা করা হত প্রবল অত্যাচারে সংজ্ঞাহারা না হওয়া পর্যন্ত তার ওপর নির্যাতন চলত। অজ্ঞান হয়ে গেলে তাকে নামানো হত। জ্ঞান ফিরলে তাকে আবারো পূর্ববৎ ঝুলিয়ে দিয়ে অত্যাচার চালানো হত।

হেলিপোর্ট থেকে ৫০০ গজের মতো দূরে হবে ফরেস্ট ঘাট। ঠিক জজকোর্টের পিছনে। এখানে বাঙালিদের ধরে এনে জবাই করে হত্যা করা হত। মৃতদেহগুলোর পেট চিড়ে নদীতে ফেলে দেয়া হত। ঘাটটির পাশেই জজ সাহেবের বাসা। মৃত্যু পথযাত্রী

বাঙালিদের করুণ আর্তনাদে এলাকার বাতাস ভারি হত। আর্তনাদ জজ সাহেবের কানেও পৌছাত। দিনে হেলিপোর্টের নির্মমতা এবং রাতে ফরেস্ট ঘাটের নৃশংসতায় জজ সাহেব অস্থির হয়ে উঠতেন। একদিন তিনি এখানকার দায়িত্বপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তাকে বিচারালয়ের সামনে এ ধরনের নৃশংসতা না ঘটানোর অনুরোধ করেন। সামরিক অফিসার ক্ষুব্ধ হন। তিনি জজ সাহেবকে মৃত্যুর হুমকি দেন। তবে সামরিক কর্তাটির আশা পূরিত হয়নি। জজ সাহেব অচিরেই হার্টফেল করে মারা যান।

খুলনার অদূরে আর এক বধ্যভূমি চুকনগর। একদিনেই ওখানে কয়েক হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়। চুকনগর কলেজের অধ্যক্ষ এ বি এম শফিকুল ইসলাম বলেন, ঘটনার দিন ১৯৭১ সালের ২০ মে। পাকিস্তানি বর্বরদের হত্যাযজ্ঞ আর নৃশংসতা যখন চরম আকার ধারন করে তখন খুলনা যশোর বাগেরহাট এমনকি বরিশাল জেলার হাজার হাজার মানুষ ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। রাস্তা একটাই— তা হল খুলনা থেকে চুকনগর হয়ে সাতক্ষীরা বা যশোর। খুলনা, সাতক্ষীরা ও যশোরের মিলনস্থল চুকনগরে সেদিন নরপশুরা মানুষ হত্যার মহোৎসবে নেমেছিল।

দূর দূরান্ত থেকে ছুটে আসা হাজার হাজার মানুষ ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল। আয়োজন করছিল সকালের খাবার তৈরির। নদী তীরের বাজার, বটগাছের ছায়া আশে পাশের এলাকা সর্বত্রই নর-নারীর ভিড়। নদীতে নৌকায় করে এসব মানুষ এসেছিল। নৌকায় নৌকায় ভদ্রা নদী ছেয়ে যায়। অনেকে নৌকা বিক্রি করে দেয়। শুরু করে হাঁটা পথে এগিয়ে যাওয়া।

হঠাৎ করে শুরু হয় গুলির শব্দ। সাতক্ষীরা রাস্তা দিয়ে ধেয়ে আসা ৩/৪টি ট্রাকে পাকিস্তানি সেনারা ছিল। অবিরাম ব্রাশ ফায়ারে মুহূর্তের মধ্যে গোটা এলাকার আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। মানুষের ভয়ার্ত আর্তনাদ, বাঁচার আকুতি ছোট ছেলে মেয়েদের চিৎকার কান্নায় গোটা এলাকায় তৈরি হয় এক ভয়াল পরিবেশ।

জনাব ইসলাম তখন বাজারে ছিলেন। গুলির শব্দ শুনে বাড়ির উদ্দেশ্যে দৌড় দেন। বাজার থেকে এক কিলোমিটার দূরে তার বাড়ি। তিনি বলেন, দৌড়ুতে থাকার সময় দেখি আমার মত অনেকেই দৌড়ে ছুটে চলেছে। মানুষের পায়ের তলায় শিশুরা চাপা পড়েছে। নদীর পাশে দেখি তিন ইট দিয়ে তৈরী রেডিমেড উনুনে ভাত, তরকারী ফুটছে। অসহায় শিশু সেই উনুনের পাশে বসে কাঁদছে।

সন্ধ্যার দিকে তিনি আবারও বাজার এলাকায় আসেন। চারদিকে লাশ আর লাশ। রক্ত মাটি দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। শুকিয়ে ওঠা রক্তের গন্ধে তৈরি হয়েছে আঁশটে গন্ধ। নদীতে লাশের বহর। নদীর পানির রং লাল। গোটা বাজার এলাকায় শুধু লাশ আর লাশ। এক এক জায়গায় ১০/১২ টি লাশের স্তুপ। এর মধ্যে অনেককে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হয়েছে। বট গাছতলায় ছিল ৩৫/৪০টি লাশ। কেউ কেউ গাছে ওঠার চেষ্টা করেছিল। শুধু গুলিতে নয়। অনেকে নদী পার হয়ে বাঁচতে চেয়েছিল, সেনা সদস্যদের সহযোগীরা তাদের ডুবিয়ে মেরেছে। সন্ধ্যায় মনে হয়েছে এক মহাশশ্মান। জনাব শফিক বলেন, সেদিনের বর্বরতা ভোলার নয়, যা বর্ণনাতীত।

চট্টগ্রামের বধ্যভূমি

পাহাড়তলীর মাটি খুঁড়লে এখনো ২০ হাজার বাঙালির মাথার খুলি পাওয়া যাবে

বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা সফর করে সুকুমার বিশ্বাস লিখেছেন— পাকিস্তানি সেনারা ২০টিরও বেশি বধ্যভূমিতে বাঙালি নিধনযজ্ঞ চালিয়েছে। চট্টগ্রামে নিহত বাঙালির সংখ্যা অন্তত ৩ লাখ হবে। শহর ও শহরতলীর আমবাগান, ওয়ারলেস কলোনী, শেরশাহ কলোনী ও ফয়েজ লেকসহ গোটা পাহাড়তলীর মাটি খুঁড়লে এখনো ২০ থেকে ২৫ হাজার বাঙালির মাথার খুলি পাওয়া যাবে।

চট্টগ্রাম সেনানিবাসে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারে ২৫০০-এর মতো বাঙালি প্রশিক্ষণার্থী সৈনিক প্রায় নিরস্ত্র ছিলেন। এই সেন্টারে কর্মরত বাঙালি অফিসারদের মধ্যে ছিলেন লেঃ কর্নেল এম আর চৌধুরী, ক্যাপ্টেন আখন্দ, ক্যাপ্টেন বাসার, ক্যাপ্টেন আজীজ, ক্যাপ্টেন এম এস এ ভুঁইয়া, ক্যাপ্টেন এনামুল হক চৌধুরী, ক্যাপ্টেন মহসীন, ক্যাপ্টেন নুরুল আমিন, লেঃ আবু তালেব প্রমুখ। এই ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের প্রায় নিরস্ত্র বাঙালি সৈনিকদের ওপরই একাত্তরের পঁচিশে মার্চের রাতে ২০ বেলুচ রেজিমেন্টের সৈনিকরা প্রথম বড় রকমের আক্রমণ চালায়। সঙ্গে ট্যাঙ্কও নামানো হয়েছিল। বাঙালি প্রশিক্ষণার্থী সৈনিকরা সে রাতে ও তার পরদিন শত শত প্রাণ দিল। বিক্ষিপ্তভাবে কিছু প্রতিরোধ গড়ে উঠলেও পাকিস্তানিদের ব্যাপক আক্রমণের মুখে সেদিন তারা টিকতে পারেনি।

ইবিআরসিতে পঁচিশের রাতে ডিউটি অফিসার ছিলেন ক্যাপ্টেন এনামুল হক চৌধুরী। সে রাতের কথা স্মরণ করে এনামুল হক এক সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেছেন ঃ '... দেখতে পাই বাঙালি সৈনিকদের মৃত্যুর আর্তনাদ। কেউ বাবারে-মারে বলে চিৎকার করছে। কেউ পানির জন্য কাতরাচ্ছে। কেউ যন্ত্রণায় ছটফট করছে। মুমূর্ষু বাঙালি সৈন্যদের ওপর পশ্চিমা পাকিস্তানি সৈন্যদের যথেচ্ছ নির্যাতন চলছিল। যারা মুমূর্ষু অবস্থায় ছটফট করছিল পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা তাদের গলার ওপর বুট দিয়ে চেপে ধরেছে, যাতে তাড়াতাড়ি তারা মরে যায়। ২৬শে মার্চ ভোর ৭টার দিকে পাক সৈন্যরা যেসব লোকদেরকে রাতে নির্দয়ভাবে হত্যা করেছিল তাদেরকে একটি ট্রাকে ভর্তি

করতে দেখতে পাই। আমার সামনে দিয়েও শ'খানেকের ওপর লাশ নিয়ে যেতে দেখতে পাই। প্রত্যেক লাশকে চারজন সৈন্য হাত-পা ধরে মরা কুকুরের মত নিয়ে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে দু'জন সৈন্যকে কয়েকটি লাশ মাটিতে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যেতে দেখতে পাই।' ২৫-২৬ মার্চে চট্টগ্রামের আর কোথাও বোধহয় এত ব্যাপক আকারে হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয়নি। সম্ভবত এক হাজারের মত বাঙালি সৈনিক এ সময় প্রাণ দিয়েছিলেন। অসংখ্য মানুষকে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়েছে। সেনানিবাসের অভ্যন্তরে বেশ কিছু গণকবর, বধ্যভূমি রয়েছে। এসব গণকবর-বধ্যভূমিতে কত শহীদ শায়িত আছেন তার সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। তবে এ সংখ্যা বেশ বড় ধরনের হবে বলেই অনেকে মত প্রকাশ করেছেন।

চট্টগ্রাম জেলায় ২০টি বধ্যভূমি রয়েছে বলে 'পূর্বদেশ' প্রতিনিধি মনে করেন। এ তথ্য ১৯৭২ সালের। আমি নিজেও ১৯৭২-৭৩ এবং তারপরও একাধিক বার চট্টগ্রাম সেনানিবাস শহর ও শহরতলি, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, কাপ্তাই, টেকনাফ ইত্যাদি এলাকা ঘুরে মনে হয়েছে এ সংখ্যা আরো বাড়বে।

'৭২-এ 'পূর্বদেশ' প্রতিনিধি এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত যে প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করেছিলেন তা নানাদিক থেকে গুরুত্ব বহন করে। প্রতিনিধি উল্লেখ করেছিলেন ঃ 'চট্টগ্রাম শহর ও শহরতলি এলাকা সমেত জেলার আরো নয়টি থানাতে হানাদার খানসেনারা সর্বমোট ২০টি বধ্যভূমিতে বাঙালি নিধনযজ্ঞ চালিয়েছে। শহর ও শহরতলি এলাকার দশটি বধ্যভূমির মধ্যে আটটিতে গড়ে পাঁচ হাজার করে বাঙালিকে হত্যা করা হয়েছে বলে অনুমিত হচ্ছে। এছাড়া পোর্ট এলাকা এবং নেভী ব্যারাক এলাকাতে সুদীর্ঘ নয় মাসব্যাপী মানুষকে হত্যা করে কি হারে কর্ণফুলী নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে, তার কোন হদিসও খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। কোন কোন মহল চট্টগ্রামে নিহত লোকের সংখ্যা এক লাখ হবে বলে অনুমান করেছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, বিভিন্ন থানাসহ এ সংখ্যা অন্তত তিন লাখে দাঁড়াবে। শহর ও শহরতলির আমবাগান, ওয়্যারলেস কলোনী, শেরশাহ কলোনী ও ফয়েজ লেকসহ গোটা পাহাড়তলির মাটি খুঁড়লে এখনো ২০ থেকে ২৫ হাজার বাঙালির মাথার খুলি পাওয়া যাবে। এছাড়া রয়েছে চাঁদগাও, লালখান বাজার, হালিশহর, কালুরঘাট ও পোর্ট কলোনী ইত্যাদির বধ্যভূমি। চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট ও সার্কিট হাউজেও হাজার হাজার লোককে ধরে নিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে মিরশ্বরাই ও সীতাকুন্ডের পাহাড়, রাউজান, পটিয়া, সাতকানিয়া এবং বাঁশখালীর বনাঞ্চলেও হাজার হাজার বাঙালিকে হত্যা করা হয়েছে। বিভিন্ন বধ্যভূমিতে আজও বহু নরকঙ্কাল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে। শহরের ওয়্যারলেস কলোনী, ঝাউতলা ও নাছিরাবাদের পাহাড়ী এলাকাগুলোতে বহু নরকঙ্কালের অস্তিত্ব আজো পাওয়া যাবে। ইতিমধ্যে ঝাউতলা এলাকার বিভিন্ন সেফটি ট্যাঙ্ক ও পাহাড়ী ঝোপঝাড়ের মধ্যে অনেকগুলো কঙ্কাল দেখতে পেয়েছি।

সীতাকুন্ডের শিবনাথ পাহাড়ে কয়েক হাজার বাঙালিকে হত্যা করা হয়েছে। মিরশ্বরাইয়ের জোরারগঞ্জ এবং ওয়্যারলেস এলাকায় মানুষ জবেহ করার স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল। রাস্তা, বাস, ট্রাক এবং ট্রেন থেকে হাজার হাজার লোককে ধরে

এনে আটক রাখা হত এবং প্রতিদিন ৫০ জন অথবা ১০০ জন করে হত্যা করা হত। এ সমস্ত এলাকাতে অসংখ্য কবর আজো দেখতে পাওয়া যায়। মানুষের পরিহিত কাপড় চোপড়, জুতা, স্যান্ডেল ইত্যাদিও সেখানে পড়ে আছে। স্থানীয় জনসাধারণের মতে শুধু মিরশ্বরাই ও সীতাকুণ্ডের বধ্যভূমিগুলোতে ১৫ থেকে ২৫ হাজার লোককে হত্যা করা হয়েছে। এছাড়া রাউজান, পটিয়া ও বাঁশখালী ইত্যাদি থানাতেও অনুরূপ হারে গণহত্যা চালানো হয়েছে। কক্সবাজারে রয়েছে গণকবর-বধ্যভূমি। কক্সবাজার সমুদ্রতীরের কেলাতলী, বাহারছড়া এবং কক্সবাজার রেস্ট হাউসের সামনে তিনটি গণকবর থেকে পাঁচ শ'র বেশি লাশ উদ্ধার করা হয়। কক্সবাজর এক নম্বর এবং দু'নম্বর মটেলের সামনেও গণকবর আবিষ্কৃত হয়। এখান থেকেও বেশ কিছু নরকঙ্কাল উদ্ধার করা হয়।

রেস্ট হাউসের সামনের গণকবর থেকে যেসব লাশ উদ্ধার করা হয় তার অর্ধেক লাশই ছিল মহিলার। এসব লাশের মাথার খুলিতে জড়ানো ছিল লম্বা চুল আর পরনের কাপড়। ধারণা করা হয় পাকিস্তানিরা এসব হতভাগী মহিলাদের রেস্ট হাউসে ধরে পাশবিক অত্যাচারের পর এসব স্থানে হত্যা করে মাটি চাপা দিয়েছে। '৭২-এ 'দৈনিক বাংলা' প্রতিনিধি উল্লেখ করেছেন ঃ '... রেস্ট হাউসের স্টোর রুমে সাতটি শুকিয়ে যাওয়া লাশ পাওয়া গেছে। দুটো লাশকে গলাকাটা অবস্থায় দেখা গেছে। এদের হয়ত জবাই করা হয়েছিল। এই স্টোর রুমের মেঝেতে এখনো শুকনো রক্ত সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। রেস্ট হাউসের সামনের কূপে এগারটা নরকঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছে। টেকনাফে সেনানিবাসের সামনের কবরে ৭৭টি নরকঙ্কাল পাওয়া গেছে। এছাড়া তকিয়াতেও পাইকারী কবর আবিষ্কৃত হয়েছে।'

১৯৯৩ সালে 'সংবাদ' প্রতিনিধি প্রিয়তোষ পাল পিন্টু লিখেছেন ঃ 'কক্সবাজার সী বিচ রেস্ট হাউসে খোলা হয় কেন্দ্রীয় নির্যাতন কেন্দ্র ও তার সম্মুখে সমুদ্র সৈকতে একটি বধ্যভূমির সৃষ্টি করা হয়। ঐ নির্যাতন কেন্দ্রে শত শত নারী-পুরুষকে এনে অমানুষিক নির্যাতন করে বধ্যভূমিতে নিয়ে গুলি করে হত্যা করা হত। নারীদের ধর্ষণের পর বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারা হত। এছাড়া জেলার অন্যান্য স্থানেও কয়েকটি বধ্যভূমি করা হয়েছিল। এসব কাজে সার্বক্ষণিকভাবে পাকসেনাদের দেশীয় দোসররা সহায়তা করে যাচ্ছিল। দখলদারীত্বের ৮ মাসে পাকসেনা ও তাদের দোসরদের হাতে কক্সবাজার জেলার কয়েক হাজার নারী-পুরুষ নিহত হয়েছেন। জেলার মহেশখালী থানায় বেশি সংখ্যক লোক নিহত হয়।'

সিভিল পাইওনিয়ার ফোর্স। পাকিস্তান সেনাবাহিনী সুপরিকল্পিতভাবে এই বাহিনী গড়ে তুলেছিল— যাদের মূল কাজই ছিল বাঙালিদের হত্যা করা। বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী অফিসে গোপনে এই সংগঠন গড়ে তোলা হয়। এই সিভিল পাইওনিয়ার ফোর্সের সদস্যরাই পূর্ব রেলওয়ের ১৮ জন অফিসারসহ ১৩শ' কর্মচারীকে হত্যা করেছে বলে জানা যায়। চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাস্টসহ কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন বা সরাসরি যোগাযোগ আছে— এমন সব অফিসগুলোতে এ বাহিনীর সদস্যরা খুবই তৎপর ছিল।

এই বাহিনী গঠনে কেন্দ্রীয় সরকার গোপনীয়তা রক্ষা করেছিল। আগস্টের শেষ নাগাদ এই বাহিনীর গঠন প্রক্রিয়া শেষ হয় এবং তারা সেপ্টেম্বরের গোড়া থেকেই

তৎপরতা শুরু করে। পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এই ফোর্স গঠিত হয়। মূলত রেলওয়েতে কর্মরত বিভিন্ন পদের অবাঙালি— যাদের বয়স ৪০-এর নিচে তাদেরকে নিয়ে এই বাহিনী গঠন করা হয়। পরবর্তীতে কিছু সংখ্যক বাঙালি এবং রেলওয়ের বাইরের অনেক অবাঙালি এই দলে যোগ দিয়েছিল বলে জানা যায়। এই বাহিনীর সঠিক সদস্য সংখ্যা সম্পর্কে এখনো পর্যন্ত কিছু জানা না গেলেও এদের সংখ্যা যে বেশ বড় ধরনের ছিল তা হত্যার সংখ্যা দেখেই বুঝা যায়।

সিভিল পাইওনিয়ার ফোর্সের সদর দফতর ছিল চট্টগ্রাম। এর শাখা অফিস ছিল সৈয়দপুর, সান্তাহার এবং অন্য বেশকিছু রেলকেন্দ্রে। এই বাহিনীর সদস্যদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল চট্টগ্রাম পাহাড়তলী এবং সার্কিট হাউস এলাকায়। পাক বাহিনীর সহায়তায় এই ফোর্স অসংখ্য নারী পুরুষকে ধরে এনে পাহাড়তলী এলাকার বনাঞ্চল, ফয়েজ লেক, ঝাউতলা ইত্যাদি স্থানে হত্যা করত। এই তিন এলাকার প্রধান বধ্যভূমি পাইওনিয়ার বাহিনীর জন্যই সুনির্দিষ্ট ছিল বলে জানা যায়। এই তিন বধ্যভূমিতে তারা অধিকাংশ মানুষকে খুন করেছে। এই বাহিনীর সদস্যরা নিয়মিত ট্রেনে চলাচল করত বলেও জানা যায়। কাউকে সন্দেহ হলেই ট্রেন থেকে নামিয়ে এনে হত্যা করেছে। সিভিল পাইওনিয়ার ফোর্স কেবল রেলওয়ের ১৩শ' বাঙালি কর্মচারীকেই হত্যা করেনি— তারা সীতাকুন্ডের শিবনাথ পাহাড় এবং মীরশ্বরাই থানা এলাকার বধ্যভূমিতে হাজার হাজার বাঙালিকে বধ করেছে বলে জানা যায়।

পাহাড়তলী, ওয়ারলেস কলোনী এলাকায় বধ্যভূমি রয়েছে। ১৯৭৩ সালে 'জাতীয় স্বাধীনতার ইতিহাস পরিষদ'-এর পক্ষ থেকে বাংলাদেশ রেলওয়ের পাহাড়তলী কেন্দ্রের সহকারী হিসাব রক্ষক মোহাম্মদ শামসুল হকের একটি সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছিল। সাক্ষাৎকারে শামসুল হক সেদিন বলেছিলেন ঃ '... ১০ই নভেম্বর। সেদিনটি ছিল ২০শে রমজান। খুব সকালবেলা পাহাড়তলীর পাঞ্জাবী লাইন, ওয়ারলেস কলোনী এবং বাহাদুর শাহ্ কলোনীর শিশু, যুবক, যুবতী, নারী-পুরুষ, বৃদ্ধকে বাসা থেকে জোরপূর্বক ধরে আনে এবং কাউকে কাউকে মিলিটারী অফিসার সাহেব ডাকছে বলে ধোকা দিয়ে ওয়ারলেস কলোনীর নিকটস্থ পাহাড়ে দল বেঁধে নিয়ে যায়। সেখানে জল্লাদেরা ধারাল অস্ত্র এবং স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দিয়ে হত্যাযজ্ঞ চালায়। সকাল থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত এই হত্যাযজ্ঞ অব্যাহত থাকে। আমরা কয়েকজন আফছার উদ্দিন, আবদুস সোবহান ও মোহাম্মদ ছাবেদ মিয়া এই হত্যাযজ্ঞ পাহাড়ের জঙ্গল থেকে দেখতে পাই। সেদিন নরঘাতকরা এক এক বারে আনুমানিক দু'শ' লোককে হত্যা করে তাদের শরীরের কাপড়গুলো একত্রিত করে পেট্রোল দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। ১০ই নভেম্বর ৩টার সময় একজন সামরিক অফিসারসহ অনেকে ওয়ারলেস কলোনী দেখতে আসে। সাথে আমরা প্রায় ৩শ' লোক তাদের সাথে উক্ত জায়গায় গিয়ে পৌঁছাই। হাজার হাজার নারীপুরুষের লাশ পড়ে আছে। কোথাও কোথাও মৃতদেহগুলো একত্রিত করে পেট্রোল দিয়ে জ্বালিয়েছে। নরপশুরা আত্মীয়স্বজনকে লাশ দিতে অস্বীকার করে। পাহাড়ের ওপরে নির্লজ্জ অবস্থায় অনেক যুবতী নারীর দেহ ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পড়ে আছে।' শামসুল হক জানিয়েছিলেন কিছুসংখ্যক পাকসেনা এবং বিহারীরাই এই হত্যাযজ্ঞ চালায়।

বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলার মীরশ্বরাই থানার পশ্চিম হিঙ্গুলী গ্রামের একটি পুকুর থেকে ৮৩টি নরকংকাল উদ্ধার করা হয়। পুকুরটি ছিল জঙ্গলঘেরা অন্ধকার এলাকায়। এই গ্রামটি ফেনী নদীর রেলসেতুর নিকটেই অবস্থিত। বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, আনসার, মুজাহিদ, ছাত্রজনতা সম্মিলিতভাবে কুমিল্লা সেনানিবাস থেকে অগ্রসরমান পাকসেনাদের গতিপথ রোধ করার জন্য ফেনী নদীর রেলসেতুর দক্ষিণ অংশ ধ্বংস করে দেয়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এখানে এসে থমকে দাঁড়ায়। এতে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ঐ সময়ই নোয়াখালী জেলার ছাগলনাইয়ার একটি গ্রামের ২৪০ জনকে ধরে এনে হত্যা করে। এরপর থেকে পাকিস্তানিরা প্রতিদিন এই সেতুর আশপাশ গ্রাম থেকে বাঙালিদের ধরে এনে সেতুর ওপর দাঁড় করিয়ে হত্যা করত। সেতুটি বধ্যভূমিতে পরিণত হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, এমন কোন দিন যায়নি যেদিনে তারা এই স্থানে বাঙালিদের হত্যা না করেছে।

দামপাড়া পুলিশ লাইনে রয়েছে গণকবর। বিভিন্ন স্থান থেকে ধরে এনে এই পুলিশ লাইনের বধ্যভূমিতে হত্যা করে মাটি চাপা দিয়ে রাখা হত। ১৯৭২ সালের ২৭শে জুন দামপাড়া রিজার্ভ পুলিশ অফিস প্রাঙ্গণে স্বাধীনতা যুদ্ধে চট্টগ্রামের যেসব পুলিশ ও কর্মকর্তা শহীদ হয়েছেন তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি শহীদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন চট্টগ্রাম পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট এএইচটি জামান। অনুষ্ঠানে তিনি জানিয়েছিলেন, চট্টগ্রাম জেলার দু'জন পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট, তিনজন ইন্সপেক্টর, চারজন সাব-ইন্সপেক্টর এবং চারজন হেড কনস্টেবলসহ ৭৩ জন পুলিশ কর্মী শহীদ হয়েছেন। অনুষ্ঠানে আরো ২৪ জন পুলিশের নিখোঁজ হওয়ার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

স্বাধীনতার পর পরই চট্টগ্রামের পাঁচলাইলের ডাম্পিং ডিপোর কাছে আরো একটি বধ্যভূমি আবিষ্কৃত হয়। এই স্থানের মাটি সরাবার পর শত শত নরকংকাল পাওয়া যায়। মাথার খুলি এবং হাড়গোড়ের পরিমাণ দেখে পাঁচলাইশের এই বধ্যভূমিতে ৫ শতাধিক মানুষকে হত্যা করা হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। কোন কোন কংকালে তখনো বুলেট বিদ্ধ ছিল।

চট্টগ্রামের ষোলশহরের সিডিএ মার্কেটের কাছেও অপর একটি বধ্যভূমি আবিষ্কৃত হয়। এখানেও শত শত নরকংকাল, মাথার খুলি, কাপড়চোপড় পাওয়া যায়। এখানকার বধ্যভূমিতে যেসব কংকাল-লাশ পাওয়া যায়— তাদের অনেককেই ডিসেম্বরের প্রথমদিকে হত্যা করা হয়েছে বলে মনে করা হয়।

সম্ভবত চট্টগ্রামের সবচেয়ে মর্মান্তিক লোমহর্ষক বধ্যভূমিটি দামপাড়ার গরীবুল্লাহ শাহ মাজারের পাশে আবিষ্কৃত হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা অনুমান করেন এই বধ্যভূমিতে ৩০শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৪০ হাজার বাঙালিকে হত্যা করা হয়েছে। এই বধ্যভূমিতে গোটা ৯ মাসব্যাপী যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় তার নীরব সাক্ষী হয়ে বেঁচে আছেন গরীবুল্লাহ শাহ মাজারসংলগ্ন দোকানদার নাসির আহমদ। এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের আরো দু'জন সাক্ষী রয়েছে গরীবুল্লাহ শাহ মাজারের দারোয়ান আবুল কালাম ও আবদুল জব্বার।

দোকানদার নাসির আহমদকে উদ্ধৃত করে 'দৈনিক বাংলা' প্রতিবেদক ১৯৭২ সালে লিখেছেন ঃ '... গত ৩০শে মার্চ থেকে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ্ পর্যন্ত অতিরিক্ত বৃষ্টির দিন ছাড়া প্রত্যহ সন্ধ্যায় কড়া মিলিটারী পাহারায় ৫ থেকে ৬ ট্রাক বোঝাই লোক নিয়ে আসা হত। এই হতভাগাদের চোখ কাপড় দিয়ে বাঁধা থাকত। তাদের বধ্যভূমিতে নামিয়ে দিয়ে ট্রাকগুলো চলে যেত। এই হতভাগ্যদের বধ্যভূমিতে লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করা হত। তারপর অন্য একদল মিলিটারী ট্রাক নিয়ে বধ্যভূমিতে এসে লাশগুলো ট্রাক বোঝাই করে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেত। নিয়মিত এই হত্যাযজ্ঞের শুরুতে লাশ পুঁতবার জন্য বধ্যভূমির পাশে একটি গভীর গর্ত খনন করা হয়। মাত্র কয়েকদিনের লাশে এই গভীর গর্ত ভর্তি হয়ে গেলে সদ্যমারা লাশগুলোকে ট্রাকে করে অন্যত্র সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করা হয়। এই লোমহর্ষক বধ্যভূমি চারদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা। বধ্যভূমির চারদিকে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রয়েছে হতভাগ্যদের জামাকাপড়, জুতা প্রভৃতি। মাটিতে রয়েছে চাপ চাপ বিস্তর রক্তের দাগ, যা প্রমাণ করছে যে গত ডিসেম্বরের প্রথমদিকে এখানে কয়েকশ' লোককে হত্যা করা হয়েছে। বধ্যভূমির পাশে হাঁটার সময়ে মাটিতে আমি গোটা দশ স্যুটও দেখতে পেয়েছি। এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে, রেলওয়ে পোর্ট ট্রাস্ট এবং অন্যান্য অফিসের যেসব হতভাগ্য অফিসার নিখোঁজ রয়েছেন— তাদের অনেককেই এই বধ্যভূমিতে হত্যা করা হয়েছে।'

নাসির আহমদের মতে অত্যাচারের কালো দিনগুলোতে বর্বর পাকবাহিনী এই বধ্যভূমিতে প্রায় ৪০ হাজার লোককে হত্যা করেছে। তিনি বলেছেন, 'নিয়মিত এ হত্যাযজ্ঞের শুরুতে চোখ বাঁধা অবস্থায় বধ্যভূমিতে আনা একদল লোককে গুলি করে হত্যা করলে গুলির আওয়াজে লাইন করে দাঁড়ানো অন্যদল মৃত্যুভয়ে চিৎকার করত বলে পরে রাইফেলে সাইলেন্সার লাগিয়ে গুলি করে মারার পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়।'

চট্টগ্রামের সাবেক বোয়ালখালী থানার শাকপুরা গ্রামেও রয়েছে বধ্যভূমি। ২০শে এপ্রিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের দোসররা খুব ভোরে গ্রামটি ঘিরে ফেলে। গ্রামবাসী তখনো সবাই ঘুম থেকে ওঠেনি। কিছু বুঝে উঠবার আগেই গ্রামবাসী দেখল সামনে পাকসেনা। পালাবার পথ নেই। তবুও সেদিন গ্রামের মানুষ পালিয়ে প্রাণে বাঁচতে চেয়েছিল। হানাদারদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কেউ পালাতে পারল, কেউ পালাতে গিয়ে গুলিতে প্রাণ দিল। পাকসেনারা গ্রামে আগুন ধরিয়ে দিল তারপর গুলি আর গুলি। চারিদিকে আগুন, শিশু-নারী-পুরুষের আর্তচিৎকার আর আহাজারিতে শাকপুরা গ্রাম যখন কাঁদছে— তখন একদল মানুষ নামের পশু লুট করে চলল। কেবল সম্পদ নয়— নারীও। অসংখ্য নারী তার সম্ভ্রম হারাল। এক পর্যায়ে থেমে গেল চিৎকার। গ্রামের ১৫০ জন মানুষ প্রাণ দিল। মাটিচাপা দেয়া হল কোন রকমে। যারা পালাতে পেরেছিল তারা একে একে সন্ধ্যায় আপন গ্রামে ফিরে এল। তারা দেখল তাদের সবকিছু শেষ। কারো বোন নেই, কারো ভাই নেই, কারো স্বামী নেই, কারো সন্তান নেই। এরপর ঘরে খাবার নেই। কেবল নেই। জীবিতরা সবাই সবাইকে ধরে কেঁদে উঠল। সে এক করুণ হৃদয়বিদারক দৃশ্য। একাত্তরে এমনি দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল বাংলার প্রতি গ্রামে, প্রতি ঘরে।

লাকসাম বধ্যভূমি

নারী নির্যাতন হিসেবে ধর্ষণ ছিল প্রাত্যহিক ঘটনা

লাকসাম বধ্যভূমিতে শ্রীধাম চন্দ্র দাস একাই সোয়াশ' গর্ত খুঁড়েছেন। মাটি চাপা দিয়েছেন কয়েক শ' লাশ। লাকসামে চাঁদপুর টোব্যাকো কোম্পানির কারখানায় পাকিস্তানি সৈন্যরা বানিয়েছিল নির্যাতন কেন্দ্র। পেশাগত কারণে তাকে সেখানেও যেতে হয়েছে প্রতিদিন। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন পাকিস্তানি বাহিনীর নির্যাতন। সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যগুলোর কথা বলছিলেন শ্রীধাম চন্দ্র দাস গত ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯। তাঁর বক্তব্য রেকর্ড করেছেন সাংবাদিক মোস্তাফা হোসাইন লাকসামে জাহাঙ্গীর মাওলা চৌধুরীর দফতরে বসে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জাহাঙ্গীর মাওলা চৌধুরী, আবদুল বারী মজুমদার, নজীর আহাম্মদ ভুঁইয়া (সবাই মুক্তিযোদ্ধা), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. শান্তিরঞ্জন দাস এবং রেলওয়ের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ বশিরুজ্জামান। শেষোক্ত দু'জনও একাত্তরের নৃশংসতা সামনে থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন। নির্যাতন কেন্দ্র থেকে একা ফিরতে পেরেছেন মোহাম্মদ বশিরুজ্জামান। তাঁর সঙ্গের ১৩ জনকেই গুলি করে হত্যা করে পাকিস্তানি সৈন্যরা। শ্রীধাম চন্দ্র দাস স্মৃতিচারণ শেষে বধ্যভূমি এলাকায় যান। মাটি খুঁড়ে বের করে আনেন মাথার খুলি ও হাড়। যা পরবর্তী সময় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে প্রদান করা হয়।

একাত্তরে আমি চাকরি করতাম রেলওয়ে বিভাগে। বিভাগীয় হাসপাতালের ক্লিনার ছিলাম। বয়স ছিল তখন ১৮/১৯ বছর। আর চাকরির বয়স ৪ বছর।

মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দিলেন। আমাদের অবস্থান থেকে আমরা সমর্থন জানালাম। এরপর এল ২৫ মার্চ। সারাদেশে তখন তোলপাড়। কোথায় যাব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। চিন্তা করলাম আমরা যে ধরনের পেশায় নিয়োজিত তাতে হয়ত আমাদের ওপর পাকিস্তানি বাহিনী ততটা ক্ষিপ্ত হবে না।

কার্যত তেমন ক্ষিপ্ত হয়নি। বিচ্ছিন্নভাবে আমাদের ওপর কিছু নির্যাতন চালানো হলেও সইতে হয়েছে মুখ বুজে। তাই একদিকে নিজেদের ভাগ্যবান মনে করলেও প্রতিটি সময় ভেবেছি এও কি সম্ভব? বার বার প্রশ্ন করেছি নিজেকে। এত মানুষকে ওরা হত্যা করছে কোন অপরাধে? জবাব পাইনি আজও।

সেই স্মৃতি আজও আমাকে যন্ত্রণা দেয়। আমি এখনো স্থির থাকতে পারি না। পারা

কি সম্ভব? আমার মৃত্যুর আগেও সেসব স্মৃতি ভুলতে পারব না। সেসব দৃশ্য বর্ণনা করা সম্ভব নয়। চাঁদপুর টোব্যাকো কোম্পানির সিগারেট কারখানার ভেতরে গেটের সামনে, এবং রেলওয়ে জংশনের দক্ষিণে কেবিন বরাবর পূর্বদিকে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত বাংকারের উত্তর ও দক্ষিণে প্রতিটি জায়গায় নৃশংস অত্যাচার চালানো হয়েছে নর-নারী নির্বিশেষে প্রতিটি বাঙালির ওপর।

চাঁদপুর টোব্যাকো কোম্পানির সিগারেট কারখানায় পাকিস্তানি সৈন্যরা সাব-সেক্টর হেড কোয়ার্টার প্রতিষ্ঠা করে। এটি ছিল তাদের প্রধান নির্যাতন কেন্দ্র। এখানে ধরে আনা হত বাঙালি নারী-পুরুষ— যাকে তাদের ইচ্ছা হয়েছে তাকেই। তবে তারা প্রথম টার্গেট হিসেবে ধরেছিল মুক্তিবাহিনীকে। মুক্তিবাহিনীর কাউকে সহজে পাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই তরুণরা তাদের প্রধান টার্গেট হয়।

হিন্দু ধর্মাবলম্বী পেলে রক্ষা থাকত না। ঘাতকরা বয়স কিংবা নারী পুরুষ কোনটাই বিবেচনা করত না। আর ছিল আওয়ামী লীগার। প্রথম প্রথম এভাবে বাছাই করে অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করা হলেও একটা পর্যায়ে এসে তারা পুরো বাঙালি জাতিকেই টার্গেট করে। যাকে ইচ্ছা হত তাকেই ঢুকিয়ে দেয়া হত নির্যাতন কেন্দ্রে। দীর্ঘ সময় ধরে চালানো হত প্রচণ্ড মার-ধর। নারী নির্যাতন হিসেবে ধর্ষণ ছিল প্রাত্যহিক ঘটনা। সে চিহ্ন আমি লাশের গায়ে স্পষ্ট দেখেছি। আমি দেখেছি অনেক নারীর চিবুকে মানুষরূপী পশুদের দাঁতে কাটা দাগ, খন্ড-বিখন্ড ঠোঁট। স্তন কেটে চৌচির করে ফেলেছে অনেক মহিলার। আমাকে দেখতে হয়েছে মায়ের বয়সী অনেক মহিলার ক্ষত-বিক্ষত উলঙ্গ দেহ। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে আমার দেখা এ লাশগুলোকে আমার হাতেই মাটি চাপা দিতে হয়েছে। কখনো দেড়-দুই হাত মাটি খুঁড়ে একেকটি লাশ, কখনো কিছুটা গভীর গর্ত করে এক জায়গায়তেই একাধিক লাশ আমাকে মাটি চাপা দিতে হয়েছে।

এ নির্যাতন কেন্দ্রে মহিলাদের আনা হত দূর-দূরান্ত থেকে। এ কাজে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করত বাঙালি রাজাকার ও শান্তি কমিটির সদস্যরা। লাকসাম ও তার আশেপাশের গ্রামের কিছু লোক ছিল শান্তি কমিটিতে। পশ্চিমগাঁও এলাকার অনেকেই ছিল রাজাকার, আলবদর কিংবা শান্তি কমিটির সদস্য।

শান্তি কমিটির সদস্যরা এবং রাজাকাররা মেয়েদের ধরে এনে পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে দিত। রাতভর পাশবিক নির্যাতন চালানোর পর ভোরে ওদের গুলি করা হত। অনেকেই গুলিবিদ্ধ হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করত। যারা বেঁচে থাকত তাদের নিয়ে যাওয়া হত কয়েকশ' গজ পূর্ব দিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত বাংকারের দুই পাশে তৈরি বধ্যভূমিতে।

আমাকে কিংবা আমার মামা উপেন্দ্র চন্দ্র দাসকে দিয়ে গর্ত করিয়ে যেখানে মাটি চাপা দেয়া হত তাদের। অনেক মহিলাকে সরাসরি বধ্যভূমিতে নিয়ে আসা হত। লাইন করে দাঁড় করানো হত গর্তের পাশে। গুলি করা হত সেখানেই। কেউ কেউ গুলি খেয়ে পড়ত গর্তে। কেউ বা গর্তের পাড়ে। তাদের লাথি গুতো দিয়ে ফেলা হত গর্তে। এরপর আমাদের বলা হত মাটি চাপা দিতে।

কত মানুষ যে ওদের হাতে প্রাণ হারিয়েছে সঠিক সংখ্যা বলা কঠিন। প্রতিদিনই

ওরা মানুষ হত্যা করেছে। প্রতিদিন শুধু মহিলাদের সংখ্যা হবে কম করে হলেও গড়ে ২০/২৫ জন। মহিলাদের মধ্যে দুয়েকজনকে আবার নির্যাতন কেন্দ্র থেকেই অন্য জায়গায় সরিয়ে নেয়া হত। এমনও হতে পারে দুয়েকজন হয়ত নির্যাতন শেষে ছাড়াও পেয়েছেন।

খুব কম মানুষকেই আমি চিনেছি। আর পরিচয় পাওয়াটা খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। কারণ তাদের আনা হত চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, নোয়াখালী জেলা এবং কুমিল্লা জেলার দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন স্থান থেকে। তবে আমাদের এলাকার তিনজনের কথা আমি ভুলব না। তাঁরা প্রত্যেকেই আমাকে স্নেহ করতেন। সেই ছোটকাল থেকে আমি তাদের দেখেছি। একজন হলেন মুক্তিযোদ্ধা আবদুল খালেক। এ এলাকার সন্তান তিনি। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পর তিনি সশস্ত্র প্রশিক্ষণ প্রদান করেছিলেন। তরুণদের সংগঠিত করেছিলেন যুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য। পাইকপাড়ার সোবহান সাহেব এবং বাইনচাটিয়ার নূরু মিয়াকেও একই সঙ্গে ধরে এনেছিল স্থানীয় শান্তি কমিটির সদস্যদের সহায়তায়। রাত আটটার দিকে তাদের ধরে আনা হয়। পরদিনও তাদের রাখা হয় নির্যাতন কেন্দ্রে। সকালে জানাজানি হয়ে যায় পুরো এলাকায়। কিন্তু তাদের বাঁচানোর জন্য পাকিস্তানি সৈন্যদের অনুরোধ করবে এমন সাহস কারো ছিল না।

সকাল সকাল আমি সিগারেট কারখানায় চলে যাই আমার সরঞ্জামাদি নিয়ে। বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় সিদ্ধান্ত নিই তাদের জন্য প্রয়োজনে সৈন্যদের পায়ে ধরব।

পাকিস্তানি সৈন্য বাকাউল হাওয়ালদারকে ভালো করে আমি চিনি। এই তিনজনকে ধরার সময় সেই নেতৃত্ব দিয়েছিল। তাকে বললে কাজ হতে পারে এই চিন্তা করেও সাহস পাইনি কিছু বলতে।

নির্যাতন কেন্দ্রে যাওয়ার পর তারা আমাকে দেখেন। ইশারায় আমাকে তারা জানান জল পিপাসা পেয়েছে তাদের। চোখে মুখে দারুণ উৎকণ্ঠা তাদের। আমার মনে হয়েছে, তাদের বুক ফেটে যাচ্ছে। তারা আমাকে যেন চোখের ইশারায় বলছেন শ্রীধামরে একটু চেষ্টা করে দেখ না আমাদের বাঁচান যায় কিনা? বলুন এ দৃশ্য দেখার পরও কি স্থির থাকা সম্ভব? পাথরের মতো নিশ্চল তিনজনকে দেখে আমার চোখ থেকে জল বেরিয়ে আসে। গামছায় দ্রুত জল মুছে নেই। পাছে পাকিস্তানি পাষণ্ডদের চোখে পড়ে যাই।

নিজেকে তখন দুনিয়ার সবচেয়ে বড় অকৃতজ্ঞ মনে হতে থাকে। বিশেষ করে খালেক সাহেবের কথা আমাকে বারবার বলতে হয়। তাঁর কাছ থেকে অনেকবার আমার বাবা চাল ডাল নিয়েছেন। আমাদেরকে খাইয়েছেন। সেই খালেক সাহেবের জন্যও আমি কিছুই করতে পারব না? ভাবলাম বাঁচাতে না পারি অন্তত তৃষ্ণা নিবারণের চেষ্টাতো করতে পারি। সেই লক্ষেই চলে যাই পুকুরে। একটি মাটির পেয়ালায় করে জল নিয়ে আসি। গামছা দিয়ে ঢেকে আনার কারণে পুকুর থেকে নির্যাতন কেন্দ্রের দালান পর্যন্ত পাষণ্ডদের চোখে পড়িনি।

অনেক কষ্টে প্রহরীর চোখ ফাঁকি দিয়ে পেয়ালাটা খালেক সাহেবের হাতে দিতে সক্ষম হই। কিন্তু দুর্ভাগ্য, খালেক সাহেব, সোবহান সাহেব কিংবা নূরু মিয়ার পক্ষে সেই জল খাওয়া সম্ভব হয়নি। বর্বর সৈনিকটির চোখে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সে লাথি চালায় পেয়ালায়। পানি গড়িয়ে পড়ে মাটিতে। অত্যন্ত রুক্ষ ভাষায় সে গালি দেয়।

বলে, শালা, এক শালা পেশাব কর, দোসরা শালা খাও।

ডিউটি শেষ করে বাড়িতে পৌঁছে মাকে বলি সব ঘটনা। মা আমাকে বলেন 'ঠাকুরকে ডাক বাবা। এ অনাচার ঠাকুর সইবেন না।'

পারলাম না তাদের রক্ষা করতে। কোনো ভূমিকাই রাখতে পারিনি। পাকিস্তানি হাবিলদার বাকাউলের রক্তচক্ষু আমাকে পিছিয়ে দিয়েছে।

সোবহান সাহেবকে নিত্য দেখেছি। কী অপরাধ করেছেন তিনি? এত বড় আল্লাওয়ালা মানুষ নূরু মিয়া। তাদের জন্যও গর্ত করতে হল আমাকে। আমার সামনেই বাকাউল হাওয়ালদার একে একে তিনজনকে গুলি করল। বিশ্বাস করবেন না মানুষ যে কত জোরে চিৎকার করতে পারে, একাত্তরে সেদিন আমি শুনেছি নূরু মিয়ার কণ্ঠে। গুলি খেয়ে তিনি এত উচ্চ শব্দে আল্লাহ বলে উঠেছিলেন যে, আমার মনে হয়েছে লাশটা যেন একশ' হাত উপরে উঠে গেছে। মনে হয়েছে নূরু মিয়ার আর্তনাদ শুনে আল্লাহর আরশও কেঁপে উঠেছিল।

আমার চোখ দু'টি সঙ্গে সঙ্গে নিচে নামিয়ে নিই। মায়ের উপদেশের কথা মনে করি। ডাকতে থাকি ঠাকুরকে— 'ঠাকুর তুমি তো সবার। তুমি রক্ষা কর।'

ঠাকুর আমার ডাক শুনলেন না। আমার চোখের সামনে আমার নিজের মানুষ তিনজনকে খুন করা হল। আমাকে বলা হল ওদের মাটি চাপা দাও। ভাবলাম আর তো কিছুই করার নেই। তারা মৃত। স্বর্গবাসী। অন্তত আলাদা আলাদা কবর করে তাদের প্রতি আমার সম্মান জানাতে পারি। শেষ পর্যন্ত তাই করলাম। তিনজনকে আলাদা আলাদা গর্তে শুইয়ে দিলাম।

দেশ যখন স্বাধীন হয় তখন বধ্যভূমির বেলতলা থেকে আমিই তাদের লাশ তিনটি আবার তুলে নিই। তাদের পরিবারের লোকজন ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী তাদের সমাধিস্থ করেন। স্বাধীনতার পর আরেকজন মহিলার লাশও আমি বধ্যভূমি থেকে উঠিয়েছি।

বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যদের অনেকের সঙ্গেই আমার কথা-বার্তা হয়েছে। তাদের নাম পুরোপুরি মনে করতে পারছি না। বাকাউল হাওয়ালদার, ক্যাপ্টেন গাজ্জালী কিংবা গাদরাজি এমন একটি নামের একজনকে মনে পড়ছে।

ওরা এখানে বেশ ক'টি ক্যাম্প স্থাপন করেছিল। রেলওয়ে স্কুল, রেলওয়ে রেস্ট হাউস, সিগারেট কারখানা ও আশেপাশে তাদের ক্যাম্পগুলো ছিল। এসব ক্যাম্প থেকে ওরা বেরিয়ে গ্রামবাসীদের ওপর অত্যাচার চালাত।

একবার আমার আত্মীয় কানু দাসের পরিবারের এক সদস্যাকে অত্যাচার করতে গিয়েছিল একটি সৈন্য। কানু বাধা দিলে তাকে প্রচণ্ডভাবে মারধর করা হয়। কথাটা কমান্ডারের কানে দেয়া হয়েছিল। কমান্ডার ছিল একজন কর্ণেল।

বধ্যভূমি এলাকায় আমার মামা উপেন্দ্র চন্দ্র দাস এবং আমি ছাড়া আর্মিরাও গর্ত করে মানুষ মাটি চাপা দিয়েছে। সিগারেট কারখানার পশ্চিমে কিংবা গেটের ওপাশে ও পুকুর পাড়ে যেসব মানুষকে মাটি চাপা দেয়া হয়েছে সেগুলো আর্মিরাই করেছে।

গত ঊনত্রিশ বছর ধরে আমি এই দুর্বিসহ স্মৃতি বয়ে বেড়াচ্ছি। আর ভাবি এমন নৃশংস কাজও মানুষ করতে পারে?

২৫ মার্চ রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে নিহত ছাত্রদের লাশ

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের নিদর্শন ঃ কুষ্টিয়ার একটি জনপদ

'৭১-এ নারী নির্যাতনের একটি দলিল। হাত বেঁধে ধর্ষণ এবং তারপর হত্যা করা হত

'৭২-এ ঢাকার নারী পুনর্বাসন কেন্দ্রে দু'জন নির্যাতিতা নারী

পাকিস্তানিদের বোমার হামলায় ভষ্মিভূত হয়েছে শত শত জনপদ। অর্ধদগ্ধ একটি বালকের শুশ্রূষার চেষ্টা
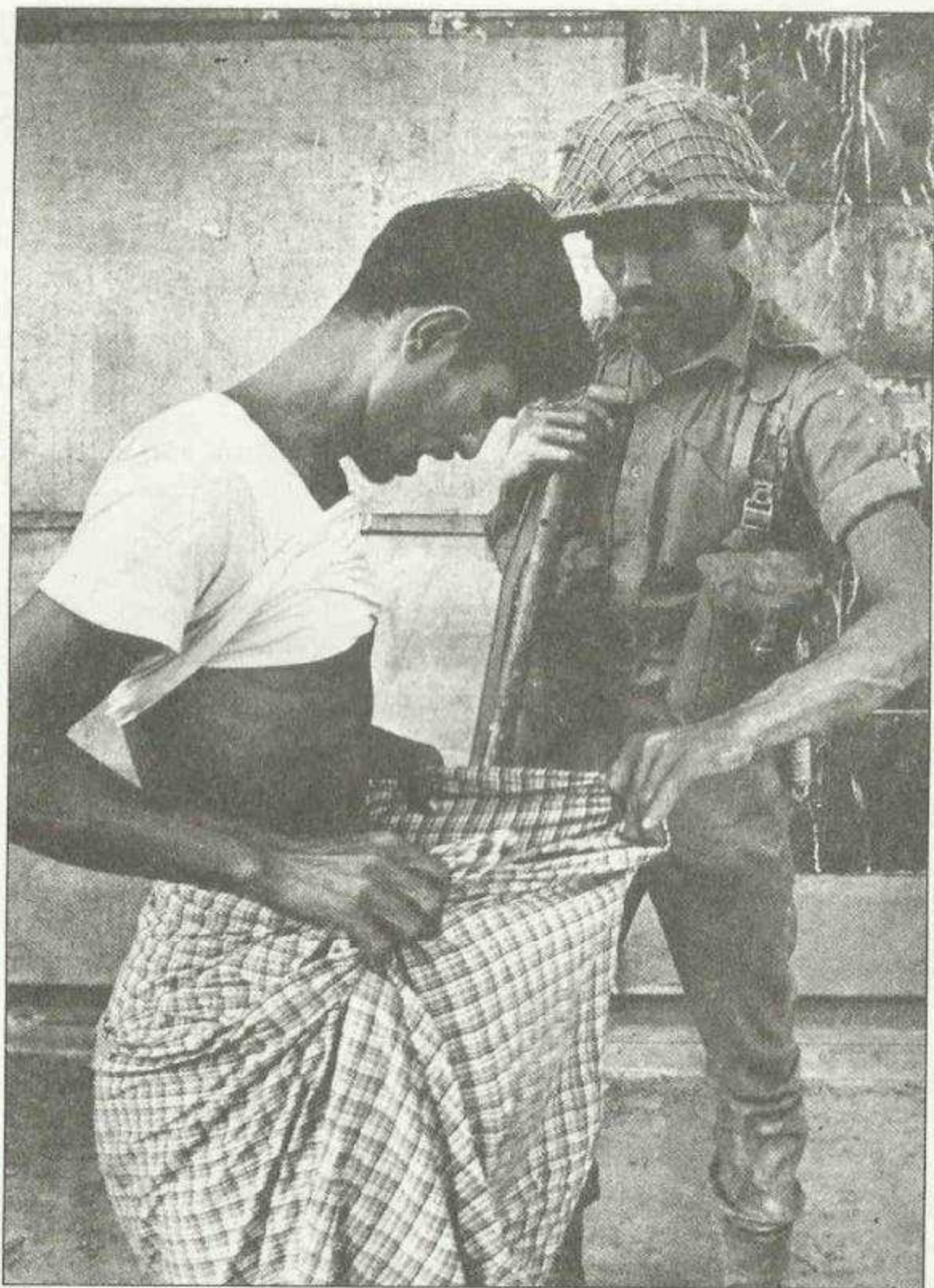
মানবতার চরম লাঞ্ছনার একটি নিদর্শন ঃ পাকিস্তানি সৈন্যরা এভাবে কাপড় খুলে দেখত কে মুসলমান, আর কে অমুসলমান

যশোরের রাস্তায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে নিহত অসহায় বাঙালিদের লাশ

২৫ মার্চের কালরাত্রিতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে বিধ্বস্ত ঢাকা মহানগরী
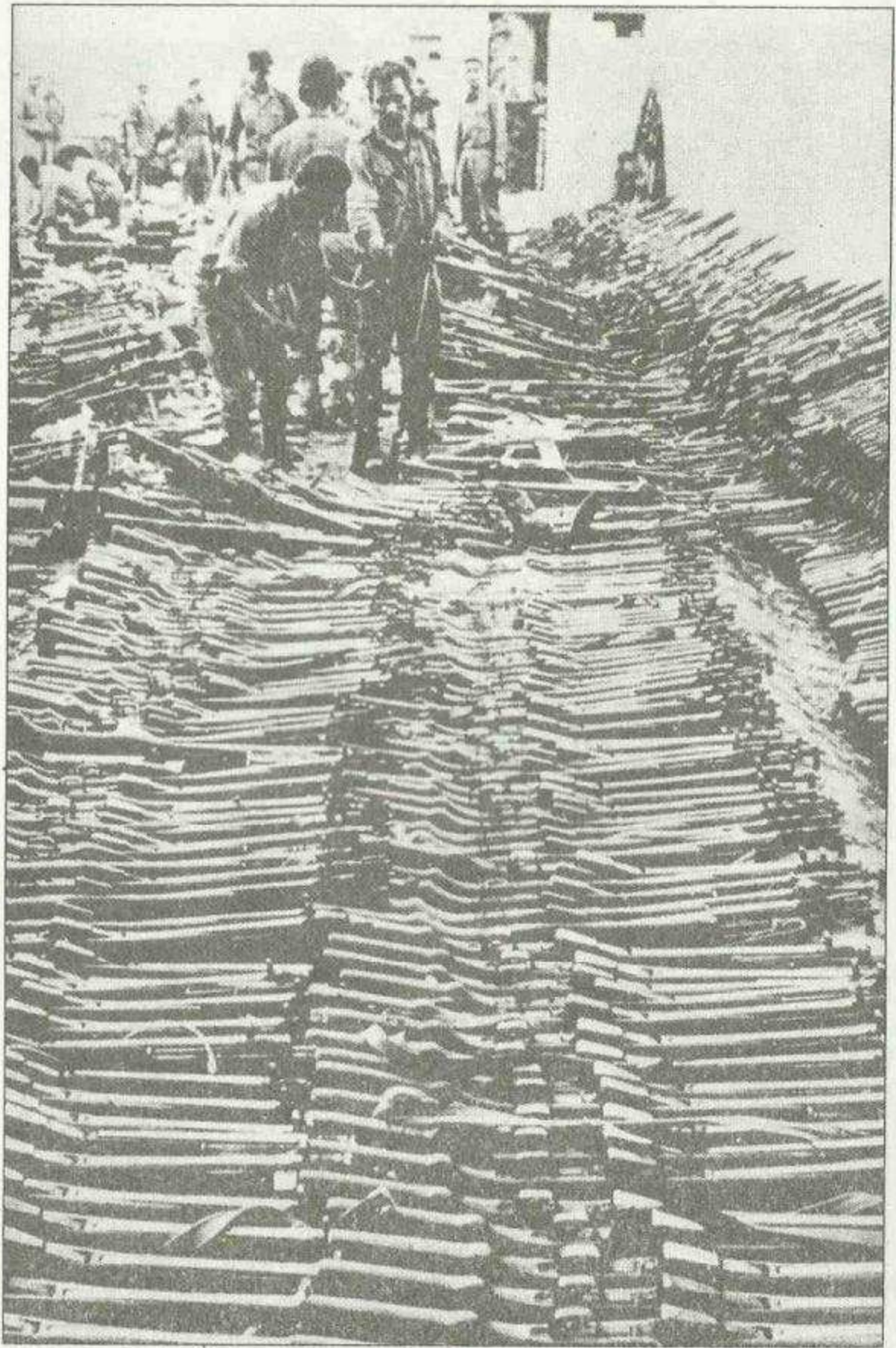
১৬ই ডিসেম্বরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর তাদের আধুনিক মারণাস্ত্রের তালিকা তৈরি করছেন মিত্র বাহিনীর জওয়ানরা

পশ্চিমবঙ্গের শরণার্থী শিবিরে সদ্য বিধবা যুবতীর আহাজারি

বধ্যভূমি থেকে উদ্ধারকৃত মানুষের কঙ্কাল। বাংলাদেশে এ ধরনের বধ্যভূমির সংখ্যা পাঁচ হাজারেরও বেশি
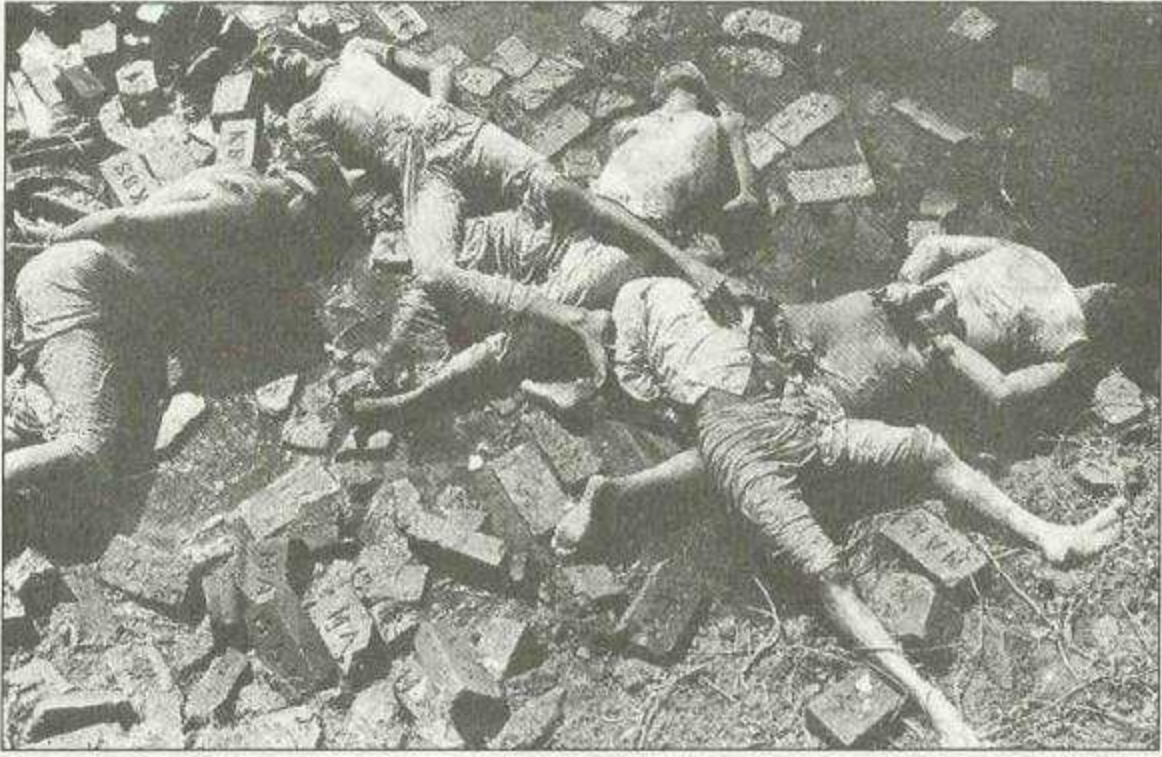
ঢাকার রায়ের বাজারে বুদ্ধিজীবীদের লাশ। পরাজয় অনিবার্য জেনে পাকিস্তানিরা তাদের এদেশীয় দোসর জামাতে ইসলামীর ঘাতক বাহিনী আলবদরের সহযোগিতায় '৭১-এর ১৫ নবেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত তালিকা প্রস্তুত করে হত্যা করে দেশের শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের

পশ্চিমবঙ্গের শরণার্থী শিবিরে সন্তানহারা এক দম্পতি
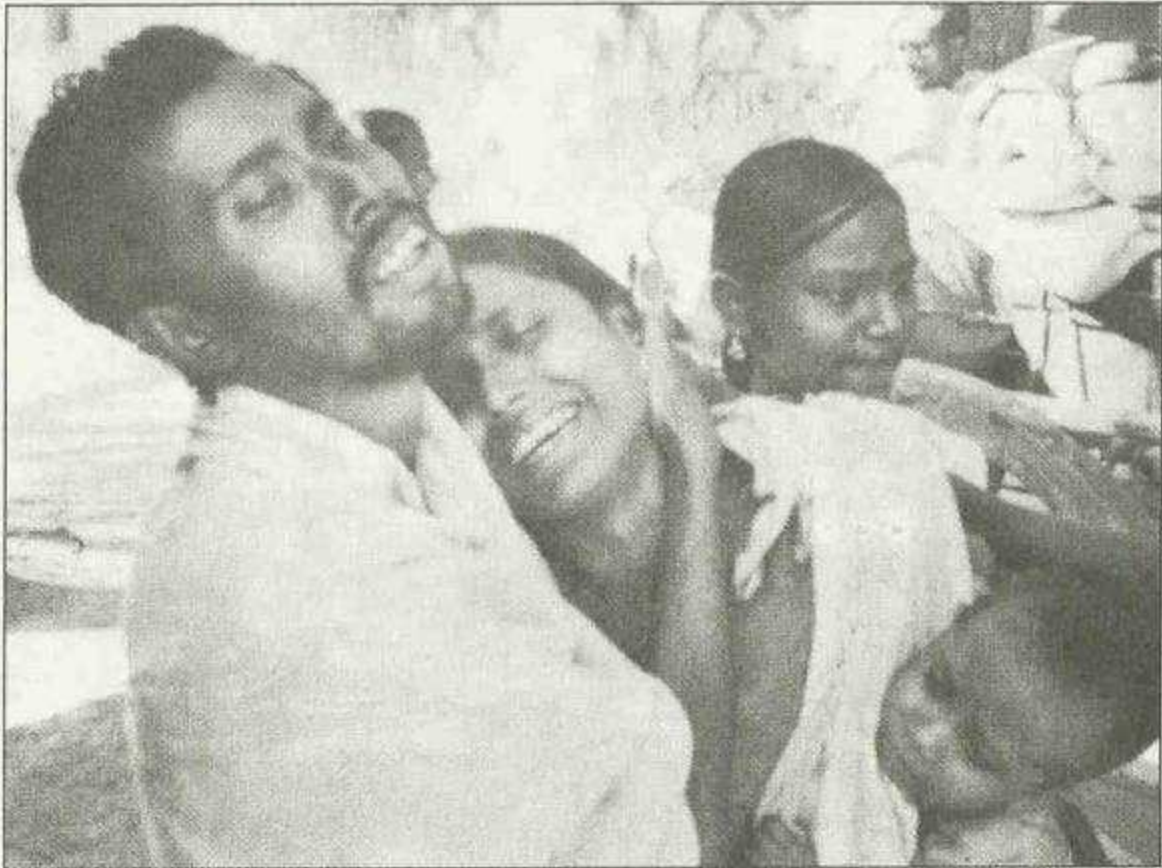
পরিশিষ্ট

১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সরকার প্রথমে ৫০০ পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীর তালিকা প্রস্তুত করেছিল। পরে তা কমিয়ে ২০০ করা হয়। এই তালিকায় শুধু তাদেরই নাম অন্তর্ভুক্ত, যারা যুদ্ধবন্দি হিসেবে তখন ভারতে অবস্থান করছিল। যে কারণে শীর্ষস্থানীয় যুদ্ধাপরাধীদের অনেকের নাম এখানে নেই; যেমন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান, পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল আবদুল হামিদ খান, পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর ও সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল টিক্কা খান, মেজর জেনারেল খাদিম হুসেইন রাজা, মেজর জেনারেল এ ও মিট্ঠা প্রমুখ।

'৭১-এর ২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় 'অপারেশন সার্চ লাইট' পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন মেজর জেনারেল ফরমান আলী ও মেজর জেনারেল খাদিম হুসেইন রাজা। লেঃ জেনারেল টিক্কা খান, মেজর জেনারেল খাদিম হুসেইন রাজা ও মেজর জেনারেল এ ও মিট্ঠা পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণের সময় ঢাকায় না থাকার কারণে তালিকায় তাদের নাম নেই। আমাদের কাছে যে সব প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগী জবানবন্দি দিয়েছেন তাঁরা বেশ কয়েকজন উর্ধতন পাকিস্তানি সামরিক কর্মকর্তার নাম বলেছেন। এদের কারও কারও নাম এই তালিকায় থাকলেও অধিকাংশের নাম বাদ পড়েছে যুদ্ধে মারা যাওয়ার কারণে কিংবা ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশে না থাকার কারণে।

তালিকাভুক্ত ২০০ জন যুদ্ধাপরাধী সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকার যে সংক্ষিপ্ত অভিযোগ নামার খসড়া তৈরি করেছিল তার ভেতর নয়টি আমরা খুঁজে পেয়েছি। বাকিগুলো সম্ভবত তৈরি হয়নি কিংবা হারিয়ে গেছে।

---

১. নাম ঃ **লেঃ জেনারেল নিয়াজী**

২. নং ঃ

৩. ইউনিট ঃ

৪. পদ ঃ সেনা কমান্ডার
বি জোনের সামরিক আইন প্রশাসক

৫. তার বিরুদ্ধে আনিত সুনির্দিষ্ট অভিযোগসমূহ ঃ

অভিযুক্ত ১৯৭১ সালের ১লা মার্চের গোপনে ঢাকা আসে। এরপর সে সামরিক গণহত্যা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত একাধিক উচ্চপর্যায়ের মিটিং-এ অংশগ্রহণ করে। সে অতি গোপনে এ কাজগুলো করে। বি জোনের সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে অভিযুক্ত নিয়াজী অসংখ্য গণধিকৃত এবং সামরিক অভিযান সম্পর্কিত অসংখ্য গণহত্যা পরিকল্পনার নির্দেশ প্রদান করে। এছাড়া বাংলাদেশে সামরিক আধিপত্য বিস্তারের

জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান
পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট

জেনারেল আবদুল হামিদ খান
সামরিক বাহিনীর প্রধান

লেঃ জেনারেল টিক্কা খান
গভর্ণর ও সামরিক আইন প্রশাসক

লেঃ জেনারেল আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী
সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলের অধিনায়ক

মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী
পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণরের উপদেষ্টা

মেজর জেনারেল খাদিম হুসেইন রাজা
জিওসি, পূর্ব পাকিস্তান

সময় তার অধীনস্ত সেনা ও সেনা অফিসাররা যেসব দুষ্কর্মে জড়িত ছিল, সে নিজ দায়িত্বে সেসব অপকর্মের দায়দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেয়। তার অধীনস্ত লোকদের নির্দেশে সেসব গণধর্ষণ ও নারী নির্যাতন হয়েছে সে বিষয়ে অনেক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি পাওয়া গেছে। অভিযোগ পাওয়া গেছে ১২ ডিসেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর '৭১ ধারাবাহিক বাঙালি বুদ্ধিজীবী হত্যার সাথেও নিয়াজী প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বুদ্ধিজীবী হত্যা পরিকল্পনা অংশ হিসেবে পূর্বেই সে উক্ত স্থান পরিদর্শন করে। আরও অভিযোগ আছে, ব্যক্তিগত ভোগ বিলাসের জন্য সে কমপক্ষে ৫০ জন মহিলা ও কিশোরীকে ঢাকায় আটকে রাখে।

৬. আনিত অভিযোগসমূহ ঃ

আগ্রাসী যুদ্ধের ষড়যন্ত্র, গণহত্যার ষড়যন্ত্র, মানবতার বিরুদ্ধে পরিচালিত দুষ্কর্মের ষড়যন্ত্র, গণহত্যা পরিচালনা, সহযোগিতা, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। এছাড়া, নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থতা, মিথ্যা আটক, ধর্ষণ, অপমান ও হুমকি প্রদান, হত্যা এবং অন্যান্য অপরাধের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক নীতিমালা ভঙ্গ।

১. নাম ঃ মেজর জেনারেল ফরমান আলী

২. নং ঃ পি এ ১৩৬৪

৩. ইউনিট ঃ

৪. কর্মস্থল ঃ বি জোনের উপ সামরিক আইন প্রশাসক (১৯৬৯ সালের মার্চ থেকে জুলাই '৭১ পর্যন্ত)। ১৯৭৯-এর জুলাই থেকে মেজর জেনারেল সিভিল এ্যাফেয়ার্স।

৫. কর্মকাণ্ড ঃ সামরিক আইন জারির কাজে বেসামরিক প্রশাসনকে ব্যবহার করা। প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কোন জেলায় বদলি করার আগে তাদের সম্বন্ধে তদন্ত করা; বেসামরিক অথবা গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের সাথে দৈনিক বা সাপ্তাহিক বৈঠকের মাধ্যমে রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুধাবন এবং ইসলামাবাদে সামরিক জান্তার কাছে তা প্রেরণ।

৬. সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ঃ ১৫ মার্চ থেকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে পরিচালিত সকল গোপন বৈঠকে অংশ নেয়া ও বাংলাদেশে সকল সামরিক তৎপরতায় অংশ নেয়া। বাংলাদেশ সামরিক অভিযানের দিনক্ষণ নির্ধারণ ও বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের হত্যা তারই মতামত ও নির্দেশিত মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী কার্যকর হয়।

৭. প্রস্তাবিত অভিযোগ ঃ আগ্রাসী যুদ্ধের ষড়যন্ত্র, গণহত্যা ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের ষড়যন্ত্র, গণহত্যার মত ষড়যন্ত্রে সহযোগিতা, যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতার বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ, গণহত্যা ও মানবতার বিরুদ্ধে পরিচালিত অপরাধ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন।

১. নাম ঃ ব্রিগেডিয়ার মনজুর হোসেন আতিফ

২. নং ঃ পিএ-৩৫৪৭

৩. ইউনিট ঃ

৪. পদ ঃ কুমিল্লার ১১৭ ব্রিগেড কমান্ডার, কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ফেনীর উপসহকারী সামরিক আইন প্রশাসক (এর আগে সে বরিশালে লেঃ কর্ণেল হিসাবে দায়িত্ব পালন করে)।

৫. তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ সমূহ ঃ বরিশালে নির্যাতন ক্যাম্পে যেসব মানুষকে বন্দি

করে রাখা হয়, তাদের ধারাবাহিক হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত আতিক সরাসরি অংশগ্রহণ করে। সে এবং তার অধীনস্থ সৈন্যরা এসব এলাকায় যে ব্যাপক ও বর্বর হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায় তার প্রচুর তথ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে।

৬. প্রস্তাবিত চার্জ ঃ গণহত্যা, হত্যা, গণহত্যার নির্দেশনা, নির্যাতন, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগ পরিচালনা, মিথ্যা আটক ও ডিটেনশন, আন্তর্জাতিক চুক্তি ও আন্তর্জাতিক আইনের গুরুতর লংঘন, নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থতা।

১. নাম ঃ মেজর জেনারেল আনসারী

২. নং ঃ পিএ-৪৪০৪

৩. ইউনিট ঃ

৪. পদ ঃ স্টেশন কমান্ডার, ঢাকা (২৫শে মার্চ '৭১-এর পূর্ব পর্যন্ত)। স্টেশন কমান্ডার, চট্টগ্রাম, ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের স্থলাভিসিক্ত। জিওসি ৯ম ডিভিশন, সেক্টর তিন এর সহকারী সামরিক আইন প্রশাসক।

৫. সুনির্দিষ্ট অভিযোগসমূহ ঃ প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণ অনুযায়ী অভিযুক্ত আনসারী ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ সামরিক অভিযান পরিচালনার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করে। গণহত্যা পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার মত অসংখ্য উচ্চ পর্যায়ের স্টাফ ও অপারেশন প্লান বৈঠকে সে অংশগ্রহণ করে। সে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে কর্মরত বাঙালি সৈন্যদের পরিকল্পিত নিধনযজ্ঞে অংশগ্রহণ ও পরিচালনা করে। ডিভিশনের জিওসি এবং সেকশন তিন-এর উপ-সামরিক আইন প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব নেয়ার কারণে যশোর, ঝিনাইদহ, বরিশাল, খুলনা, মোংলা পোর্ট, সাতক্ষীরা, মাগুরা, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, চুয়াডাঙ্গা, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, ভোলা ও বাগেরহাট সহ ব্যাপক এলাকার দায়িত্ব তার উপর বর্তায়।

১৯৭১-এর জুলাই মাস থেকে আত্মসমর্পণের পূর্ব পর্যন্ত এসব অঞ্চলে প্রত্যক্ষভাবে সে অথবা তার অধীনস্ত সৈন্যরা যে বর্বর হত্যাযজ্ঞ, ধর্ষণ, নির্যাতন ও বন্দিদশা পরিচালনা করে তার অনেক তথ্য প্রমাণ রয়েছে।

৬. প্রস্তাবিত চার্জ ঃ মানবতার বিরুদ্ধে ঘৃণ্য অপরাধ ও হত্যাকাণ্ড সংঘটনের ষড়যন্ত্র, পরিকল্পনা মাফিক গণহত্যা বাস্তবায়ন ও সামরিক অভিযান পরিচালনার নির্দেশ প্রদান, ব্যাপক হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, মিথ্যা আটক ও ডিটেনশন প্রদান।

১. নাম ঃ ক্যাপ্টেন আবদুল ওয়াহিদ

২. নং ঃ পিএসএস-৮৪৬৪

৩. ইউনিট ঃ ৩০ এফ এফ

৪. সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ঃ ১৯৭১-এর ২৫ মার্চের রাতে সামরিক পাক বাহিনী নিরীহ জনগণের উপর হামলার সময় অভিযুক্ত ব্যক্তি ঢাকা শহরে চাকুরিরত ছিল। সেদিন ঢাকায় খুন, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগসহ যেসব দুষ্কর্ম সংঘঠিত হয়, তাতে অভিযুক্তের অংশগ্রহণের প্রমাণ রয়েছে।

৫। উত্থাপিত অভিযোগ ঃ খুন, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ এবং নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গ করা।

১. নাম ঃ মেজর খুরশীদ ওমর

২. নং ঃ পিএ-৪৫৫৩

৩. ইউনিট ঃ (অভিযুক্ত যশোর ক্যান্টনমেন্টের ৬১৪ ফিল্ড ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের সাথে সংযুক্ত ছিল)

৪. কর্মস্থল ঃ

৫. সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ঃ অভিযুক্ত খুরশীদ ওমর '৭১-এর মার্চ মাস থেকে আত্মসমর্পণ করার পূর্ব পর্যন্ত যশোর ক্যান্টনমেন্টের গোয়েন্দা ইউনিটের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। ঐ সময় ঐ এলাকার রাজনৈতিক গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের দায়িত্ব ছিল তার ওপর।

গণহত্যার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বাঙালি সেনা সদস্য এবং বেসামরিক উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদের বিষয়ে গোয়েন্দাগিরি করা এবং এসকল ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করার ঘটনার সাথেও অভিযুক্ত ব্যক্তি জড়িত ছিল। কমপক্ষে ৯০০ ব্যক্তিকে তার নির্দেশে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আনা হয় এবং এদের অনেককেই তার আদেশে বা তত্ত্বাবধানে নির্যাতন করা হয়। এ ধরনের জিজ্ঞাসাবাদের ফলে অনেকেই পরবর্তীতে মারা যায়। নির্যাতনের নিত্য নতুন পন্থা আবিষ্কারের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি ছিল বিশেষজ্ঞ।

৫. উত্থাপিত অভিযোগ ঃ পরিকল্পনা মাফিক গণহত্যা কার্যকর, খুন, নির্যাতন, মিথ্যা গ্রেফতার, বিনাবিচারে আটক রাখা সহ অন্যান্য ঘটনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তির গুরুতর লঙ্ঘন।

১. নাম ঃ মেজর মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্ খান

২. নং ঃ পিটিসি-৫৯১১

৩. ইউনিট ঃ

৪. কর্মস্থল ঃ উপ-সহকারী সামরিক আইন প্রশাসক সাব-সেক্টর-১২, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

৫. সুনির্দিষ্ট অভিযোগসমূহ ঃ ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর-এ অভিযুক্ত ব্যক্তি ব্রাহ্মণবাড়িয়া সাবজেল থেকে ৫০ ব্যক্তিকে বের করে এনে পায়িরতলা ব্রিজের নিকট হত্যা করে। পরবর্তীতে ওই স্থানের মাটি খুড়ে ৪২ জনের লাশ পাওয়া যায়। অনেকে এ ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শী। বুদ্ধিজীবীদের হত্যার পূর্বে লেঃ জেনারেল নিয়াজী এবং মেজর জেনারেল মজিদ খান ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এ স্থানটি পরিদর্শন করে।

ওই গণহত্যা পরিকল্পনার প্রামাণ্য দলিলপত্রও প্রকাশিত হয়েছে।

৬. উত্থাপিত অভিযোগ ঃ গণহত্যা, হত্যাকাণ্ড, মিথ্যা গ্রেফতার সহ অন্যান্য পরিকল্পনা বাস্তবায়ন।

১. নাম ঃ কর্ণেল ইয়াকুব মালিক

২. নং ঃ পিএ-৩৮৩৭

৩. ইউনিট ঃ ৫৩ ফিল্ড আর্টিলারী রেজিমেন্ট (৫৩ ব্রিগেড ১৪ ডিভিশন)

৪. পদ ঃ সিও

৫. সুনির্দিষ্ট অভিযোগসমূহ ঃ ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পূর্বে তার ইউনিটের অবস্থান ছিল কুমিল্লাতে এবং আত্মসমর্পণের পূর্ব পর্যন্ত সেটি বাংলাদেশে অবস্থান করছিল। ২৫ থেকে ২৯ মার্চের মধ্যে তার ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার-এ ৩০০ বাঙালি সৈন্যকে অস্ত্রহীন করে আটকে রাখে। এর বাইরেও ১৬০০ বেসামরিক লোককে আটক করে। ৩০শে মার্চ বন্দিদেরকে ১৫ জন অথবা ২০ জনের গ্রুপে ভাগ করে, বাইরে এনে গুলি করে হত্যা করে। একই রাতে প্যাট্রোমেক্স লাইটদের সহায়তায় মৃতদেহগুলোকে ক্যান্টনমেন্ট এলাকার মধ্যে গণকবর দেয়। এসব কর্মকাণ্ড পরিচালনার পুরো সময়ে অভিযুক্ত কুমিল্লাতে উপস্থিত ছিল। বিশেষ করে যেসব দিনগুলোতে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে, সে সময় ইয়াকুব মালিক হেডকোয়ার্টারে অবস্থান করছিল।

৬. প্রস্তাবিত চার্জ ঃ পরিকল্পিত গণহত্যা বাস্তবায়ন, নির্বিচারে হত্যা, নির্যাতন, আন্তর্জাতিক চুক্তির গুরুতর লংঘন, মিথ্যা আটক ও ডিটেনশন।

১. নাম ঃ লেঃ কর্ণেল সামস্-উল-সামস (কর্ণেল সামস্ নামেও পরিচিত)

২. নং ঃ পিএ-৪৭৪৫

৩. ইউনিট ঃ ২২ এফএফআর এবং ইনফ্যানট্রি ব্যাটেলিয়ন (১০৭ ব্রিগেড, ১৪ ডিভিশন)

৪. পদ ঃ ১৯৭১ সালের জুন পর্যন্ত খুলনাতে সহকারী সাব মার্শাল ল এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর।

৫. বিস্তারিত অপরাধসমূহ ঃ ১৯৭১-এর ২৫ মার্চের পূর্ব পর্যন্ত অভিযুক্তের কর্মস্থল ছিল যশোর। পরে সে খুলনাতে যায় এবং ধারণা করা হয় কখনও কখনও সে যশোর ফিরে আসত। বাংলাদেশের দুঃসহ দিনগুলোতে সে খুলনাতে ছিল। তার বিরুদ্ধে যশোর ও খুলনাতে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞের প্রমাণ রয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় '৭১-এর ৪ মার্চ সে সদলবলে যশোর শহরের চাচড়া মহল্লায় নির্বিচারে গুলি করে ২৫০ জনকে হত্যা করে। ওই বছরের মার্চ থেকে মে পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন দলে প্রায় ২০০০ ব্যক্তিকে নিয়ে আসে, খুলনা সার্কিট হাউস ক্যাম্পে আটকে রেখে নির্যাতন করে এবং সার্কিট হাউস থেকে ২০০ গজ দূরে ফরেস্ট ঘাটে নিয়ে তাদের নির্মমভাবে হত্যা করে। এ সময়ে অভিযুক্ত সামস্ সার্কিট হাউজেই থাকত এবং সশরীরে নির্যাতন চেম্বার পরিদর্শন করত।

৬. প্রস্তাবিত চার্জ ঃ পরিকল্পিত গণহত্যা বাস্তবায়ন, নির্বিচারে হত্যা, নির্যাতন, আন্তর্জাতিক চুক্তির গুরুতর লংঘন, মিথ্যা আটক ও ডিটেনশন সহ অন্যান্য চার্জ।

যুদ্ধবন্দিদের ভেতর অভিযুক্ত পাকিস্তানি সামরিক কর্মকর্তাদের তালিকা

ক্রমিক	যুদ্ধবন্দি নং	পিএ নং	পদ	নাম	ইউনিট	মন্তব্য
১।	১	পিএ-৪৭৭	লেঃ জেনারেল	আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজী	ইস্ট কমান্ড	বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তারা গণহত্যা পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে, যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ঘটায়
২।	২	পিএ-১১৭০	মেজর জেনারেল	নাজার হোসেন শাহ	১৬ ডিভিশন	ঐ
৩।	৩	পিএ-৪৪০৪	মেজর জেনারেল	মোহাম্মদ হোসেন আনসারী	৯ম ডিভিশন	ঐ
৪।	৪	পিএ-৮৮২	মেজর জেনারেল	মোহাম্মদ জামশেদ	ডিজিইপিক্যাফ	ঐ
৫।	৫	পিএ-১৭৩৪	মেজর জেনারেল	কাজী আঃ মজিদ খান	১৪ ডিভিশন	ঐ
৬।	৬	পিএ-১৩৬৪	মেজর জেনারেল	রাও ফরমান আলী খান	বেসামরিক বিষয়ক মেজর জেনারেল ও পূর্ব পাকিস্তান গভর্ণরের উপদেষ্টা	ঐ
৭।	৭	পিএ-১৬৭৪	ব্রিগেডিয়ার	আব্দুল কাদির খান	৯৩ ব্রিগেড (বিডিই)	ঐ
৮।	৮	পিএ-২২৩৫	ব্রিগেডিয়ার	আরিফ রাজা	সিগনাল হেডকোয়ার্টার	ঐ
৯।	৯	পিএ-১১০৯	ব্রিগেডিয়ার	আতা মোহাম্মদ খান মালিক	৭ ব্রিগেড	ঐ
১০।	১১	পিএ-১৮৯৭	ব্রিগেডিয়ার	বশির আহমেদ	সি এ এফ	ঐ
১১।	১২	পিএ-১০০০৮৮	ব্রিগেডিয়ার	ফাহিম আহমেদ খান	ইসি হেডকোয়ার্টার	ঐ
১২।	১৩	পিএ-১৭৩৮	ব্রিগেডিয়ার	ইফতেখার আহমেদ রানা	৩১৩ ব্রিগেড	ঐ
১৩।	১৬	পিএ-৩৪১৪	ব্রিগেডিয়ার	মনজুর আহমেদ	৫৭ ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার	ঐ
১৪।	১৭	পিএ-৩৫৪৭	ব্রিগেডিয়ার	মনজুর হোসেন আতিফ	১১৭ ব্রিগেড	ঐ

১৫।	১৮	পিএ-২১১১	ব্রিগেডিয়ার	মিয়া মুনসুর মোহাম্মদ	৩৯ ডিভিশন	ঐ
১৬।	১৯	পিএ-১১৪৮	ব্রিগেডিয়ার	মিয়া তাসকিন উদ্দীন	৯১ ব্রিগেড	ঐ
১৭।	২০	পিএ-২৭২৯	ব্রিগেডিয়ার	মীর আবদুল নাঈম	৩৪ ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার	ঐ
১৮।	২২	পিএ-১৯৯৯	ব্রিগেডিয়ার	মোহাম্মদ আসলাম	৫৩ ব্রিগেড	ঐ
১৯।	২৩	পিএ-২১০৩	ব্রিগেডিয়ার	মোহাম্মদ হায়াৎ	১০৭/৪০৭ ব্রিগেড	ঐ
২০।	২৪	পিএ-১০৪৪	ব্রিগেডিয়ার	মোহাম্মদ শফি	২৩ ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার	ঐ
২১।	২৫	পিএ-১৭০২	ব্রিগেডিয়ার	এন এ আশরাফ	সিএমডি নাটোর গ্যারিশন	ঐ
২২।	২৬	পিএ-৩৪৩০	ব্রিগেডিয়ার	এস এ আনসারী	রংপুর গ্যারিশন	ঐ
২৩।	২৭	পিএ-৩৫৪৮	ব্রিগেডিয়ার	সাদ উল্লাহ্ খান এস জে	২৭ ব্রিগেড	ঐ
২৪।	২৮	পিএ-১৮৮০	ব্রিগেডিয়ার	সৈয়দ আস্গর হাসান	সিলেট ফোর্স	ঐ
২৫।	২৯	পিএ-২১১০	ব্রিগেডিয়ার	সৈয়দ শাহ্ আবুল কাশম	সি সি আর্টিলারী ইসিও	ঐ
২৬।	৩০	পিএ-২১৩০	ব্রিগেডিয়ার	তাজাম্মাল হোসেন মালিক	২০৫ ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার	ঐ
২৭।	৩৫	পিএ-১৮১৭	কর্ণেল	ফজলে হামিদ	৩১৪ ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার	ঐ
২৮।	৩৭	পিএ-৩৭৯৯	কর্ণেল	কে কে আফ্রিদি	৯ ডিভিশন	ঐ
২৯।	৪৪	পিএ-১৯৬৩	কর্ণেল	মোহাম্মদ খান	আই এস আই	ঐ
৩০।	৪৫	পিএ-১০০১১৫	কর্ণেল	মোহাম্মদ মোশারফ আলী	১৪ প্রশাসনিক ডিভিশন	ঐ
৩১।	৫৮	পিএ-২২০০	লেঃ কর্ণেল	আব্দুল গাফফার	হেড কোঃ এসআইজিইএ	ঐ
৩২।	৬৭	পিএ-৪৪৮৯	লেঃ কর্ণেল	আফতাব হোসেন কোরায়েশী	৩৩ বেলুচ	ঐ
৩৩।	৫৭	পিএ-৩৫৬৮	লেঃ কর্ণেল	আব্দুল রেহমান আওয়ান	সিএএফ	ঐ
৩৪।	৬০	পিএ-৩৩৪৭	লেঃ কর্ণেল	আব্দুল হামিদ খান	মার্শাল ল হেডকোয়ার্টার	ঐ
৩৫।	৬৫	পিএ-৪০৮৭	লেঃ কর্ণেল	আবদুল্লাহ খান	ইপিক্যাফ	ঐ
৩৬।	৬৮	পিটিসি-৪৩১৮	লেঃ কর্ণেল	আহমেদ মোক্তার খান	৩০ এফ এফ	ঐ
৩৭।	৭২	পিএ-৪০৬২	লেঃ কর্ণেল	আমীর মোহাম্মদ খান	৭ সেকশন মার্শাল ল	ঐ

৩৮।	৭৪	পিটিসি-৪৩২৯	লেঃ কর্ণেল	আমীর নেওয়াজ খান	১৩ এফ এফ	ঐ
৩৯।	৭৩	পিএ-৫০২৭	লেঃ কর্ণেল	আমীর মোহাম্মদ খান	৩৪ পাঞ্জাব	ঐ
৪০।	৫৫	পিএ-৪৭৪৫	লেঃ কর্ণেল	এ সামস উল জামান	২২ এফ এফ	ঐ
৪১।	৭৮	পিএ-৪৬০৮	লেঃ কর্ণেল	আশিক হোসাইন	২৪ এফ এফ	ঐ
৪২।	৮১	পিএ-৩২৪৮	লেঃ কর্ণেল	আজিজ খান	৩২ বেলুচ	ঐ
৪৩।	২০২	পিটিসি-৩২৩৯	লেঃ কর্ণেল	গোলাম ইয়াসিন সিদ্দিকী	স্টেশন হেডকোঃ, ঢাকা এএ এবং কিউ এম জি	ঐ
৪৪।	৯৭	পিটিসি-৩৭১১	লেঃ কর্ণেল	ইসারত আলী আলাভী	১৪ হেডঃ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন	ঐ
৪৫।	১৬৭	পিএ-৪৪৪১	লেঃ কর্ণেল	মুক্তার আলম হিজাজী	ইপিক্যাফ	ঐ
৪৬।	১৭০	পিএ-৩৬০০	লেঃ কর্ণেল	মুস্তাফা আনোয়ার	১৫ বেলুচ	ঐ
৪৭।	১১৬	পিএ-৪১০০	লেঃ কর্ণেল	এম আর কে মির্জা	৩৩ পাঞ্জাব	ঐ
৪৮।	১২৮	পিএ-৪৩০১	লেঃ কর্ণেল	মতলুব হোসেন	১৮ পাঞ্জাব	ঐ
৪৯।	১৪০	পিএ-২৭০০	লেঃ কর্ণেল	মোঃ আকরাম	তচি স্কাউট	ঐ
৫০।	১৫২	পিএসএস-২৫৯০	লেঃ কর্ণেল	মোহাম্মদ আকবর	ইপিক্যাফ	ঐ
৫১।	১৪৭	পিটিসি-৩৬৪৫	লেঃ কর্ণেল	মোহাম্মদ নেওয়াজ	১৫ বেলুচ	ঐ
৫২।	১৬৯	পিএ-৪৪৬৬	লেঃ কর্ণেল	মুস্তাজ মালিক	ইস্ট কমান্ড হেড কোয়াঃ	ঐ
৫৩।	১৩৮	পিএ-৪৪১৬	লেঃ কর্ণেল	এম এম এম বাইজ	৮ বেলুচ	ঐ
৫৪।	৪৮	পিএ-১০০২০৭	কর্ণেল	মোহাম্মদ মতিন	৭২	ঐ
৫৫।	১২৯	পিএ-২৯১৭	লেঃ কর্ণেল	মাজহার হোসেন চৌহান	আই এস এস সি	ঐ
৫৬।	১৬৮	পিএ-৩৬১০	লেঃ কর্ণেল	মোক্তার আহমেদ সাঈদ	মার্শাল ল এ্যাডঃ হেড কোঃ	ঐ
৫৭।	১৭১	পিএসএস-২৮৯৯	লেঃ কর্ণেল	মুস্তাফাজান	মার্শাল ল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন জোন হেডকোয়ার্টার	ঐ
৫৮।	১৭৫	পিএ-২৮২১	লেঃ কর্ণেল	ওমান আলী খান	জরিপ বিভাগ	ঐ

৫৯।	১৮০	পিএ-৫০৭৪	লেঃ কর্ণেল	রিয়াজ হোসেন জাভেদ	৩১ পাঞ্জাব	ঐ
৬০।	১৭৮	পিএ-৪৫৫০	লেঃ কর্ণেল	রশিদ আহমেদ	ইপিক্যাফ হেড কোয়াঃ	ঐ
৬১।	১৯৬	পিএ-৪৮১৭	লেঃ কর্ণেল	শেখ মোহাম্মদ নাঈম	৩৯ বেলুচ	ঐ
৬২।	১৯২	পিএ-৩৯৩২	লেঃ কর্ণেল	সরফরাজ খান মালিক	৩১ পাঞ্জাব	ঐ
৬৩।	১৮১	পিএ-৪৯২০	লেঃ কর্ণেল	এস এফ এইচ রিজভী	৩২ পাঞ্জাব	ঐ
৬৪।	১৮২	পিএ-৪৫৬০	লেঃ কর্ণেল	এ এইচ বোখারী	২৯ সিএভি	ঐ
৬৫।	২০৫	পিএ-৪৩৬৮	লেঃ কর্ণেল	সৈয়দ হামিদ শফি	প্রতিরক্ষা ক্রয়	ঐ
৬৬।	২০১	পিএ-৩৮১৭	লেঃ কর্ণেল	সুলতান বাদশা	৮ ইপিক্যাফ	ঐ
৬৭।	২০০	পিএ-৫১৭৪	লেঃ কর্ণেল	সুলতান আহমেদ	৩১ বেলুচ	ঐ
৬৮।	১৯৯	পিএ-৪৫১৮	লেঃ কর্ণেল	এস আর এইচ এস জাফরী	সিগন্যাল ইএ হেড কোঃ	ঐ
৬৯।	২১৬	পিএসএস-৩৭৪৩	লেঃ কর্ণেল	জাহিদ আগা খান	ইএফ লগ হেড কোয়াঃ	যুদ্ধ আইন, রীতিনীতি ও আচরণ লঙ্ঘন করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ব্যাপক গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে ঘৃণ্য অপরাধ সংঘটিত করে
৭০।	১২২	পিএ-৩৮৩৭	লেঃ কর্ণেল	এম ওয়াই মালিক	১৪ ডিভিশন হেড কোয়াঃ	ঐ
৭১।	২৩১	পিএ-৭০৫৯	মেজর	আব্দুল গফ্রান	ইস্ট কমান্ড	ঐ
৭২।	২৮৪	পিএ-৫৬৪০	মেজর	আনিস আহমেদ	২০৫ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড হেঃ	ঐ
৭৩।	২৯০	পিএ-৭২১৪	মেজর	আরিফ জাভেদ	২২ ক্যাভ	ঐ
৭৪।	৩০৪	পিএ-৬৭৩৬	মেজর	আতা মোহাম্মদ	২৯ বেলুচ	ঐ
৭৫।	২৩৩	পিএসএস-৮৩৯৪	মেজর	আব্দুল হামিদ	৩১ পাঞ্জাব	ঐ
৭৬।	৩০১	পিএ-৭২৯৯	মেজর	এ এস পি কোরায়েশী	২৫ পাঞ্জাব	ঐ
৭৭।	২৯৪	পিএ-৭৫৩০	মেজর	আশফাক আহমেদ চীমা	৩৯ বেলুচ	ঐ

৭৮।	২৪১	পিএসএস-৮৫৪৭	মেজর	আব্দুল খালেক কায়ানী	৬ পাঞ্জাব	ঐ
৭৯।	২৫৬	পিটিসি-৪৬৬৪	মেজর	আব্দুল ওয়াহিদ মুঘল	২২ বেলুচ	ঐ
৮০।	২৩৫	পিএ-৩৮৩৮	মেজর	আব্দুল হামিদ খট্‌ক	মার্শাল ল হেড কোয়াঃ	ঐ
৮১।	২৬২	পিএ-৭২৫১	মেজর	আহমেদ হাসান খান	ইপিক্যাফ	ঐ
৮২।	২৮৩	পিআরআর-৪৪৩৮	মেজর	আনিস আহমেদ খান	১৫ বেলুচ	ঐ
৮৩।	২৫৫	পিএ-৪৯৯০	মেজর	আব্দুল ওয়াহিদ খান	৩১ বেলুচ	ঐ
৮৪।	৩২০	পিএ-৫৮৬৮	মেজর	সি এইচ মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর	মার্শাল ল এ্যাডঃ জোন বি হেডকোয়ার্টার	ঐ
৮৫।	৩৪৮	পিএ-৪১২২	মেজর	গোলাম মোহাম্মদ	২ বেলুচ	ঐ
৮৬।	৩৫৮	পিটিসি-৪৩৯০	মেজর	গোলাম আহমেদ	ইপিক্যাফ	ঐ
৮৭।	৩৪৪	পিএ-৭৪৩৯	মেজর	গজনফার আলী নাসির	ইপিক্যাফ	ঐ
৮৮।	৩৬৩	পিএ-৬৯৫৯	মেজর	হাদী হোসাইন	২৪ এফ এফ	ঐ
৮৯।	৩৬৭	পিএ-৬৬৪৬	মেজর	হাসান মুজতবা	৮ বেলুচ	ঐ
৯০।	৩৭৬	পিটিসি-৫৭৩৩	মেজর	ইফতেখার উদ্দীন আহমেদ	৩৩ বেলুচ	ঐ
৯১।	৩৭৪	পিএ-৬৭২৯	মেজর	ইফতেখার আহমেদ	৮ পাঞ্জাব	ঐ
৯২।	৭১২	পিএ-৫২৫০	মেজর	শাহ মোহাম্মদ ওসমান ফারুকী	৭ সিগনাল ব্যাটেলিয়ন	ঐ
৯৩।	৪১৯	পিএ-৪৫৫৩	মেজর	খুরশিদ ওমান	৮১৪ এফআইইউ	ঐ
৯৪।	৪২৩	পিটিসি-৩৯৪৭	মেজর	খুরশিদ আলী	জরিপ বিভাগ	ঐ
৯৫।	৪১৪	পিএ-৭৫৭৬	মেজর	খিজার হায়াৎ	৪ এফ এফ	ঐ
৯৬।	৪৮৫	পিএ-৭৬৫৭	মেজর	মেহের মোহাম্মদ খান	৩১ বেলুচ	ঐ
৯৭।	৪৩১	পিটিসি-৫৯১১	মেজর	মোহাম্মদ আবদুল্লাহ খান	২৭ ব্রিগেড	ঐ
৯৮।	৫৩৩	পিএ-৭২৫৩	মেজর	মোহাম্মদ আফজাল	৮ বেলুচ	ঐ
৯৯।	৪৪১	পিএ-৭৪০৫	মেজর	মোহাম্মদ ইসহাক	ইপিক্যাফ	ঐ

১০০।	৫৫৩	পিটিসি-৩২৪৬	মেজর	মোহাম্মদ হাফিজ রাজা	৩৪ পাঞ্জাব	ঐ
১০১।	৫৯৫	পিএ-৬৮৭০	মেজর	মোহাম্মদ ইউনাস	৩২ পাঞ্জাব	ঐ
১০২।	৫০৪	পিএ-৬৭৯৩	মেজর	মোহাম্মদ আমিন	১০৭ ব্রিগেড হেড কোঃ	ঐ
১০৩।	৪৮১	পিএস-৩৯৩৫? ২৯৩৫	মেজর	মোহাম্মদ লোদী	নাটোর গ্যারিশন	ঐ
১০৪।	৪৯৩	পিএ-৬৫৫৪	মেজর	মির্জা আনোয়ার বেগ	৮৮ অর্ডিন্যান্স সিওওয়াই	ঐ
১০৫।	৪২৮	পিটিসি-৪১৫৭	মেজর	এম এ কে লোদী	১৬ ডিভিশন হেড কোয়াঃ	ঐ
১০৬।	৪৫৯	পিএসএস-৪২৪৫	মেজর	মাদাদ হোসেন শাহ	১৮ পাঞ্জাব	ঐ
১০৭।	৫৪৪	পিটিসি-৩০০৭	মেজর	মোঃ আয়ুব খান	৯৭ ব্রিগেড	ঐ
১০৮।	৫৮৬	পিএসএস-৬১১০	মেজর	মোঃ শরীফ আরাইন	৩৩ পাঞ্জাব	ঐ
১০৯।	৫৫৫	পিএ-৫৯৬৪	মেজর	মোহাম্মদ ইফতিখার খান	২০২ ব্রিগেড হেড কোঃ	ঐ
১১০।	৪৫৫	পিএ-২৮১৮	মেজর	এম. ইয়াহিয়া হামিদ খান	৬ পাঞ্জাব	ঐ
১১১।	৫৯২	পিএসএস-৬১৫০	মেজর	মোহাম্মদ ইয়ামিন	এ এস সি	ঐ
১১২।	৫২৭	পিএ-৫১৪১	মেজর	মোহাম্মদ গজনফার	আই এস এস সি	ঐ
১১৩।	৫৮৩	পিএ-৭২৩১	মেজর	মোহাম্মদ সারওয়ার	৩৩ পাঞ্জাব	ঐ
১১৪।	৫৭৯	পিটিসি-৩০১৬	মেজর	মোহাম্মদ সিদ্দিকী	২০৫ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড হেঃ	ঐ
১১৫।	৫৪৩	পিএসএস-৬০৯২	মেজর	মোহাম্মদ আশরাফ	ইপিক্যাফ হেড কোয়ার্টার	ঐ
১১৬।	৫০৬	পিএসএস-৪৬৩৪	মেজর	মোহাম্মদ আশরাফ খান	৫৩ ব্রিগেড হেড কোয়াঃ	ঐ
১১৭।	৬০৪	পিএ-৫৩১২	মেজর	মোহাম্মদ সাফদার	আই এস এস সি	ঐ
১১৮।	৪৯৬	পিএ-৬০৬৭	মেজর	এম এম ইস্পাহানি	ইস্টার্ণ কমান্ড হেড কোঃ	ঐ
১১৯।	৫৬২	পিএ-৬৪৪০	মেজর	মোহাম্মদ জামিল	ইপিক্যাফ	ঐ
১২০।	৫৮০	পিএ-৭৫৫৯	মেজর	মোহাম্মদ শফি	৩২ পাঞ্জাব	ঐ
১২১।	৫৪৭	পিএসএস-৪৩২০	মেজর	মোহাম্মদ আজীম কুরায়েশী কুরেস	আই এস এস সি	ঐ

১২২।	৫২৫	পিএ-৬৪৬০	মেজর	মোহাম্মদ জুলফিকার রাথোর	১৩ ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটেলিয়ন	ঐ
১২৩।	৬১৫	পিএ-৫৯৬২	মেজর	মুস্তাক আহমেদ	৬৩০ এ এস সি	ঐ
১২৪।	৬৩৪	পিএসএস-৭৯৯৬	মেজর	নাসিরা খান	২৬ এফ এফ	ঐ
১২৫।	৬৩২	পিএ-৪৭৪৮	মেজর	নাসির আহমেদ	৪০৯ GHQ FIU	ঐ
১২৬।	৬৫৪	পিটিসি-৪৬৩২	মেজর	রানা জহুর মোহাইদ্বীন খান	১৮ পাঞ্জাব	ঐ
১২৭।	৬৬৬	পিএ-৮৬৫৫	মেজর	রিফাত মাহমুদ	৩১ ফিল্ড রেজিমেন্ট	ঐ
১২৮।	৬৬৭	পিএসএস-৬১৪৮	মেজর	রুস্তম আলী	৩১৪ ব্রিগেড হেড কোঃ	ঐ
১২৯।	৬৫১	এসিও-৩৯০	মেজর	আর এম মুমতাজ খান	৩১ বেলুচ	ঐ
১৩০।	৭০২	পিএ-৬০৬৩	মেজর	সর্দার খান	মার্শাল ল এ্যাডঃ হেডঃ কোঃ	ঐ
১৩১।	৫১০	এসিও-২০৯৯	মেজর	মোহাম্মদ আযম খান	১২ এ কে	ঐ
১৩২।	৬৮৬	পিআরআর-৩৩৮৯	মেজর	সাইফ উল্লাহ খান	আই এস এস সি	ঐ
১৩৩।	৬৭৪	পিএ-৬৮৯৩	মেজর	এস টি হোসেন	৭৩৪ এফআইসি	ঐ
১৩৪।	৭৩০	পিএসএস-৪২২৪	মেজর	এস এম এইচ এস বোখারী	২৪ এফ এফ	ঐ
১৩৫।	৬৮৯	পিএসএস-৮০১৫	মেজর	সাজিদ মাহমুদ	৩২ পাঞ্জাব	ঐ
১৩৬।	৭২৩	পিএ-৭৪১৫	মেজর	শের উর রেহমান	২৯ ক্যাভ	ঐ
১৩৭।	৬৯৫	পিটিসি-৫৯৩০	মেজর	সালামত আলী	ইপিক্যাফ	ঐ
১৩৮।	৬৯০	পিএ-৬৮৫৮	মেজর	সাজ্জাদ আক্তার মালিক	আই এস আই	ঐ
১৩৯।	৬৯৮	পিএ-৫৬৮৪	মেজর	সালিম এনায়েত খান	৫৭ মার্শাল ল হেঃ জোন বি	ঐ
১৪০।	৭৩৫	পিএ-৭২৮৯	মেজর	সুলতান সাউদ	ইপিক্যাপ	ঐ
১৪১।	৭০৫	পিএ-৬৫৪২	মেজর	সরফরাজ উদ্দীন	আই এস আই	ঐ
১৪২।	৭২০	পিএ-৫০৮০	মেজর	শওকাতুল্লাহ খট্‌ক	৩৬ সিগনাল ব্যাটেলিয়ন	ঐ
১৪৩।	৭৩৭	পিএ-৭৪২৮	মেজর	সুলতান সুরখো আওয়ান	৩৩ পাঞ্জাব	ঐ
১৪৪।	৭০৪	পিএ-৭০৭৬	মেজর	সরফরাজ আলম	ইপিক্যাফ	ঐ

১৪৫।	৭০৬	পিএ-৬৮৫১	মেজর	সারওয়ার খান	তচি স্কাউট	ঐ
১৪৬।	৭৫৬	পিএ-৬২৭২	মেজর	তাফায়ের-উল-ইসলাম	নাটোর হেড কোয়ার্টার	ঐ
১৪৭।	৭৮৫	পিএসএস-৮১২৪	মেজর	জাওমুল মালুক	১৮ পাঞ্জাব	ঐ
১৪৮।	৮০৬	পিএসএস-৮৪৬৪	ক্যাপ্টেন	আব্দুল ওয়াহিদ	৩০ এফ এফ	ঐ
১৪৯।	৮১৭	পিএ-১০২০২	ক্যাপ্টেন	আফতাব আহমাদ	৩১ বেলুচ	ঐ
১৫০।	৮৫৮	পিএএস-৮৮৩৬	ক্যাপ্টেন	আরিফ হোসেন শাহ	আর্টিলারী ইআইজেডআই ইএমডি	ঐ
১৫১।	৮১৫	পিএসএস-৯৬৩৪	ক্যাপ্টেন	আবরার হোসেন	৩০ এফ এফ	ঐ
১৫২।	৮৫৩	পিএসএস-৯৯৫৯	ক্যাপ্টেন	আমজাদ সাব্বির বোখারী	৩১ ফিল্ড রেজিঃ আর্টিলারী	ঐ
১৫৩।	৮৭৬	পিএ-১০১২৯	ক্যাপ্টেন	আওসাফ আহমেদ	৫৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট	ঐ
১৫৪।	৭৫০৮৯	পিএ-১০১৮৫	ক্যাপ্টেন	আব্দুল কাহার	ইপিক্যাপ	ঐ
১৫৫।	৮৬৯	পিএ-১০৯৮৫	ক্যাপ্টেন	আশরাফ মির্জা	১২ একে ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটেঃ	ঐ
১৫৬।	৮০২	পিএসএস-৯৯০৪	ক্যাপ্টেন	আব্দুল রশিদ নায়ার	১৯ সিগনাল ব্যাটেলিয়ন	ঐ
১৫৭।	৮৪৯	পিএসএস-৮০০৫	ক্যাপ্টেন	আমান উল্লাহ	নাটোর গ্যারিশন হেডকোঃ	ঐ
১৫৮।	৮৮২	পিএসএস-৯৩৬৩	ক্যাপ্টেন	আজিজ আহমেদ	৩১ ফিল্ড রেজিমেন্ট	ঐ
১৫৯।	২২১	পিএসএস-৯৪৪০	ক্যাপ্টেন	গুলফ্রাজ খান আব্বাসী	২২ এফ এফ	ঐ
১৬০।	৯৫১	পিএসএস-৮১৪৪	ক্যাপ্টেন	ইকরামুল হক	২৯ ক্যাভ	ঐ
১৬১।	৯৪৭	পিএ-১০২৪১	ক্যাপ্টেন	ইজাজ আহমেদ চীমা	আই এস আই	ঐ
১৬২।	৯৪১	৮৮৬৭	ক্যাপ্টেন	ইফতেখার আহমেদ গোনদাল	৩১ পাঞ্জাব	ঐ
১৬৩।	৯৬৪	পিএসএস-৮৮২১	ক্যাপ্টেন	ইসহাক পারভেজ	২৪ এফ এফ	ঐ
১৬৪।	৯৬০	পিএসএস-৯৬১৪	ক্যাপ্টেন	ইকবাল শাহ	২৯ ক্যাভ	ঐ
১৬৫।	৯৭৬	পিএসএস-৬৯১০	ক্যাপ্টেন	জাভেদ ইকবাল	৩৩ বেলুচ	ঐ
১৬৬।	৯৭২	পিএসএস-৯৭৬৫	ক্যাপ্টেন	জাহাঙ্গীর কোয়ানী	আর এফ টি ক্যাম্প	ঐ

১৬৭।	৯৮৫	পিএ-৭৮৩৮	ক্যাপ্টেন	করম খান	৩১৫ ব্রিগেড হেড কোয়াঃ	ঐ
১৬৮।	১০৪৭	পিএ-১১৫৫৪	ক্যাপ্টেন	মনজার আমিন	২৫ এফ এফ	ঐ
১৬৯।	১২৫৫	পিএসএস-৯৩৮৭	ক্যাপ্টেন	মোজাফফর হোসেন নাকভী	১৮ পাঞ্জাব	ঐ
১৭০।	১১৭৮	পিএ-১১৫৫১	ক্যাপ্টেন	মোহাম্মদ সাজ্জাদ	৮০ ফিল্ড রেজিমেন্ট	ঐ
১৭১।	১২০১	পিএসএস-৮৮২০	ক্যাপ্টেন	মোহাম্মদ জাকির রাজা	আইএসএস সি	ঐ
				(মোঃ জাকার খান, আর্টিলারী)		
১৭২।	১১২৬	পিএ-৭৮৬২	ক্যাপ্টেন	মোঃ আরিফ	১৪ ডিভিশন হেড কোঃ	ঐ
১৭৩।	১১৩১	পিএসএস-৯০১৮	ক্যাপ্টেন	মোহাম্মদ আশরাফ	১২ পাঞ্জাব	ঐ
১৭৪।	১১৪৯	পিএসএস-৮৯৭৭	ক্যাপ্টেন	মোহাম্মদ ইকবাল	১২ পাঞ্জাব	ঐ
১৭৫।	১০৯৬	পিএসএস-৯৯২৭	ক্যাপ্টেন	মোহাম্মদ রফী মুনির	১৮ পাঞ্জাব	ঐ
১৭৬।	১১৫৯	পিএসসি-১০২৮৭	ক্যাপ্টেন	মোহাম্মদ জামিল	৬ পাঞ্জাব	ঐ
১৭৭।	১২৩৮	পিএসএস-৯০৭৭	ক্যাপ্টেন	নাঈম সাদিক	৪০৯ এফআইইউ হেড কোঃ	ঐ
১৭৮।	১৩৫১	পিএসএস-৯৪৫৪	ক্যাপ্টেন	শের আলী	৩৯ বেলুচ	ঐ
১৭৯।	১৩২২	পিএসসি-৮০৯৩	ক্যাপ্টেন	সালমান মাহমুদ	২৬ এফ এফ	ঐ
১৮০।	১৩২৫	পিএ-১১০০৯	ক্যাপ্টেন	সামশেদ সারোয়ার	আর এল এফ ক্যাম্প	ঐ
১৮১।	১৩৪৩	পিএসএস-৭৭৪৫	ক্যাপ্টেন	শহীদ রেহমান	২৯ ক্যাভ	ঐ
১৮২।	১৩২১	পিএসএস-১০৪৩১	ক্যাপ্টেন	সালেহ হুসাইন	১৮ পাঞ্জাব	ঐ
১৮৩।	১৩৫০	পিএসএস-৯৫০৮	ক্যাপ্টেন	শওকত নেওয়াজ খান	৬ পাঞ্জাব	ঐ
১৮৪।	১৩৯৬	পিএ-৭৮৯৮	ক্যাপ্টেন	জাহিদ জামান	৫৩ ব্রিগেড হেড কোয়াঃ	ঐ
১৮৫।	১৫০৫	পিএসএস-১১৮৪৩	লেফটেন্যান্ট	মুনীর আহমেদ বাট	৩১ বেলুচ রেজিমেন্ট	ঐ
১৮৬।	১৫৫৩২	পিএসএস-১২১৯১	লেফটেন্যান্ট	জাফর জং	৩৮ এফ এফ	ঐ
১৮৭।	৬৪১	পিএসএস-৬১২৭	মেজর	নিসার আহমেদ খান শেরওয়ানী	৩২ পাঞ্জাব	নরহত্যা, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগের জন্য দায়ী

১৮৮।	৩৩৮	পিএসএস-৮৫৩৪	মেজর	ফায়েজ মাহমুদ	২৯ বেলুচ	ঐ
১৮৯।	৪৮৭	পিএ-৪৯৯২	মেজর	মিয়া ফখরুদ্দীন	৯১ ইনফ্যানট্রি, ব্রিগেড হেঃ	ঐ
১৯০।	৯২৪	পিএসএস-৮৮৮০	ক্যাপ্টেন	হেদায়েত উল্লাহ খান	২৯ বেলুচ	ঐ
১৯১।	১১০২	পিএসএস-১০৮২৮	ক্যাপ্টেন	মোঃ সিদ্দীক	২৭ সিগনাল ব্যাটেলিয়ন	ঐ
১৯২।	৯৯৩	১০১৪৭	ক্যাপ্টেন	খলিল-উর-রহমান	সিওডি, ঢাকা	ঐ
১৯৩।	৬২৮	পিএ-৬৭২৬	মেজর	নাদির পারভেজ খান	৬ পাঞ্জাব	ঐ
১৯৪।	৯৩৪	পিএসএস-১০৩৮৪	ক্যাপ্টেন	হাসান ইদ্রিস	ইপিক্যাপ	ঐ

পাকিস্তান বিমান বাহিনী

১৯৫।	৬৫৪৮৩	পি-৯৫৩	এয়ার কমডোর	ইনাম-উল-হক খান	পিএফ ঢাকা	ঐ
১৯৬।	৬৫৪৮৪	পিএএফ-১০৬৯	গ্রুপ ক্যাপ্টেন	এম এ মজিদ বেগ	পিএফ ঢাকা	ঐ
১৯৭।	৬৫৫১০	পাক-৫৩৩২	ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট	খলিল আহমেদ	পিএএফ	ঐ

পাকিস্তান নৌ বাহিনী

১৯৮।	৭১৭৫৫	পি-১৩৮	রিয়ার অ্যাডমিরাল	মোহাম্মেদ শরীফ	---	ঐ
১৯৯।	৭১৭৫৬	পিএন-১০৮	কমডোর	ইকরামুল হক মালিক	পোর্ট ট্রাস্ট	ঐ
২০০।	৭১৭৫৭	২১৯	কমডোর	খতিব মাসুদ হোসেন	বেজ কমান্ড	ঐ

একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি
সম্পাদনা ঃ শাহরিয়ার কবির